পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স.)

মাওলানা মোঃ আঃ ছালাম মিয়া (হুমায়ুন)

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (সা)

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে
মুহাম্মদ (স)

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (সা)

প্রকাশক

মো : রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭১৫,৭৬৮২০৯, ০১৯১১,০০৫৭৯৫; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : অক্টোবর– ২০১৩ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : মে-২০১৪

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com
peacerafiq@gmail.com
peacerafiq@yahoo.com

লেখকের কথা

"রোগের জন্য আর নয় ঔষধ। ঔষধ = সুষম ও পরিকল্পিত খাবার খাও"
- এটাই হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আগামী দিনের শ্লোগান।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন সমুদয় জ্ঞানের মূল উৎস। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'য়ালা নিখুঁতভাবে কুরআনে সুসজ্জিত করেছেন। তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও সৃজনশীল মেধা আর দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন চোখই কেবল এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারে। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো কালামে মাজীদে মধু, খেজুর, মাছ, জয়তুন, লৌহ, তামা, প্রবাল, মুক্তা, দুধ ইত্যাদির গুণাগুন বর্ণনা। সে সাথে হেদায়েতের পূর্ণ শশী সমগ্র সৃষ্টিকূলের রহমত, সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ (সা)-এক সমুদয়- নবী-রাসূল (আ), জ্বীন-ইনসান ও ফেরেস্তাগণের সম্মিলিত জ্ঞানের অধিক ইলম প্রদানে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম (সা)-এর জ্ঞান সমুদ্রের নিকটে সমস্ত মাখলুকের জ্ঞান একটি শিশির বিন্দুমাত্র। যার প্রেক্ষিতে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র বাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমনকি শল্য বা সার্জারী চিকিৎসাতেও রয়েছে। কুরআন-হাদীস চর্চা ও গবেষণার অভাবে ঐসব বাণীসমূহের সঠিক গুরুত্ব বোধগম্য হচ্ছে না এবং উহার মর্মার্থ দ্বারা বিশ্ববাসী উপকৃতও হতে পারছে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, একদা ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিকট প্রশ্ন করলেন–

فَقَالَ يَا رَبِّ مِمَّنِ الدَّاءُ-

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! রোগ কার পক্ষ হতে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার পক্ষ থেকে। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন,

অর্থাৎ ঔষধ কার পক্ষ থেকে? জবাব এল ঔষধ আমার পক্ষ থেকে। ইবরাহীম (আঃ) আবার প্রশ্ন করলেন,

يَا رَبِّ فَمَا بَالُ الطَّبِيبُ

অর্থাৎ চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? আল্লাহ উত্তর দিলেন, চিকিৎসকের মাধ্যমে ঔষধ পাঠানো হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্নাবলি এবং মহান আল্লাহ তায়ালার উত্তরের মাধ্যমেই রোগ নিরাময়, চিকিৎসা ও ঔষধ-পত্র বিষয়ক পরিপূর্ণ দর্শন এসে গেছে। মোদ্দাকথা হলো, রোগ যেমন আল্লাহর পক্ষ হতে আসে তেমনি নিরাময়ের ঔষধও আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর চিকিৎসককে আল্লাহই তো ঔষধ চিনিয়ে দেন।

সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে জাফর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলে করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন, প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। সুতরাং যখন রোগ অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ করা হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

অন্যত্র আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা রোগ এবং দাওয়া (ঔষধ) দুইটি পাঠিয়ে দেন এবং প্রতিটি রোগেরই ঔষধ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো না।

রাসূল (সা) পরিবেশ রক্ষার জন্য আবদ্ধ পানিতে ও যেখানে লোকসমাগম হয় সেখানে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলতে তথা নিক্ষেপ করতেও বারণ করেছেন। ধুমপান করে পরিবেশ দূষণ, অশ্লীল কাজের মাধ্যমে সমাজ দূষণ এবং ঘুষ দিয়ে ও নিয়ে অর্থনৈতিক দূষণ ইত্যাদি ইসলাম সম্মত নয়।

রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য রাসূলে করীম (সা) যে সব আমলের প্রতি জোড়ালো তাগিদ দিয়েছেন এবং যে সব জিনিসকে পথ্য ও ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে প্রদত্ত বইটিতে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে যাদের উৎসাহ আমাকে অনেক বেশি প্রেরণা যুগিয়েছে তাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি- তারা হলেন মাওঃ মুহা : ইবরাহীম, মাও : আব্দুল হাদী, ডাঃ এম, এ, রশীদ, কামরুজ্জাহান কলি, মোঃ জমির উদ্দিন খান, মোঃ সজিব উদ্দিন যাকির, প্রফেসর নাজির আহমদ, প্রফেসর ড. মোঃ কামরুজ্জামান এবং মোঃ মজিবর রহমান প্রমূখ।

সর্বশেষ স্নেহের ছোট ভাই মুহাঃ ছাইফুল ইসলাম এর রুহের মাগফিরাত কামনা করে শেষ করলাম।

সূচিপত্র

১. মধু ২১

◆ পবিত্র কুরআন মজীদে মধু ২১

◆ হাদীসের আলোকে মধুর গুণাগুণ ২২

◆ চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধু ২৪

◆ মধুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও এর পুষ্টিমান ২৭

◆ রোগ নিরাময়ে মধু ব্যবহারের ইতিহাস ২৮

◆ মধু সম্পর্কিত জার্মানি হৃদ-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ই-কচ-এর উক্তি.........২৯

◆ মধু ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করে ২৯

◆ ক্যান্সার ও হৃদরোগে মধু ৩০

◆ বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে মধু ব্যবহারের পদ্ধতি ৩০

◆ মৌমাছির বিষের মাধ্যমে রোগ মুক্তি ৩০

◆ রূপচর্চায় মধুর ব্যবহার ৩১

◆ মধুর প্রকারভেদ ৩৩

◆ নতুন ও পুরাতন মধুর গুণ ৩৫

◆ যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত মধুর গুণ ৩৫

◆ মধুর সংক্ষিপ্ত কিছু গুণ ৩৬

◆ মৌমাছির সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৮

◆ বিভিন্ন ভাষায় মধুর নাম ৩৯

◈ মৌচাকে সাধারণত তিন শ্রেণির মৌমাছি থাকে........................৩৯
◈ ডিম হতে মৌমাছিতে পরিণত হতে সময় লাগে......................৪০
◈ ফুলের সঙ্গে মৌমাছির সম্পর্ক..............................৪১
◈ পুষ্প রস (নেকটার) যেভাবে মধুতে পরিণত হয়......................৪১
◈ একটা মৌমাছি কত মধু সংগ্রহ করে..............................৪২
২. দুধ..৪৩
◈ কুরআন কারীমে দুধ..৪৩
◈ হাদীস নববীতে দুধ..৪৩
◈ দুধের উপকারিতা..৪৩
◈ মায়ের দুধের পুষ্টিগুণ..৪৪
◈ দুধের পুষ্টিগুণ..৪৫
◈ গাভীর দুধের পুষ্টিমান..৪৬
৩. মায়ের দুধ..৪৭
◈ শিশুদের জন্য মায়ের দুধ উত্তম খাদ্য..............................৪৮
◈ যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তারা মেধাবী হয়..........৪৯
◈ যেসব মা শিশুকে দুধ পান করায় তাদের স্তন ক্যান্সার কম হয়.....৪৯
৪. কালিজিরা..৫১
◈ কালিজিরার অন্যতম কার্যকরী উপাদানসমূহ..........................৫১
◈ কালিজিরার উপকারিতা..৫২
◈ কালিজিরা বীজ তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ..........................৫২
◈ কালিজিরার ব্যবহার ও গুণাগুণ..................................৫৪
◈ ক্যান্সার প্রতিরোধে কালিজিরা....................................৫৫
৫. খেজুর..৫৭

◆ কুরআনে কারীমে খেজুর ৫৭
◆ হাদীসে আজওয়া খেজুর ৫৮
◆ আজওয়া খেজুর হৃদ-রোগের মহৌষধ ৫৮
◆ আজওয়া খেজুর, বিষের মহৌষধ ও যাদু রোগের প্রতিষেধক ৫৯
◆ বরণী খেজুর ৫৯
◆ বরণী খেজুরের পরিচিতি ৫৯
◆ রাসূল (সা) হাসীস পছন্দ করতেন ৫৯
◆ খেজুর জন্মের ভৌগোলিক অবস্থান ৫৯
◆ খেজুর ও কাকড়ি ৫৯
◆ কাঁকড়ীর উপকারিতা ৬০
◆ কাকড়ীর মধ্যে নিম্নোক্ত খাদ্যোপাদান বিদ্যমান ৬০
◆ খেজুর ও মাখন ৬১
◆ কিতাবুল মুফরাদের উদ্ধৃতি ৬১
◆ খেজুরের প্রকারভেদ ৬১
◆ খেজুরের পুষ্টিগুণ ৬২
◆ খেজুরের অন্যান্য উপকারিতা ৬২
৬. মিষ্টি ৬৩
৭. যমযমের পানি ৬৪
◆ যমযম কূপের নামসমূহ ৬৬
◆ যমযমের পানির ফযীলত ৬৭
◆ যমযমের পানি শেফা ৭০
◆ যমযম কূপের পানিতে রোগীর আরোগ্য লাভের একটি সত্য ঘটনা ৭০
◆ খাদ্যস্বরূপ যমযমের পানির ভূমিকা ৭২

৮. কুরবানি ৭৩
৯. জলপাই তৈল ৭৬
১০. তৈল ৭৭
১১. লাউ ৭৮
১২. লবণ ৭৯
১৩. খাদ্যের পুষ্টি ৮০
১৪. রাসূল (সা)-এর খাদ্যাভ্যাস ৮১
◆ রাসূল (সা)-এর পরিত্যাজ্য খাদ্যসমূহ ৮২
◆ রাসূল (সা) দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য অপছন্দ করতেন ৮২
◆ হাদীসে জবের দলিয়া বা জবের ছাতু ৮৩
◆ বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা ৮৪
১৫. যা জানা অত্যাবশ্যক ৮৫
◆ চারটি জিনিস শরীরে সজীবতা ও শক্তি আনয়নকারী ৮৭
◆ চারটি জিনিস দৃষ্টিশক্তি হ্রাসকারী ৮৮
◆ ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী খাওয়া চার প্রকার ৮৮
◆ চারটি বস্তু দেহকে দুর্বল করে ৮৯
◆ তিন বস্তু দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে ৮৯
◆ চারটি কারণে অসুখ ও দুর্বলতা দেখা দেয় ৯০
◆ নিম্নলিখিত কারণে মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে হয় ৯১
১৬. গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কিছু টিপস ৯১
১৭. মহামারী আকাশে প্লেগ রোগে জনগণের করণীয় ৯১
১৮. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ৯৪
১৯. এইড্‌স ৯৫

২০. অজু ৯৯
- অজুর দৈহিক উপকারিতা ১০০
- অজু ও মানবদেহ ১০১
- অজুর উপকারিতা ১০১
- অজুর পানি প্রবাহ ১০২
- অজুর চিকিৎসাগত উপকারিতা ১০২
- হাত ধোয়া ১০২
- কুলি করা ১০৪
- নাকে পানি দেয়া ১০৪
- মুখমণ্ডল ধোয়া ১০৬
- দাড়ি খিলাল করা ১০৮
- কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া ১০৮
- মাথা মাসেহ করা ১০৯
- কান মাসেহ করা ১১০
- মুখের ব্রণ ১১০
- চেহারার এলার্জি ১১০
- চেহারার ম্যাসেজ ১১১
- ভ্রূতে পানির প্রভাব ১১১
- চক্ষুরোগ হতে বাঁচুন ১১১
- চোখ, পানি ও স্বাস্থ্য ১১১
- অজুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ১১২
- অজু ও রক্তচাপ ১১২
- একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের অভিমত ১১২

◈ অজু করার পর অবশিষ্ট পানি ১১৩
◈ পশ্চিম জার্মানিতে একটি সেমিনার এবং অজু ১১৩
২১. ওপেন হার্ট সার্জারী ১১৪
২২. কুলি ১১৭
২৩. খৎনা ১২০
◈ খৎনার উপকারিতা ১২২
◈ প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসে খৎনা ১২৩
◈ খৎনা এবং যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা ১২৪
◈ খৎনা এবং পেশাবের নালির সংক্রমণ ১২৫
◈ খৎনা এবং যৌনাঙ্গের ক্যান্সার ১২৬
◈ খৎনা এবং যৌন রোগ ১২৬
◈ খৎনা ও এইড্স রোগ ১২৭
২৪. গুন্না ১২৮
২৫. গোঁফ ১৩০
২৬. ঘুম ১৩১
২৭. চুম্বন ১৩৪
২৮. জ্বর ১৩৫
২৯. জুতা ১৩৬
৩০. টাখনু ১৩৬
৩১. ডান দিক ১৪০
৩২. ত্বক ১৪৩
৩৩. তাহাজ্জুদ ১৪৪
◈ তাহাজ্জুদের সময় ১৪৫

◆ তাহাজ্জুদের উপকারিতা ১৪৬
৩৪. দাড়ি ১৪৮
৩৫. দাঁড়িয়ে পেশাব ১৪৯
৩৬. দাঁড়িয়ে পান করা ১৫১
৩৭. দীর্ঘজীবন ১৫৩
৩৮. জাহান্নাম ১৫৫
৩৯. ধ্যান ১৬৩
◆ সুন্নতে রাসূল (সা) ও আধুনিক ধ্যান বিজ্ঞান ১৬৪
◆ মোরাবাকা হাউস ১৬৫
◆ ধ্যানের মাধ্যমে চিকিৎসা ১৬৫
◆ ধ্যানের উপকারিতা ১৬৬
◆ আমেরিকার হাসপাতালে গবেষণা ১৬৬
◆ মানসিক রোগের চিকিৎসা ১৬৭
◆ বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা ১৬৭
◆ এ কাজ খুব সহজ ১৬৮
◆ আত্মিক পথনির্দেশ ১৬৮
◆ ধ্যান বা মেডিটেশনের নিয়ম ১৬৯
◆ সচেতন মনোযোগ ১৬৯
◆ পায়চারির মাধ্যমে ধ্যান ১৬৯
◆ সর্বোত্তম ধ্যান ১৬৯
◆ চিন্তার একাগ্রতা ১৬৯
◆ কিভাবে ধ্যান করবেন ১৭০
◆ ধ্যানের জন্য কিছু নির্দেশনা ১৭১

◆ রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবকালীন সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা.. ১৭২
◆ দ্বীন কি আকলের নাম নাকি নকলের নাম (বিজ্ঞানের আলোকে)...... ১৭৩
৪০. ধূমপান.. ১৭৪
৪১. নখ ১৭৫
৪২. নিঃশ্বাস ১৭৬
৪৩. নাকে পানি ১৭৭
৪৪. নগ্ন ১৮০
৪৫. নামায.. ১৮১
◆ নামায এবং শারীরিক সুস্থতা.. ১৮২
◆ নামায : আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানব স্বাস্থ্য ১৮৩
◆ নামাযের মধ্যে শেফা.. ১৮৩
◆ নামাযের প্রভাব ১৮৩
◆ রোগ হতে মুক্তি.. ১৮৪
◆ বড় ইহসান.. ১৮৪
◆ নামায এবং দেহের বর্ধন ও উন্নতি ১৮৪
◆ নামায হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যায়াম ১৮৫
◆ নামায ও যোগব্যায়াম.. ১৮৫
◆ নামায দ্বারা আত্মহত্যার প্রবণতা কমে যায়........................ ১৮৫
◆ নামাযের রহস্য.. ১৮৬
◆ উত্তম ব্যবস্থাপত্র ১৮৬
◆ কেমিষ্ট্রির ব্যবস্থাপত্র.. ১৮৬
◆ সর্বোত্তম পর্যায়ে চিকিৎসা.. ১৮৮
◆ মনস্তাত্ত্বিক রোগ.. ১৮৮

- ব্যায়াম ও নামায ১৮৯
- সামগ্রিক ইবাদত ১৮৯
- কঠিন বস্তু সচল করা ১৮৯
- নামাযের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা ১৯০
- তাকবীরে তাহরীমা ১৯০
- কিয়াম বা দাঁড়ানো ১৯১
- হাত বাঁধা ১৯১
- রুকূ' ১৯৩
- সিজদা ১৯৩
- কা'দা বা বৈঠক ১৯৪
- সালাম ফিরানো ১৯৪
- নামাযের সময় এবং আধুনিক বিজ্ঞান ১৯৫
- ফজরের সময় ১৯৫
- যোহরের সময় ১৯৬
- আসরের সময় ১৯৭
- মাগরিবের সময় ১৯৭
- ইশার সময় ১৯৮
- নামাযে কিয়ামের মাধ্যমে গিটে বাত রোগের প্রতিকার ১৯৮
- রুকূর মাধ্যমে কিডনি রোগের প্রতিকার ১৯৯
- সিজদা পেটের চর্বি কমানোর ব্যবস্থা ১৯৯
- আমার এক বন্ধুর বিস্ময়কর ঘটনা ১৯৯
- সিজদার মাধ্যমে আলসারের চিকিৎসা ২০০
- মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ ২০০

- ◆ চেহারার মেদ কমে যাওয়া ২০০
- ◆ যৌন রোগের প্রতিকার........ ২০০
- ◆ বুকের ব্যথার নিরাময় ২০১
- ৪৬. পবিত্রতা ২০১
- ◆ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ........ ২০৩
- ৪৭. পরিবেশ ২০৮
- ৪৮. পাগড়ি ২১১
- ◆ পাগড়ি ২১২
- ◆ পাগড়ি এবং মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ........ ২১২
- ৪৯. ফুঁক........ ২১৩
- ৫০. ফিজিওথেরাপি ২১৪
- ৫১. বিশ্রাম........ ২১৫
- ৫২. জান্নাত ২১৬
- ৫৩. ব্যাঙের ছাতা ২২৪
- ৫৪. বর্ষা ও বরফ........ ২২৬
- ৫৫. ভয় ২২৮
- ◆ আল্লাহর ভয় মানুষকে সকল ভয় হতে মুক্তি দেয় ২৩৪
- ৫৬. মাটি ২৩৭
- ৫৭. মেসওয়াক........ ২৩৯
- ◆ মেসওয়াক........ ২৪১
- ◆ মেসওয়াক : নতুন চিকিৎসা এবং আধুনিক বিজ্ঞান........ ২৪৩
- ◆ মেসওয়াক এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ২৪৪
- ◆ মেসওয়াক এবং দাঁতের স্বাস্থ্য ২৪৪

◈ মেসওয়াক ও গলা ২৪৫
◈ মেসওয়াক ও মুখের ফোঁড়া ২৪৫
◈ মেসওয়াক ও দৃষ্টিশক্তি ২৪৫
◈ মেসওয়াক ও কান ২৪৫
◈ মেসওয়াক ও পাকস্থলী ২৪৬
◈ মেসওয়াক এবং সার্বক্ষণিক কফ কাশি ২৪৬
◈ মেসওয়াক ও মুখের দুর্গন্ধ ২৪৬
◈ মেসওয়াক ও গুরু নানক ২৪৭
◈ মেসওয়াক এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকারের রোগ ২৪৭
◈ মেসওয়াক ও হার্টের পুঁজযুক্ত ঝিল্লি ২৪৭
◈ টুথ ব্রাশ ২৪৮
◈ মেসওয়াকের প্রকারভেদ ২৪৮
◈ পিলু ২৪৮
◈ নিম এবং বাবলা ২৪৯
◈ কানীর ২৪৯
◈ মুখে স্বাদ এবং মেসওয়াক ২৫০
৫৮. মেয়েদের মাসিক ২৫১
৫৯. ম্যালেরিয়া জীবাণু ২৫২
৬০. মদ ২৫৩
◈ মদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান ২৫৫
◈ মদ মানবতার নিকৃষ্ট শত্রু ২৫৫
◈ অধ্যাপক হার্শ-এর লিখিত গ্রন্থের পর্যালোচনা ২৫৫
◈ হজম শক্তির ওপর মদের প্রভাব ২৫৬

◈ রক্ত চলাচল ব্যবস্থার ওপর মদের প্রভাব ২৫৮

◈ সামাজিক মনস্তত্ত্বের ওপর মদের প্রভাব ২৬০

◈ নেশা, স্বাস্থ্য, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান ২৬০

৬১. শুকর মাংস ২৬৫

◈ বাইবেলেও শূকর এর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ রয়েছে ২৬৫

◈ শূকরের মাংস খাওয়া বেশ কিছু রোগের কারণ ২৬৬

◈ শূকর মাংসে চর্বি তৈরির প্রচুর উপাদান রয়েছে ২৬৭

◈ শূকর পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা প্রাণী ২৬৭

◈ শূকর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী ২৬৭

৬২. রোযা ২৬৮

◈ রোযা দ্বারা ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা ২৬৯

◈ রোযা ও আধুনিক বিজ্ঞান ২৭০

◈ আমেরিকান এক অমুসলিমের ঘটনা ২৭১

◈ চন্দ্রগুপ্তের উজির চানক্যের বক্তব্য ২৭১

◈ মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা ২৭২

◈ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময় ২৭২

◈ পোপ ঈলপ গল-এর অভিজ্ঞতা ২৭২

◈ ক্যামব্রিজের ডাক্তার লোথার জিম-এর মন্তব্য ২৭৩

◈ সিগমন্ড নারায়েড ২৭৩

◈ প্যারাসাইক্রোজি গবেষণা ২৭৩

◈ হজম শক্তির ওপর রোযার প্রভাব ২৭৪

◈ রোযার মাধ্যমে রক্তের ওপর কল্যাণকর প্রভাব ২৭৬

◈ সেল বা কোষের ওপর রোযার প্রভাব ২৭৭

◈ নার্ভ সিস্টেমের ওপর রোযার প্রভাব................................২৭৭
◈ রক্ত উৎপাদন এবং রোযার বৈশিষ্ট্য................................২৭৭
◈ রোযার সামাজিক প্রভাব................................২৭৮
◈ পাকিস্তানের বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সার্ভে রিপোর্ট ২৭৮
◈ অভিজ্ঞতার আলোকে মানব দেহের ওপর রোযার প্রভাব ২৭৯
◈ রোযা স্বাস্থ্য রক্ষার একটি অতুলনীয় পদ্ধতি ২৭৯
৬৩. তারাবীহ................................২৮০
◈ বিজ্ঞানের আলোকে তারাবীহ নামাযের যৌক্তিকতা................২৮১
৬৪. রাগ................................২৮২
৬৫. রাস্তা, ছায়া ও পানি................................২৮৪
৬৬. রৌপ্য................................২৮৬
৬৭. লালা................................২৮৭
৬৮. এক শ্বাস................................২৮৯
৬৯. শিংগা................................২৯০
৭০. সাদা................................২৯১
৭১. সুর................................২৯৪
৭২. স্বর্ণ................................২৯৬
৭৩. হাঁটা................................২৯৮
৭৪. হাসি................................২৯৯
৭৫. হতাশা................................৩০২
৭৬. হৃদযন্ত্র................................৩০৩
৭৭. ইসলামে বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন................................৩০৫
◈ সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে যা করণীয়................................৩০৬

- অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাম ক্ষুধা নিবারণ নিষেধ ৩০৬
- স্বাস্থ্যসম্মত সহবাস.. ৩০৭
- যে কাজে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়.. ৩০৭
- চক্ষুরোগ (চোখ উঠা) অবস্থায় সহবাস ক্ষতির কারণ ৩০৮
- সহবাস শেষে পানি বিয়োগ স্বাস্থ্য সম্মত ৩০৮
- সহবাসের পর যা করা প্রয়োজন.. ৩০৮
- স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় কর্ম প্রকাশ করা উচিত নয়.................. ৩০৮
- সহবাসের সর্বোত্তম সময় ৩০৮
- সর্বোত্তম পদ্ধতি ৩০৯
- মাত্রাতিরিক্ত রতিক্রিয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ৩০৯
- গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান সময়কালে সহবাস না করাই উত্তম ৩১০
- দুই সহবাসের মধ্যবর্তী সময়ে যতটুকু বিরতি দেয়া উচিত....... ৩১০
- বাসর ঘরের রাত্রিতে যা করণীয় ৩১০
- নব দম্পতির অবকাশ যাপনের কক্ষে যা করণীয়.................. ৩১১
- নিম্নোক্ত অবস্থায় ও সময়ে সহবাস করা নিষিদ্ধ.................... ৩১২
- পরিত্যাগের অপকারিতা ৩১২
- স্ত্রী সান্নিধ্য থেকে বেশি দিন বিচ্ছিন্ন থাকা নিষেধ ৩১৩
- যা মেনে চলা অবশ্যই প্রয়োজন ৩১৪
- দু'জন পুরুষ বা দু'জন মহিলা এক বিছানায় শয়ন করা নিষেধ ৩১৪
- স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় শারীরিক উপকারিতা...................... ৩১৫
- সন্তানের ওপর স্বামী-স্ত্রীর ভাবাবেগের প্রভাব...................... ৩১৫
- সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভালোবাসার ভূমিকা.................................. ৩১৬
- যৌন শক্তি বৃদ্ধিকারী কতিপয় পথ্য.................................. ৩১৭

১. মধু

HONEY

কুরআন মজীদে মধু

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ-

অর্থ : "মধুমক্ষিকার উদর তথা পেট হতে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় নির্গত হয়, যার মধ্যে মানুষের শেফা ও আরোগ্য রয়েছে ।

(সূরা নাহল : ৬৯ আয়াতের অংশ বিশেষ)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ . ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ : "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে, উহার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানিয় । তোমরা প্রতিপালকের সহজ পন্থা অনুসরণ কর । ইহার পর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর । অতঃপর তোমার পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য । অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য । (সূরা-নাহল : ৬৮-৬৯) ।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

অর্থ : "জান্নাতে স্বচ্ছ মধুর নহর প্রবাহিত হবে ।" (সূরা-মুহাম্মদ : আয়াত-১৫)

মধু শেফা দানকারী এ ঘোষণা প্রায় আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে করা হয়েছে । যা এখনও পূর্বের ন্যায় যথার্থ এবং সমগ্র বিজ্ঞান জগতই এই দাবি স্বীকার করে নিয়েছেন, মধু হচ্ছে ঔষধ এবং খাদ্য উভয়ই । আর এই সুস্বাদু খাদ্যটি ছোট বড় প্রত্যেক দেশের এবং সকল পর্যায়ের মানুষই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে থাকে । কেনইবা করবে না, এটাতো

বিররে এলাহী এ তিব্বে নব্বী অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসা ও নবী করীম (সা)-এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

আবহমান কাল হতে মধু ঔষধরূপে ব্যবহার হয়ে আসছে। ইহা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও সর্বরোগ বিনাশক ঔষধ এবং উপাদেয় খাদ্যও বটে। মধু এত উপকারী যাতে মানবসমাজ মধুর ব্যবহার ভুলে না যায়, সে জন্য কুরআন মজীদে মধুর গুণের বর্ণনাসহ 'সূরা নাহল' (মধু মক্ষিকা) নাযিল হয়েছে। মধু মানবের দৈহিক রোগের ঔষধ বলে কুরআন মজীদে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা মধুর বিশেষ গুণের প্রমাণ। মধু সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন যে, "এবং তোমার প্রতিপালক মধু-মক্ষিকাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, পর্বতমালায় ও বৃক্ষসমূহে এবং উচ্চ স্থানে মধু-চক্র নির্মাণ কর। এদের উদর হতে বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট পানীয় নির্গত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে মানব সমাজের জন্য ঔষধ রয়েছে"।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তায়ালা এই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। ইহা কোনো মানুষের বা কবিরাজ, হেকিম ও ডাক্তারগণের সৃষ্টি ঔষধ নয়।

হাদীসের আলোকে মধুর গুণাগুণ

মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর মতে সকল পানীয় উপাদানের মধ্যে মধু সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি বলেন, মধু এবং কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা নেয়া উচিত। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাকেম)

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং সকাল বেলা খালি পেটে মধুর শরবত পান করতেন। যারা নিয়মিতভ মধুর শরবত পান করতে না পারবে তাদের জন্য তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কমপক্ষে মাসে তিনদিন সকাল বেলা মধু চেটে সেবন করবেন, ঐ মাসে তার কোনো কঠিন রোগ-ব্যাধি হবে না।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ)

একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জনৈক সাহাবী (রা) তাঁর ভাইয়ের অসুখের কথা বর্ণনা করলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। এইভাবে একে একে ৩দিন একই পরামর্শ দেন এবং চতুর্থ দিন মধু পান করানোর পর উক্ত সাহাবী (রা)-এর ভাই সুস্থ হয়ে উঠেন।

(তাফসীর মাআরেফুল কুরআন)

অনেক সাহাবী (রা) যারা 'মধু সর্ব রোগের প্রতিষেধক' হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাঁরা সর্বরোগে মধু ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন।

ইবনে ওমর (রা)-এর যখনি কোনো ফোড়া, পাঁচড়া বা অন্য কিছু বের হতো, তখন তিনি এর ওপর মধুর প্রলেপ দিতেন এবং পবিত্র কালামের পূর্বক্তো আয়াত (সূরা নাহল-৬৯) তিলাওয়াত করতেন।

১. আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন ভোরে মধু চেটে খায় তার কোনো বড় বিপদ হতে পারে না।" (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "সর্বোত্তম পানীয় হলো মধু, উহা হৃদপিণ্ডকে সবল করে এবং বুকের ঠাণ্ডা দূর করে।"

৩. মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, "যে কেহ আরোগ্য কামনা করে, তার ভোরের নাস্তা হিসাবে পানি মিশ্রিত মধু পান করা উচিত।"

৪. রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন। আল্লাহর শপথ, যে ঘরে মধু আছে অবশ্যই ফেরেশতাগণ সে ঘরের অধিবাসীদের মাগফেরাত কামনা করে। কোনো ব্যক্তি যদি মধু পান করে তবে যেন তার পেটে লক্ষ ঔষধ স্থির হলো এবং পেট হতে লক্ষ রোগ বের হয়ে গেল। আর যদি সে পেটে মধু ধারণ অবস্থায় মারা যায় তবে তাকে দোযখের আগুন স্পর্শ করে না।" (মিশকাত)

৫. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা দুটি সেফা দানকারী বস্তুকে নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে নাও। একটি মধু অপরটি কুরআন মজীদ। (মিশকাত)

৯৯ প্রকার রোগের প্রতিষেধক মধু ।

কারণ মধু রোগ-ব্যাধি শেফাদানে এক অব্যর্থ মহৌষধ। আর কুরআন দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার গ্যারান্টি। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ এ দুটির দ্বারা বহু উপকৃত হয়ে আসছে। আমাদের প্রিয় নবী (সা) মধু খেতে বড়ই ভালবাসতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর অভ্যাস : নাফে (রা) হতে বর্ণিত। ইবনে ওমর (রা)-এর যখন কোনো ফোঁড়া, পাঁচড়া অথবা অন্য কিছু বের হতো, তিনি তার ওপর মধু লাগিয়ে দিয়ে পবিত্র কুরআনের নিম্ন লিখিত আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন।

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ-

অর্থ : মধুমক্ষিকার পেট তথা উদর থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়, যার মধ্যে মানুষের শেফা ও রোগমুক্তি রয়েছে।" (সূরা নাহল : আয়াত-৬৯)

বিখ্যাত মুসলমান চিকিৎসক ইবনে সিনা তার বিশ্বখ্যাত (Medical test book the canon of medicine)-এ বহু রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মধু ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন। তিনি মধুর উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেন, মধু আপনাকে সুখী করে, পরিপাকে সহায়তা করে, ঠাণ্ডার উপশম করে, ক্ষুধা বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ করে, জিহ্বা স্পষ্ট করে এবং যৌবন রক্ষা করে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মধু

দুই চামচ দারু চিনি গুঁড়া, এক চামচ মধু এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে মিশিয়ে সেবন করলে মূত্রথলির জীবাণু ধ্বংস হয়।

১. দাঁতের ব্যথা : দাঁত সার্বক্ষণিক ব্যথা হলে এক চামচ দারুচিনির গুঁড়া, পাঁচ চামচ মধু এক সঙ্গে মিশিয়ে ব্যথাযুক্ত দাঁতের গোড়ায় ব্যবহার করলে ব্যথা উপশম হয়। ব্যথা না সারা পর্যন্ত দিনে তিনবার ব্যবহার করতে হবে।

২. কোলস্টেরল : দুই চা চামচ মধু এবং তিন চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া ১৬ আউন্স পানিতে মিশিয়ে কোলস্টেরলের রোগীকে সেবন করালে দুই ঘণ্টার মধ্যে কোলস্টেরলের পরিমাণ ১০ শতাংশ কমিয়ে আনে। দিনে দুবার সেবন করলে যে কোনো ধরনের কোলস্টেরল জনিত রোগ উপশম করে।

৩. ঠাণ্ডা লাগা : যারা সাধারণ বা তীব্র ঠাণ্ডায় ভোগে তাদের এক টেবিল চা চামচ হালকা গরম মধু ও দুই চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে দিনে একবার করে তিন দিন সেবন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ঠাণ্ডা, পুরনো কাশি উপশম হয় এবং সাইনাস পরিষ্কার করে।

৪. পাকস্থলীর সমস্যা : দারুচিনি পাউডারের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সেবন করলে পাকস্থলীর ব্যথা ও গ্যাস্ট্রিকজনিত ব্যথা উপশম হয় এবং পাকস্থলীর মূল হতে আলসার ভালো করে।

৫. হার্টের রোগ : দারুচিনি গুঁড়া এবং মধু একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে রুটির সঙ্গে জেলির মতো মাখিয়ে সকালের নাশতায় খেতে

হবে। এটা ধমনীর কোলস্টেরলের পরিমাণ কমায় এবং রোগীকে হার্ট অ্যাটাক হতে রক্ষা করে।

৬. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : প্রতিদিন মধু ও দারুচিনি গুঁড়া সেবন করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণ হতে দেহকে রক্ষা করে।

৭. বদহজম : দুই টেবিল চামচ মধুর ওপর সামান্য দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে খাবারের আগে সেবন করলে এসিডিটি কমে যায় এবং ভারী খাবার হজম হয়।

৮. ইনফ্লুয়েঞ্জা : মধু ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণু ধ্বংস করে।

৯. ত্বকের ইনফেকশন : মধু ও দারুচিনি গুঁড়া সমপরিমাণে মিশিয়ে একজিমা, দাউদ এবং অন্য সব ধরনের ত্বকের ইনফেকশন এর আক্রান্ত স্থানে লাগাতে হবে। দিনে দুবার সাত দিন হতে শুরু করে প্রয়োজনে এক মাস ব্যবহার করতে হবে।

১০. ওজন কমানো : সকালের নাশতার আধা ঘণ্টা আগে খালি পেটে এবং রাতে ঘুমানোর আগে মধু ও দারুচিনি গুঁড়া এক কাপ গরম পানিতে মিশিয়ে পান করতে হবে। নিয়মিত পান করলে স্থূলকায় শরীরের ওজনও কমে থাকে। এই মিশ্রণ নিয়মিত পান করলে উচ্চমানের খাবার খেলেও শরীরে চর্বি জমতে পারে না।

১১. ক্যান্সার : সম্প্রতি জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় পাকস্থলী ও হাড়ের ক্যান্সার সফলতার সঙ্গে আরোগ্য লাভ করেছে। যেসব রোগী এ ধরনের ক্যান্সারে ভোগে তাদের ক্ষেত্রে এক টেবিল* চামচ মধু ও এক চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া একসঙ্গে মিশিয়ে দিনে তিন বার এক মাস সেবনে এ রোগ হতে আরোগ্য লাভ করে।

১২. ক্লান্তি : ডা. মিল্টন যিনি এই গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, এক গ্লাস পানিতে আধা টেবিল চামচ মধু এবং কিছু দারুচিনি গুঁড়া গ্লাসের পানিতে ছিটিয়ে দিয়ে সকালে ব্রাশ করার পর এবং বিকেল ৩টার দিকে পান করলে সাত দিনের মধ্যে শরীর সতেজ হয়ে ওঠে এবং ক্লান্তি দূর হয়।

১৩. শ্রবণ শক্তি কমে গেলে : যেসব রোগী কানে কম শোনে তাদের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ মধু ও দারুচিনি গুঁড়া মিশিয়ে সকালে ও রাতে পান করলে শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৪. পুড়ে গেলে : খাঁটি মধু পোড়ার ওপর মুক্তভাবে নিয়মিত লাগালে পোড়ার জ্বালা বন্ধ করে, ব্যথা দূর করে এবং দ্রুত উপশম হয়।

১৫. বিছানায় প্রস্রাব করলে : শিশুদের ঘুমানোর আগে এক চা চামচ মধু খাওয়ালে বিছানায় প্রস্রাব করা বন্ধ হয়।

১৬. অনিদ্রা : এক গ্লাস দুধের মধ্যে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করলে ভালো ঘুম হয়। ঘুমের পর শরীর সতেজ হয়, কর্মে উদ্যম ফিরে পাওয়া যায়।

১৭. নাকের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া : এক বাটি গরম পানিতে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে বাটির ওপর মাথা রেখে শ্বাসের মাধ্যমে গন্ধ নিতে হবে এবং বাটিসহ মাথা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এতে অত্যন্ত ভালো ফল পাওয়া যায়।

১৮. ক্ষত : ক্ষতস্থানে মধু দ্বারা প্রলেপ দিয়ে বেঁধে দিলে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায় এবং নিয়মিত ব্যবহার করলে কোনো এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না। (প্রথম আলো ৫-৯-২০০৪)

১৯. অস্টিওপোরসিস : প্রতিদিন এক চা চামচ মধু পান করলে ক্যালসিয়াম ব্যবহারে সহায়ক হয় এবং অস্টিওপোরসিস রোগের হাত হতে রক্ষা করে। বিশেষ করে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের লোকের জন্য খুব উপকারী।

২০. মাইগ্রেন : হালকা গরম পানিতে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে মাইগ্রেন ব্যথার শুরুতে চুমুক দিয়ে পান করতে হবে। প্রয়োজনে ২০ মিনিট পর পর পান করতে হবে। এতে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় এবং এছাড়াও রাশিয়ার বিখ্যাত ডাক্তার ক্যাভিনভিনা, তিনি মৌমাছির মধু নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন যে, মৌমাছিরা যখন ফুল হতে অথবা অন্য কোনো স্থান হতে মধু সংগ্রহ করে, তখন ইহা উক্ত মৌমাছির মুখের লালার সাথে মিশে উক্ত মধু নতুন এক উপাদানে পরিণত হয়। যা সর্বপ্রকার রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা

যায়। অথবা সর্বপ্রকার ঔষধ মিশিয়ে নতুন নতুন রোগের নতুন নতুন ঔষধ তৈরি করা যায়।

বিখ্যাত হেকিম আজমল খান বলেছেন, মধু মস্তিষ্কের আর্দ্রতা দূর করে এবং ঠাণ্ডা ও কফ কাশির জন্যও ঔষধ হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

বিখ্যাত হেকিম জালেনুস বলেছেন, মধু অধিকাংশ রোগের জন্য ঔষধ হিসেবে কাজ করে। যেমন– জন্ডিস, হাড় বাঁকা ও প্যারালাইসিস রোগ নিরাময়ের জন্য মধু বেশ উপকারী । এছাড়াও মধু চোখে লাগালে চোখের দৃষ্টি শক্তি বাড়ে এবং যৌন রোগের জন্য ও যৌন রোগের ঔষধ তৈরিতে মধুর ভূমিকা অপরিসীম।

মধুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও এর পুষ্টিমান

হাজার-হাজার সংগৃহীত ফুলের নির্যাস এবং খাদ্য দ্রব্যের সাথে মৌমাছির মুখ থেকে নিঃসৃত লালা উপাদানসমূহের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লালারূপ ঘন আঠালো পদার্থ তৈরি হয়, তাকে মধু বলে।

১০০ গ্রাম মধুকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত উপাদনগুলো পাওয়া যায়।

১. গ্লুকোজ - ৩৫%; ইহা ক্লান্তি দূরীকরণের বিশেষ ভূমিকা রাখে।

২. লেভিউলোজ - ৪০%

৩. শর্করা ৩-৪%; এর উপস্থিতির কারণে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং নষ্টও হয় না।

৪. পানি - ১৮%; শরীরের পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।

৫. খণিজ উপাদান ০.২% গ্রাম। (যা শারীরিক, মানসিক, স্নায়ুবিক ও স্মৃতি শক্তি বাড়ায়)

৬. ক্যালসিয়াম - ৫ মি. গ্রাম (যা দ্বারা হাড়, দাঁত, রক্ত ও অন্যান্য টিসু তৈরি হয়)

৭. লৌহ - ৯ মি. গ্রাম (যা রক্ত তৈরিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে।)

৮. আমিষ-০.৩ গ্রাম।

= ভিটামিন বি-২০.০৪ মি. গ্রাম।

= ভিটামিন-সি - ৪ মি. গ্রাম।

৯. অন্যান্য - ৩% গ্রাম।

এছাড়া মধুতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের এন্টি-অক্সিডেন্ট, এন্টিসেপটিক এজেন্ট, এন্টিবায়োটিক এজেন্ট, হজম শক্তি বৃদ্ধিকারী এনজাইমিক এজেন্ট ইত্যাদি। এতে ২% এনজাইম রয়েছে। এ এনজাইমগুলো হলো-ডায়াস্টেজ, ইনভার্টেজ, সোকরোজ, ক্যাটালেক্স, পার-অক্সিডেস, লাইপেজ। এই এনজাইমগুলো বিভিন্ন খনিজ উপাদান যেমন-ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ক্লোরিন, সালফার, ফসফরাস, আয়োডিন লবণের সাথে যুক্ত থাকে। কিছু উপকরণের রেডিয়ামের ন্যায় ধাতব উপাদানও থাকে।

রাসায়নিক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে জানা গেছে, এতে এ্যলুমিনিয়াম, বোরন, ক্রোমিয়াম, কপার, লেড, টিন, জিংক ও জৈব এসিড যেমন-ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, টারটারিক এসিড এবং অক্সালিক এসিড, ভিটামিন, হরমোনস, এসিটাইল কোলিন, এন্টিবায়োটিকস, ফাইটোনসাইডস, সাইটোস্ট্যাটিকস এবং পানি (১৭.৭%) ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান আছে। ভিটামিন যেমন-ভিটামিন বি-১. বি-২, বি-৩, বি-৫, বি-৬, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ই, ভিটামিন-কে এবং ক্যারোটিন ইত্যাদি মধুতে বিদ্যমান। এক কেজি মধুতে ৩২৫০ ক্যালরি শক্তি থাকে। ইহা সুগারের ন্যায় যা রূপান্তর ব্যতীত সরাসরি অন্ত্র থেকে রক্তে সংযোজিত হয়।

রোগ নিরাময়ে মধু ব্যবহারের ইতিহাস

গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটাস বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময়ে মধু ব্যবহার করতেন। তিনি মধুকে অতিরিক্ত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী গ্যালেন মধুর ঔষধি গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন এবং এর বিষবিরোধী ধর্মও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মধু আন্দ্রিক রোগে উপকারী। বিশেষ করে দুর্বল শিশুদের মুখের অভ্যন্তরীণ পঁচনশীল ঘা নিরাময়ে এটি খুবই উপকারী। বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। এটি ক্ষুধা ও স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং শোষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মধু পাকস্থলীর বিভিন্ন প্রকার রোগে বিশেষ উপকারি।

আল-সমরকান্দী এবং ইবনে আল-নাসিফ বিভিন্ন প্রকার মূত্র রোগে মধু ব্যবহার করতেন। আল-রাজী মূত্র পাথরীতে কালিজিরার সাথে মধু ব্যবহার করতেন। ইউনানী মধ্য যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন রোগে মধু ব্যবহার করতেন, (যেমন-পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্লাধিক্য, মুখের প্রদাহ, চোখের রোগ, চোখের পাতায় প্রদাহ, কর্ণিয়ার ক্ষত, কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা, স্নায়ুরোগ, পক্ষাঘাত, রক্ত প্রবাহের অবরুদ্ধতাজনিত হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপ, ত্বকের রোগ, সংক্রমণজনিত ক্ষত, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।)

মধু সম্পর্কিত জার্মানি হৃদ-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ই-কচ-এর উক্তি

ডাঃ ই-কচ-এর মতে, উপযুক্ত ঘাস খেয়ে ঘোড়া যেমন তেজী হয় তেমনি প্রত্যহ সকালে এক চা-চামচ করে খাঁটি মধু খেলে হৃদপিণ্ড শক্তিশালী হয়।

মধু ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করে

গ্যাস্টিক, আলসার অথবা ডিওডেনাল আলসারের জন্য "হেলিকো ব্যাকটরপাইলরী" নামক ব্যাকটেরিয়াকে দায়ী করা হয়। এই ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে ক্যান্সার ও হৃদরোগ হয়। লন্ডনে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, এই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে হৃদরোগের সম্ভাবনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে। শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রভাবিত করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে সব উঠতি বয়সের মেয়েদের দেহে এ ব্যাকটেরিয়া নেই, তাদের তুলনায় যাদের এ ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, তাদের দৈহিক বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম। ৫৫৪ জন মেয়ের ওপর গবেষণা চালিয়ে এই ফল পাওয়া গেছে। এই ব্যাকটেরিয়া নির্মূলের জন্য এন্টি-বায়োটিক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এর আক্রমণে গ্যাস্টিক এবং ডিওডেনাল আলসারের জন্য ট্রিপল থেরাপী (Triple therapy) ব্যবহৃত হয়।

অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে, মধু সেবনে হেলিকো-ব্যাক্টর পাইলরী নামক ব্যাকটেরিয়া নির্মূল হয়। মধু সেবনে একদিকে যেমন ব্যাকটেয়িরার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তেমনি এন্টি-বায়োটিকের ক্ষতিকর প্রভাব হতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ক্যান্সার ও হৃদরোগে মধু

পূর্বের আলোচনা হতে পরিষ্কার বুঝা যায়, মধুতে ব্যাকটেরিয়া নির্মূলের ক্ষমতা বিদ্যমান। গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার-এর জন্য দায়ী "হেলিকোব্যাকটর পাইলরী" নামক ব্যাকটেরিয়াকেও নির্মূল করতে পারে। সেই সাথে মধু ক্যান্সার ও হৃদরোগ প্রতিহত করতে পারে। ক্যান্সার এবং হৃদরোগের অন্যতম কারণ হলো, মুক্তমূলক বা ফ্রি-রেডিক্যাল। এন্টি-অক্সিডেন্ট, মুক্তমূলক বা ফ্রি রেডিক্যালের বিরুদ্ধে কাজ করে, ক্যান্সার, হৃদরোগসহ অনেক রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মধুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে এন্টি-অক্সিডেন্ট। মধু যত ঘন বা গাঢ় হবে, এন্টি-অক্সিডেন্ট-এর পরিমাণ তত বেশি থাকবে। ফলে নিয়মিত মধু সেবনে ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ বহুবিধ রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মধুর সাথে কালিজিরা সেবনে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে মধুর ব্যবহারের পদ্ধতি

পেটের রোগ-ব্যাধি, শরীরের পানি শূন্যতায়, হাইপার হাইড্রোসিস, হার্ট থ্রম্বিং, শারীরিক দুর্বলতা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্যতায় নিম্নোক্তভাবে মধু ব্যবহার করতে হবে। একে "হানী ওয়াটার থেরাপী" বলা হয়।

তৈরির পদ্ধতি : প্রথমে পরিষ্কার একটি কাঁচের গ্লাসে ১ (এক) থেকে ৩ (তিন) চামচ মধু নিতে হবে। এরপর এক গ্লাস অথবা পরিমাণ মতো বিশুদ্ধ পানি গ্লাসে ঢালতে হবে এবং উক্ত মধু মিশ্রিত পানি পান করতে হবে।

প্রত্যহ ১ (এক) থেকে ৩ (তিন) চা চামচ মধু চেটে চেটে খেতে হবে। সেই সাথে প্রয়োজনানুসারে ১/২ চা চামচ কালিজিরার তেল চেটে চেটে খেতে হবে। অথবা প্রথম সকালে ও রাত্রে শয়নকালে এক চিমটি কালিজিরা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে।

মৌমাছির বিষের মাধ্যমে রোগ মুক্তি

বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, মৌমাছির হুলের বিষে কিছু কঠিন রোগ নিরাময়ের প্রতিষেধক রয়েছে। মৌমাছির বিষ গেঁটেবাত ও রক্ত Multiple Selerosis বা গেঁটেবাত নিরাময়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞানীরা মৌমাছির বিষে বেশ কিছু ধরনের প্রোটিন খুঁজে পেয়েছেন। গবেষণায়

দেখা গেছে, এ সব প্রোটিনের মধ্যকার "ফসফলিপাজ-এ" নামক এক প্রকার এনজাইম থাকে; যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত মধু সংগ্রহের জন্য মধু চাষ করা হলেও বিজ্ঞানীরা মৌমাছির বিষ সংগ্রহ করেছেন। বিশেষ ধরনের কাগজে লাগামাত্রই বিদ্যুতের প্রভাবে মৌমাছি বিষ উগড়ে বা ঢেলে দেয়। সম্প্রতি মৌমাছির বিষ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এক দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণার কাজ শুরু করেছেন। ওয়াশিংটনের জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল সেন্টারে বছরব্যাপী এই গবেষণা শুরু হয়েছে। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও মাইক্রোবায়োলজির প্রফেসর জোসেফ বেলান্তি এ গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মৌমাছির বিষের সাহায্যে রোগ নিরাময় ক্ষমতার ধারণা নতুন নয়; বরং ইতিহাস থেকে জানা যায়, গ্রিক ও রোমানিরা মৌমাছির বিষের সাহায্যে রোগ নিরাময় সম্পর্কিত বিদ্যা সম্পর্কে জানত। আর এ সূত্র ধরেই সমকালীন বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণায় আকৃষ্ট হন। এরূপ আরেকটি ঘটনাতে দেখা যায়, গেঁটেবাত বা Multiple Selerosis রয়েছে, এমন ব্যক্তি মৌমাছি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া রোগের দুর্ভোগ থেকে বিস্ময়করভাবে মুক্ত হয়ে গেছে।

রূপচর্চায় মধুর ব্যবহার

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা নিঃসন্দেহে বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ত্বকের জেল্লা বজায় রাখতে গাধার দুধ দিয়ে গোসল করতেন। আর ময়শ্চারাইজার হিসেবে মুখে নিয়মিত মধু মাখতেন। ময়শ্চারাইজিং ও এন্টিবায়োটিক গুণ মধুকে সৌন্দর্য চর্চার এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি টিপস দেয়া গেল।

১. মুখমণ্ডল পরিষ্কার করে সামান্য মধু আঙ্গুলে লাগিয়ে সারা মুখে ও ঘাড়ে চক্রাকারে ম্যাসেজ করতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই মুখ ও ত্বক মিশে রক্ত চলাচলের গতিকে বাড়িয়ে দেয়। এরপর সামান্য গরম পানি দিয়ে মুখমণ্ডল ও ঘাড় ধৌত করে ফেলতে হবে। এভাবে ২০-২৫ দিন মধু ব্যবহারে মুখমণ্ডল আগের চেয়ে সুশ্রী, সুন্দর ও লাবণ্যময়ী হয়ে উঠবে।

২. মুখে বয়সের ছাপ পড়লে দুধ ও মধু একত্রে মিশিয়ে পরিষ্কার মুখে ২০ মিনিট মালিশ করে রাখতে হবে। মিশ্রণটি তুলার সাহায্যে কপাল, গাল, ঠোঁটের উপরিস্থান, থুতনী ও গলায় আলতোভাবে লাগাতে হবে। এভাবে ১৫-২০ দিন নিয়মিত লাগালে মুখে বয়সের ভাঁজ অনেকাংশে দূর হয়ে যাবে।

৩. ফেসিয়ালের এক কার্যকর উৎস হলো মধু। ২/৩ চা চামচ মধু, পাঁচ চামচ ওটমিল ও এক চামচ জল একত্রে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করতে হবে। এরপর কাঁচা দুধে তুলো ভিজিয়ে মুখ ও ঘাড় মুছতে হবে। যাতে বাড়তি তেল-ময়লা না থাকে। এরপর উল্লিখিত পেস্টটি মুখ, গলা ও ঘাড়ে ভালোভাবে ম্যাসেজাকারে লাগিয়ে চল্লিশ মিনিট পর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকের ধরন তেল তেলে হলে ওটমিলের বদলে শশা ও লেবুর রস ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. হজম ঠিক মতো না হলে এর প্রভাব দেহের ত্বকে, চুলে, মুখে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বিরূপ প্রভাব পড়ে। মধু, চুল ও ত্বককে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। খাওয়ার পর হানি ওয়াটার থেরাপি অর্থাৎ মধুর সাথে পানি মিশ্রিত করে (পানির সাথে মধু মিশ্রিত নয়) অর্থাৎ খেলে বিপাক সমস্যাসহ ঝুঁকি কমে যাবে, চুল পড়া বন্ধ হবে এবং ত্বকে অক্সিজেন প্রবাহ বাড়বে।

৫. রোদে পোড়া মুখ, ঘাড়, গলা ও হাতের যত্নে মধু ও কমলালেবুর খোসা বাটা একত্রে মিশ্রিত করে আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করে মাখলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত এ অভ্যাস ধরে রাখলে ত্বকের হারানো সৌন্দর্য ফিরে পাওয়া যায়।

৬. শীতকালে অত্যধিক শুষ্ক-আবহাওয়ার কারণে ঠোঁট, হাত, পা ফেটে যায়। আর এর সমাধানে মধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করে মধু মেখে কয়েক ঘণ্টা রেখে পরিষ্কার করলে উপকার পাওয়া যায়। দিনে দু'একবার, সপ্তাহে দু'তিনদিন এভাবে করলে উক্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

৭. শুষ্ক ত্বকের যত্নে অ্যামন্ড বাটা ও গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি বাটার সাথে মধুসহ মিশ্রণ বানিয়ে মুখ ও ঘাড়ে ত্রিশ মিনিটি লাগিয়ে রাখলে

উপকার পাওয়া যায়। এভাবে মিশ্রণটি সংরক্ষণ করে নিয়মিত ১৫-২০ দিন ব্যবহারে উক্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

৮. ব্রণ একটি সমস্যা, যাতে চুলকানীসহ ত্বকে বিশ্রী কালো দাগও পড়ে। এ সমস্যায় চন্দন বাটার সাথে মধু পরিমাণ মতো মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে হবে। সেই সাথে মল ত্যাগে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে। তাহলে কিছু দিন ব্যবহারেই ব্রণসহ কালো দাগ দূর হয়ে যাবে।

৯. চুলে খুশকির সমস্যায় লেবুর রসে মধু মিশ্রিত করে চুলের গোড়ায় ম্যাসাজ করতে হবে। এভাবে ২০-৩০ মিনিট পর ভালো কোনো শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করতে হবে। ৫-৭ দিন নিয়মিত ব্যবহারে খুশকির সমস্যা সমাধান হবে।

১০. ত্বকের র‍্যাশ মরা কোষ বিদায় করতে হলে চিনাবাদামের চূর্ণের সাথে মধু সামান্য পরিমাণ মিশ্রিত করে পেস্ট তৈরি করতে হবে। পরে আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করলে চকচকে ভাব এসে যাবে। সেই সাথে ত্বকের আর্দ্রতাও ফিরে আসবে।

মধুর প্রকারভেদ

মধু আট প্রকার : ১. মাক্ষিক, ২. ভ্রামর, ৩. ক্ষৌদ্র, ৪. পৌত্তিক, ৫. ছাত্র, ৬. অর্ঘ্য, ৭. উদ্দালক ও ৮. দাল। এদের কিছু গুণ ও লক্ষণ নিচে দেয়া হলো-

১. মাক্ষিক মধু : মধুমক্ষিকরা বা মৌমাছিরা যে তৈলবর্ণ মধু তৈরি করে, তাকে বলা হয় মাক্ষিক মধু। সমস্ত মধুর মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ।

এ মধু চক্ষুরোগ বিনাশ করে, অর্শরোগ নাশ করে, শ্বাসকষ্ট দূর করে, ক্ষয়রোগ নিরাময় করে, ক্ষত নিবারণ করে এবং কাস রোগের আরোগ্য করে। এটি লঘুপাক, তাই খেতে কোনো অসুবিধে নেই।

২. ভ্রামণ মধু : সাধারণভাবে যে ভ্রমর আমরা দেখি, এদের চেয়ে আকারে সামান্য ছোট ভ্রমর সংগৃহীত স্ফটিকতুল্য পরিষ্কার মধুকে ভ্রামর মধু বলা হয়। ভ্রামর মধু মূত্ররোধক, শীতল ও পিচ্ছিল। রক্তজনিত পিত্তনিবারক এবং অভিষ্যন্দকারক।

৩. ক্ষৌদ্র মধু : কপিলবর্ণের যে অতি সূক্ষ্ম মক্ষিকা, তাদেরই ক্ষুদ্র নামে অভিহিত করা হয়। এই মক্ষিকা দ্বারা তৈরি মধুই ক্ষৌদ্র মধু নামে অভিহিত

হয়। এই মধু মাক্ষিক মধুর মতোই গুণান্বিত। এটি ব্যবহারের প্রমেহ নিবারিত হয়ে থাকে।

৪. পৌত্তিক মধু : এক রকমের মৌমাছি দেখা যায় যা আকারে ছোট এবং এর কামড় অতীব পীড়াদায়ক। এদের গায়ের রং কালো এবং এরা বড় পুত্তিকা। পুত্তিকা মৌমাছি কর্তৃক তৈরি মধুর নাম পৌত্তিক মধু। এই মধুর রং অনেকটা ঘৃতের মতো।

প্রমেহ নিবারণের কাজে, মূত্রকৃচ্ছ উপশমের কাজে, রক্ত দুটি নিবারণের কাজে এবং অস্থিক্ষত নিরাময়ের কাজে এই মধুকে ব্যবহার করা হয়।

৫. ছাত্র মধু : হিমালয়ের বনে এক ধরনের পীত ও কপিলবর্ণের মৌমাছি দেখা যায়। এরা ছত্রাকার মৌচাক তৈরি করে, তাই এর থেকে তৈরি মধুকে ছাত্র মধু বলা হয়ে থাকে। এই মধু দেখতে পীত ও কপিলবর্ণ হয়।

ক্রিমি প্রশমনের কাজে, মোহ নাশের কাজে, তৃপ্তি আনয়নে, শ্বেতীরোগ নিরাময় করতে, বিষদোষের উপশমে এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এর ব্যবহার হয়।

৬. অর্ঘ্য মধু : তীক্ষ্ণ তুন্ডুযুক্ত এক ধরনের মক্ষিকা দেখা যায়, সেগুলিকে বলা হয় অর্ঘ্য। এদের বর্ণ পীত এবং দুটি পা আছে।

এদের দ্বারা তৈরি মধুর নামই হলো অর্ঘ্য মধু।

অর্ঘ্য মধু কফ নিবারক, পুষ্টিবর্ধনকারী, পিত্তনিরাময়কারী। এটি স্বাদে কষায় এবং বিপাকে কটু। এটি ভক্ষণে শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৭. উদ্দালক মধু : চলতি কথায় এর নাম হলো উই মধু। উইয়ের ঢিবির মধ্যে এই ধরনের মৌমাছিরা বাস করে এবং অল্প পরিমাণে মধু তৈরি করে-এরাই উদ্দালক নামে পরিচিতি।

উদ্দালক মৌমাছি আকারে ছোট এবং কপিল বর্ণাকৃতি। এদের মধুও দেখতে কপিলবর্ণ।

৮. দাল মধু : চলতি ভাষায় এর নাম কুটুরে মধু। ফুল থেকে যে মধু স্থলিত হয়ে পুত্রের ওপরে সংগৃহীত হয়, তার নাম দাল মধু।

এই মধু ওজনে ভারি। এই মধুতে রসের পরিমাণ বেশি।

বমি রুদ্ধ করতে, পুষ্টির বিকাশ ঘটাতে, রুচি আনতে, কফ নিবারণে, প্রমেহ উপশমে এই মধুর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য।

নতুন ও পুরাতন মধুর গুণ

নতুন মধু পুষ্টিকারক, কিন্তু তেমন কফবিনাশকারী নয়। পুরানো মধু ধারক গুণসম্পন্ন, রুক্ষ, মেদনাশক এবং অত্যন্ত কৃশতাকারক। এক বছর অতিক্রান্ত হলেই সেই মধুকে বলা হয় পুরানো মধু। ভ্রমররা সবিষ প্রাণী। বিষাক্ত ফুল থেকেও এরা রস আহরণ করে মধু তৈরি করে থাকে, তাই শীতল মধুই সবচেয়ে বেশি গুণকারক। কিন্তু বিষসম্বন্ধ থাকায় উষ্ণ মধু সেবন বা উষ্ণ দ্রব্যের সঙ্গে মধু সেবন সঙ্গত নয়। তবে মধুকে উত্তপ্ত করলে সরাসরি-সূর্যালোকে মধুর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

> এক গবেষণায় দেখা গেছে, যে সকল মৌমাছি খারাপ মধু আনে।
> তা প্রমাণ হলে রানী মৌমাছির আদেশক্রমে তাদের ঘাড় আলাদা করে মেরে ফেলে।

যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত মধুর গুণ

মধু একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। সব শাস্ত্রে মধুকে মহৌষধ বলা হয়ে থাকে। সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যায়, এক কেজি মধু ৬.৫০ লিটার দুধ অথবা ৭.৫০ কেজি পনির অথবা ১.৬৫ কেজি গোশত অথবা ৪০টি প্রমাণ সাইজের কমলা অথবা ৫০টি ডিমের পুষ্টিমানের সমান। এক কেজি মধু ৩২৫০ ক্যালরি শক্তি সরবরাহ করে। এক চামচ মধুর খাদ্যমান একটি ডিমের সমান। এক পাউন্ড গোশতে যে পরিমাণ খাদ্য উপাদান থাকে তার চেয়ে তিনগুণ খাদ্য উপাদান থাকে মধুতে। মধু মধুর মতোই পুষ্টিকর। বৃদ্ধদের জন্য মধু অমৃত তুল্য। বাচ্চাদের জন্য খাদ্য হিসেবে দুধের পরই মধুর স্থান। প্রত্যহ চা-চামচের ২/১ চামচ মধু বাচ্চাকে খাওয়ালে তার শরীরের রক্ত কণিকা বৃদ্ধি পায়, ফলে বাচ্চার ওজন বেড়ে যায়। তাছাড়া মধু বল বৃদ্ধিকারক। হেকিমী ও কবিরাজী শাস্ত্রে মধু দ্বারা নানা প্রকার রোগ নাশক ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। প্রাচীনকালে মিশরে স্বামীরা প্রতি বছর বিবাহ বার্ষিকীতে স্ত্রীকে এক ভান্ড করে মধু উপহার দিত। হিন্দু সমাজে বাসর রাতে নববধূর গালে ও ঠোঁটে মধু মাখিয়ে দেয়া হতো। অনেক সবজাত শিশুকে জন্মের প্রথমে দুধ খাওয়ার আগে দুই এক ফোঁটা মধু মুখে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা জীবন যেন মধুর মতো মধুময় হয়ে উঠে তাদের জীবন। গ্রীক সুন্দরীরা মধু পান করত যৌবন ধরে রাখার

জন্য। মিশরের মায়েরা বাচ্চাদের মধু মিশ্রিত পানি পান করাতেন যাতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও তারা যেন সুন্দর হয়। কিংবদন্তি সুন্দরী ক্লিওপেট্রা মুখে মধু মাখতেন।

মধুর সংক্ষিপ্ত কিছু গুণ

১. মধু ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

২. মধু রুচি বৃদ্ধি করে।

৩. মধু কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে।

৪. মধু পেট পরিষ্কার করে।

৫. মধু সর্দি কাশি সারাতে সাহায্য করে।

৬. মধু বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

৭. মধুতে কোনো ফ্যাট বা কোলেস্টেরল নেই। তাই সুস্থ, অসুস্থ, শুকনো, মোটা যে কেউ মধু খেতে পারেন।

৮. সুস্থ মানুষ দিনে ২ চা-চামচ মধু অনায়াসে খেতে পারেন। বেশি মধু খেলে অন্যান্য কার্বো-হাইড্রেট যেমন– ভাত, রুটি, আলু কমিয়ে খেতে হবে। তা-না হলে মোটা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৯. পোড়া ঘায়ে মধু মহৌষধ।

১০. মধু শ্বাসতন্ত্রের ক্ষত রক্ষা করে।

১১. মধু হাঁপানী রোগ দূর করে।

১২. মধু হজমে গোলমালে সাহায্য করে।

১৩. মধু হার্টের অসুস্থতা দূরে করে্

১৪. জিহ্বায় বা মুখে ঘা হলে রাতে ঘুমানো পূর্বে মধুর প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থান সেরে যায়।

১৫. মধু খেলে টাইফয়েড ও আমাশয় রোগের জীবাণু মারা যায়।

১৬. মধু বল ও বীর্য বৃদ্ধিকারক এবং যৌন অক্ষমতা দূরে করে।

১৭. প্রত্যহ চা চামচের ২/৩ চামচ মধু বাচ্চাকে খাওয়ালে ওজনে বেড়ে যায় এবং শরীরের রক্ত কণিকা বৃদ্ধি পায়।

১৮. মধু দুধের মতোই পুষ্টিকর (বাচ্চাদের জন্য দুধের পরই মধুর স্থান)

১৯. বৃদ্ধদের জন্য মধু অমৃত তুল্য।

২০. মধু বাতের ব্যথা উপশমকারী।
২১. মধু মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।
২২. মধু শরীরের ফুসফুসকে শক্তিশালী করে।
২৩. মধু শরীরের পক্ষাঘাত রোগের প্রতিষেধক। মধু মুখের পক্ষাঘাত রোগের প্রতিষেধক।
২৪. মধু রক্ত পরিশোধনকারী।
২৫. মধু মানসিক রোগীর জন্য অত্যন্ত উপকারী।
২৬. মধু চক্ষু রোগ ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির মহৌষধ। মধু চোখে লাগালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।
২৭. মধু মুখের অতিরিক্ত লালা দূর করে।
২৮. মধু ব্যবহারে দাঁত পরিষ্কার ও চমকদার হয় এবং দাতের মাড়ি শক্ত করে।
২৯. মধুর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
৩০. নিয়মিত মধু খেলে শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রণালী পরিষ্কার হয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে যায়।
৩১. সব ঋতুতেই মধু খাওয়া যায়।
৩২. ত্বকের নানা সমস্যা, দাগ সারাতে কিংবা ব্রনের ক্ষত সারাতে মধু এন্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে। এছাড়া ত্বকের সংক্রমণ জনিত ক্ষত, ত্বকের এলার্জির ক্ষেত্রেও মধু ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
৩৩. মধু দুর্বলতা দূর করে, শক্তি সামর্থ দান করে ও দীর্ঘস্থায়ী করে।
৩৪. নিয়মিত মধু সেবনে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে।
৩৫. ইহা জিহবার জড়তা দূর করে।
৩৬. মধু শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করে।
৩৭. মধু মূত্রথলি পরিষ্কার করে।
৩৮. মধু লোমকূপের গোড়া পরিষ্কার করে।
৩৯. মধু উচ্চ রক্তচাপ ও তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪০. জ্বর, নিউমোনিয়া, মৃগী ও কার্ডিওভাসকুলার রোগও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৪১. মধু ত্বকের ময়েশ্চার লস থামায়। যে কোনো ধরনের ত্বকেই মধু ব্যবহার করা যায়। স্বাভাবিক, তৈলাক্ত, শুষ্ক কিংবা মিশ্র।

৪২. মধু ক্লান্ত ত্বকে উজ্জ্বল আভা আনে অর্থাৎ রূপ চর্চাতেও মধুর ব্যবহার স্বীকৃত।

৪৩. যারা রক্ত স্বল্পতায় বেশি ভোগেন, তাদের জন্য নিয়মিত মধু সেবন অত্যন্ত ফলদায়ক।

৪৪. চিনির পরিবর্তে চা, কফি, দুধ, পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে অতি তাড়াতাড়ি এবং সহজেই ক্লান্তি দূর হয়।

৪৫. যাদের ক্ষুধা নেই, নিয়মিত মধু খেলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হবে।

৪৬. মধু অত্যন্ত পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক পানীয় যা সকল দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে আসছে।

৪৭. মধু বার্ধক্যকে দূর করে সজীবতা আনয়ন করে।

৪৮. মধু মুখের রুচি বাড়াতে সাহায্য করে।

৪৯. মধু সেবনে তাৎক্ষণিকভাবে শরীরে শক্তি যোগায়।

৫০. মধু আল্লাহ প্রদত্ত এক অপূর্ব নিয়ামত।

মৌমাছির সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। মধুকে মানুষের রোগ নিরাময়কারী হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। সেই সূরাটি হচ্ছে সূরা নাহল। নাহল অর্থ মৌমাছি। আল্লাহ তায়ালা ফুলের মধ্যে মধুর উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের কল্যাণের জন্য এবং সেই মধু আহরণ করার জন্য মৌমাছিও সৃষ্টি করেছেন। আর ফুলের মধ্য থেকে মধু আহরণের কৌশল আল্লাহ তায়ালা মৌমাছিকে শিক্ষা দিয়েছেন। মৌমাছি ফুল থেকে নেকটার নামক এক প্রকার নির্যাস আহরণ করে। এই নির্যাস ও মৌমাছির পেটে এক প্রকার এনজাইমের সংমিশ্রনের ফলে মধু প্রস্তুত হয়।

বিভিন্ন ভাষায় মধুর নাম

বাংলায়- মধু, ইংরেজিতে- **Honey,** আরবিতে -اَلْعَسَلُ, ফার্সিতে-অঙ্গবীন, হিন্দিতে-মাথী, গুজরাটিতে-মাকদাহ বলা হয় ।

মৌচাকে সাধারণত তিন শ্রেণির মৌমাছি থাকে-

১. রানী মৌমাছি।

২. পুরুষ মৌমাছি।

৩. শ্রমিক মৌমাছি।

১. রানী মৌমাছি : একটি মৌমাছির চাকে একটি মাত্র রানী মৌমাছি থাকে। ডিম পাড়াই রানী মৌমাছির কাজ। রানী মৌমাছি দৈনিক ১২০০-১৫০০ ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার কাজটি সে নিরলসভাবে করে। রানী মৌমাছি যে কুঠুরীতে ডিম পাড়ে তাকে রানী কোষ বলা হয়। রানী মৌমাছিই মৌচাকের প্রাণ। সারাদিন রানী মৌমাছি সমস্ত মৌচাকে ঘুরে বেড়ায়। এ সময় পুরুষ মৌমাছিরা রানীকে ঘিরে রাখে। মনে হয় রাণীকে তারা যেন ভেরিকেট করে রেখেছে। যাতে বাইরের কোনো শত্রু তাদের রানীর কোনো ক্ষতি করতে না পারে। রানীর অভাবে চাকের পুরুষ ও শ্রমিক মৌমাছিরা বিশেষ ব্যাকুল ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রানী মৌমাছি ডিম পাড়া শুরু করলে শ্রমিক মৌমাছিরা তাকে রাজকীয় খাদ্য খেতে দিয়ে থাকে এবং রাজকীয় মর্যাদা দিয়ে থাকে। রানী মৌমাছির ডিম দেয়ার ক্ষমতা শেষ হলে শ্রমিক মৌমাছিরা তাকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলে অথবা কোনো কারণে রানীর মৃত্যু হলে শ্রমিক মৌমাছিরা রানী বাচ্চাকে বিশেষভাবে খাদ্য দিয়ে ও যত্ন করে রানীতে পরিণত করে। একটি মৌচাকে কখনও দুটি রানী থাকতে পারে না। তাই রানীর কুঠুরীতে বাচ্চা রানীর জন্ম হলে তাকে হুল ফুটিয়ে মেরে কুঠুরী থেকে ফেলে দেয়া হয়। আর যদি কোনো কারণে মৌচাকে আর একটি রানী মৌমাছির উৎপত্তি হয় তবে দুই রানীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে হয় এক রানী নিহত হয় নতুবা পরাজয় স্বীকার করে মৌচাক থেকে পালিয়ে যায়। পরাজিত রানী পালিয়ে যাওয়ার সময় কিছু সংখ্যক পুরুষ ও শ্রমিক মৌমাছিও তার অনুগামী হয়।

২. পুরুষ মৌমাছি : একটি মৌচাকে সাধারণত চারশত পুরুষ মৌমাছি থাকে। পুরুষ মৌমাছিরা সাধারণ অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। পুরুষ মৌমাছির কোনো হুল থাকে না। এরা মৌচাকে বসে বসে শ্রমিক মৌমাছিদের সঞ্চিত মধু খেয়ে থাকে। প্রজনন একমাত্র তাদের কাজ। একটি পুরুষ মৌমাছি জীবনে একবারই মাত্র রাণীর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। মিলিত হওয়ার পর পরই পুরুষ মৌমাছির জীবন লীলাও শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ যদি কোনো কারণে পুরুষ মৌমাছির মৃত্যু না হয় তবে শ্রমিক মৌমাছিরা তাকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দেয়।

৩. শ্রমিক মৌমাছি : একটি মৌচাকে ত্রিশ চল্লিশ হাজার শ্রমিক মৌমাছি থাকতে পারে। এই শ্রমিক মৌমাছিরা সব সময় শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং তারা নিঃস্বার্থভাবে মৌচাকের সমস্ত কাজ করে থাকে। এরা অসম্পূর্ণ স্ত্রী জাতের। শ্রমিক মৌমাছিরা যখন মধুর সন্ধানে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ঘুরে বেড়ায় তখন তার সম্পূর্ণ অজান্তে পুরুষ ফুলের পরাগ রেণুর সাথে স্ত্রী ফুলের গর্ভ কেশরের মিলন ঘটে। একটি মৌমাছি একটি কর্মদিনে প্রায় আঠারো হাজার ফুলকে পরাগায়ণ করতে পারে। ২/১ মাইল দূর থেকেও মৌমাছি ফুলের মধু সংগ্রহ করতে পারে।

ডিম হতে মৌমাছিতে পরিণত হতে সময় লাগে-

১. ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হতে সময় লাগে- ১৬ দিন।

২. ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ মৌমাছিতে পরিণত হতে সময় লাগে-২৫ দিন

৩. ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক মৌমাছিতে পরিণত হতে সময় লাগে-২০ দিন।

শত্রুর আক্রমণকে মৌমাছিরা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিহত করে। এরা খুব হিংস্র এবং সহজে পোষ মানে না। উত্যক্ত না করলে সাধারণত : মৌমাছি কামড়ায় না। বিরক্ত করলে তারা হুল ফুটাতে বাধ্য হয়। মৌমাছির দেহ থেকে হুল বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাত্র ২ থেকে ২Error! দিনের মধ্যে সে মৌমাছি মারা যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশের শুধুমাত্র সুন্দরবন এলাকা থেকে বছরে ২০০ টন মধু এবং ৫০ টন মোম সংগৃহীত হয়। এক কেজি মধু সংগ্রহ করতে একটি মৌমাছিকে ৭৫০০০ বার ফুল থেকে মৌচাকে আসা-যাওয়া করতে হয়। মাইলের হিসেবে যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ছয় লক্ষ মাইল। শ্রমিক

মৌমাছিরা ফুলের সন্ধানে মৌচাক থেকে বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়ে। ফুলের সন্ধান পেলে মনের আনন্দে সে তৎক্ষণাৎ মৌচাকে ফিরে আসে। সুন্দর নাচের ভঙ্গিতে ফুল বাগানের সন্ধানের খবর সে সকল মৌমাছিকে জানিয়ে দেয়। তারপর পথ দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে যায় সেখানে মধু আহরণ করতে। বসন্তের আগমনে গাছে গাছে যখন ফুলের সমারোহ চলে, সে সময়ে সবচেয়ে বেশি মধু সংগৃহীত হয়।

মৌমাছির সংখ্যা বেশি হলে অথবা মৌচাকে মধুর সঞ্চয় বেশি হলে অথবা স্থান সংকুলান না হলে মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে যায়। মৌমাছির কামড় বাত রোগীর জন্য বিশেষ উপকারী। মৌমাছি হুল ফুটালে সাথে সাথে হুল তুলে ফেললে এবং মধু ঘষে দিলে খুব তাড়াতাড়ি জ্বালা যন্ত্রণা কমে যায়।

ফুলের সঙ্গে মৌমাছির সম্পর্ক

ফুলের সঙ্গে মৌমাছির এক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ফুলের মধু রসই মৌমাছির একমাত্র খাদ্য। তাই ফুল ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। এই দুইয়ের ঘণিষ্ঠতা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও সুদূর প্রসারী। অন্য অন্য ফুল প্রেমিক কীট পতঙ্গ যেমন ভ্রমন, বোলতা ও প্রজাপতি এরা যেকোনো ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে এবং খেয়ে থাকে কোনো ধরনের বাছ-বিচার নেই। কিন্তু মৌমাছি সেদিক থেকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত এরা এক সময় একই রকম ফুল থেকে মধু পান করে থাকে। অন্য জাতের ফুলের দিকে তখন ফিরেও তাকায় না। কাজেই এই প্রক্রিয়ায় বহু গাছের ফুল নিজ জাতের পরাগ রেণু প্রাপ্তির সুযোগ পায় মৌমাছির সাহায্যে। আর বেশি বীজ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়। এই প্রাকৃতিক অনুবন্ধনের জন্য প্রায় ১০ হাজার বৃক্ষ প্রজাতি বেঁচে আছে মৌমাছির সহায়তায়। মৌমাছির মানব কুলকে দুটো অত্যন্ত মহতী জিনিস দিয়ে থাকে। একটি হলো চিনি থেকেও মিষ্টি "মধু" ও অপরটি হলো সব থেকে হাল্কা "মোম"।

পুষ্প রস (নেকটার) যেভাবে মধুতে পরিণত হয়

মাঠ, বাগান, ক্ষেত, পাহাড়, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জায়গা থেকে মৌমাছি দলে দলে ফুলের নির্যাস বয়ে আনে তাদের মৌচাকে। আর সেখানে বসে থাকা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মৌমাছির মুখের ভিতর +ও ঢুকিয়ে দেয় পুষ্পরস অর্থাৎ

ফুলের নির্যাস। এই নবীন দল জিহ্বা বিস্তার ও সংকোচন করে রসের পানির ভাগ অনেকাংশে কমিয়ে আনে।

তারপর তাদের গ্লান্ডের এ্যানজাইম বা উৎসেচক দ্বারা ধীরে ধীরে পরবর্তীতে হয় লেভুলোজ ডেক্সট্রোজে। এই গাঢ় রস মধু চক্রের কোষে মোম দিয়ে ঢেকে সংরক্ষিত করে রাখে। এতে এ্যানজাইম সক্রিয় থাকে এই সঞ্চিত রসে। ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই সংরক্ষিত 'সবুজ মধু' সোনালী গাঢ় মধুতে পরিণত হয়।

একটা মৌমাছি কত মধু সংগ্রহ করে

একটি মৌমাছি এক পাউন্ড মধু সংগ্রহ করতে পনের হাজার বার মধু গ্রহণে যেতে হয়। তাদের সব কর্মকান্ড নিয়ম শৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ। একটি মৌমাছি দিনে তার ওজনের ১০গুণ মধু আহরণ করে থাকে ফুল থেকে ফুলে।

এক হিসেবে দেখা গেছে, একটি চাক বাঁচাতে প্রায় ১৭ মিলিয়ন মাইল মৌমাছিদের উড়তে হয় মধু সংগ্রহে। মৌমাছিরা এতই কর্তব্য পরায়ণ যে, বসন্ত ও গ্রীষ্মে ৬/৭ সপ্তাহের উত্তুঙ্গ আহরণ পূর্বে উড়ে উড়ে সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে আকাশেই বহু মৌমাছি ঝড়ে পড়ে বীরোচিত মৃত্যুবরণ করে থাকে।

চার হাজার বছরের পুরনো মধু পাওয়া গিয়েছে মিশরের পিরামিডে। সে মধু এখনও অক্ষুণ্ন, অবিমিশ্র ও খাঁটি।

২. দুধ
MILK

কুরআন করীমে দুধ

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

مِّنۡ لَّبَنٍ لَّمۡ یَتَغَیَّرۡ طَعۡمُهٗ وَاَنۡهٰرٌ

অর্থ : "জান্নাতে দুধের এমন নহর প্রবাহিত হবে যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَّ بَیۡنِ لَبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰ

অর্থ : স্বচ্ছ নির্মল নির্ভেজাল ও খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও উপাদেয়।" (সূরা নাহল : আয়াত-৬৬)

হাদীসে নববীতে দুধ

সুহাইব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, "তোমরা অবশ্যই গাভীর দুধ পান করবে। কেননা, এর মধ্যে শেফা রয়েছে এবং ঘি-এর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। আর গোশতের মধ্যে রোগ রয়েছে।
(যাদুল মাআদ : খণ্ড-২)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ-ব্যাধি পাঠাননি যার ঔষধ প্রেরণ করেননি। আর গাভীর দুধের মধ্যে প্রতিষেধক রয়েছে। (মুসদাতরাক, অধ্যায়-তিব্ব)

শেফার কারণ বর্ণনা করা হলো- فَاِنَّهَا تَقُوۡمُ مِنۡ کُلِّ شَجَرٍ

অর্থাৎ "গাভী সব ধরনের গাছের পাতা খেয়ে থাকে।" (মুসতাদরাকে হাকেম)

আবু নঈম (রা), ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, "পানীয় বস্তুসমূহের মধ্যে রাসূল (সা)-এর নিকট দুধ প্রিয় ছিল।"

দুধের উপকারিতা

দুধ ও মধু হাজারো ফুল ও ফুলের নির্যাস-এর মাধ্যমে তৈরি। বিশ্বের সমস্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানী একত্রিত হয়েও উক্ত নির্যাস তৈরি করতে পারবে না।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই স্বীয় হেকমত ও কর্ম কৌশলের মাধ্যমে নিজ বান্দার জন্য এ রকম উৎকৃষ্ট পানীয় সৃষ্টি করেছেন।

দুধের উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, দুধ কামভাব বৃদ্ধি করে, শরীরের শুষ্কতা বিচ্যুরিত করে এবং শীঘ্রই পরিপাক হয়ে খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। দুধ বীর্য উৎপাদন করে। মুখের লাবণ্যতা বৃদ্ধি করে, দুষিত পদার্থ বের করে দেয় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে।

মায়ের দুধের পুষ্টিগুণ

শিশুর সর্বোত্তম খাদ্য হলো মায়ের দুধ। শিশু জন্মানোর ৪/৫ ঘণ্টা পর থেকেই বুকের দুধ দেয়া প্রয়োজন। শাল দুধের উপকারিতাও অনেক বেশি। মায়ের দুধ শিশুকে যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে, মস্তিষ্কের গঠনে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করতে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিশুর ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, কান ও মূত্রনালীর সংক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাতৃদুগ্ধের ফলে শিশুর গ্রোথ হরমোন (Growth Hormone) নিঃসৃত হয়, যা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং মুখমণ্ডলের সঠিক রূপদানে সহায়তা করে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, মা ও শিশুর মধ্যে প্রগাঢ় নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিশুর জন্মের প্রথম পাঁচ মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর ফলে পরিবেশ ঘটিত অসুস্থতা, অপুষ্টি, খাদ্য সংবেদনশীলতা ও এলার্জীর সম্ভাবনা কমে যায়। মায়ের বুকের দুধ শুধুমাত্র শিশু নয়, মায়ের জন্য উপকারী। মাতৃদুগ্ধদান হচ্ছে গর্ভাবস্থা ও সন্তানের প্রসবোত্তর মৌলিক অত্যাবশ্যকীয় শরীর বৃত্তিয় ধারাবাহিকতা। ফলে শিশু জন্মের পরই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করলে প্রসব পরবর্তী অত্যধিক রক্তপাত ও রক্ত স্বল্পতার ঝুঁকি কমে যায়। এছাড়া গর্ভফুলটি তাড়াতাড়ি পড়ে যায় ও প্রসবের পর বেশি রক্তক্ষরণ হয় না। মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ফলে মাকে স্লীম রাখতে সহায়তা করে এবং মায়ের রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে পুনরায় গর্ভাবস্থার সম্ভাবনা বিলম্বিত করে। বিশেষত: শিশু যদি একটানা দুই মাস বুকের দুধ পান করে তবে এ ক্ষেত্রে গর্ভধারণের সম্ভাবনা শতকরা ৯৮ ভাগ কমে যায় এবং মায়ের শরীরের ইনসুলিনের চাহিদা কমিয়ে দেয়। এমনকি মায়ের ডিম্বাশয়ে ক্যান্সারের

সম্ভাবনা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। শিশু জন্মের প্রথম পাঁচ মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধ শিশুর বিভিন্ন প্রকার পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম। ফলে দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ শিশুর পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে ভূমিকা পালন করে। মায়ের দুধে ফ্যাটি এসিড রয়েছে যা শিশুর বুদ্ধিদীপ্ততা ও চোখের তীক্ষ্ণতা বা জ্যোতি বাড়ায়।

দুধের পুষ্টিগুণ

১০০ গ্রাম দুধে নিম্নোক্ত খাদ্য উপাদান বিদ্যমান।

মায়ের বুকের দুধে আছে -

১. প্রোটিন : ১.০ গ্রাম

২. স্নেহ পদার্থ : ১.৯ গ্রাম

৩. শর্করা : ৭.০ গ্রাম

৪. ক্যালসিয়াম : ১.৩২ মি. গ্রাম

৫. লৌহ : ০.২ মি. গ্রাম

৬. ক্যালরী : ৬৭

একমাত্র মায়ের দুধেই Docosa Hexaenoic Acid বা D.H.A নামক এক ধরনের Long Chain Fatty Acid বিদ্যমান। বিস্ময়ের বিষয় হলো অন্য কোনো দুধে (গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, পাউডার দুধে) এই D.H.A থাকে না। আর এ কারণেই চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী প্রাণী বিবেক বুদ্ধিহীন। মায়ের বুকের দুধে D.H.A থাকে বলেই মানুষ এত বুদ্ধিমান।

মাতৃদুগ্ধ প্রয়োজনীয় যে, মাতৃহারা কোনো শিশুকে দুধ দেয়ার অধিকারী অন্য মাতাকে দেয়া হয়েছে। শিশুরা মাতৃ-দুগ্ধ পানের পরে পাকস্থলীতে এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় দইয়ে পরিণত হয়। পাকস্থলীর এনজানি দইকে পরিপাক করে সরল খাদ্যে পরিণত করে এবং ডিওডেনামের ভিলাই দ্বারা তা শোষিত হয়। অবশেষে মলমূত্র বের করতে পারবে না। কিন্তু শিশুরা দুধ খেয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে পারে। শিশুর জন্য এ দুধের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। যা কুরআন অনেক আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে।

গাভীর দুধের পুষ্টিমান

১০০ গ্রাম গাভীর দুধে নিম্নোক্ত খাদ্য বিদ্যমান।

১. প্রোটিন : ৩.৩ গ্রাম

২. স্নেহপদার্থ : ৩.৬ গ্রাম

৩. শর্করা : ৪.৮ গ্রাম।

৪. ক্যালসিয়াম : ০.১২ মি. গ্রাম

৫. লৌহ : ২.০ মি. গ্রাম

৬. ক্যালরী : ৭১

ছাগলের দুধের পুষ্টিগুণ

১০০ গ্রাম ছাগলের দুধে নিম্নোক্ত উপাদান বিদ্যমান।

১. প্রোটিন : ৩.৭ গ্রাম।

২. স্নেহ পদার্থ : ৫.৬ গ্রাম

৩. শর্করা :৪.৭ গ্রাম।

৪. ক্যালসিয়াম : ০.১৭ মি. গ্রাম

৫. লৌহ : ০.৩ মি. গ্রাম

৬. ক্যালরী : ৮৪ গ্রাম এছাড়া দুধে শ্বেতসার থাকে। দুধের শ্বেতসারকে ল্যাকটোজ বলা হয়।

৩. মায়ের দুধ
MOTHER'S MILK

ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে স্তন্যদান উল্লেখযোগ্য হারে স্তনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে পারে। ত্রিশটি দেশে ৪৭টি গবেষণা কর্মের ওপর ভিত্তি করে প্রায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, উন্নত দেশসমূহে অল্প সন্তান এবং স্বল্প সময় স্তন্যদান মহিলাদের অধিক হারে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের জন্য দায়ী।

যুক্তরাজ্যে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা খুবই বেশি। সেখানে প্রতি বছর প্রায় ৩৯ হাজার নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ (১২,৭০০) মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। একই গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি সন্তান ধারণের জন্য ৭.০% (সাত শতাংশ) হারে এবং প্রতি এক বছর স্তন্যদানের জন্য আরও ৪.৩% হারে স্তনের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে ৬৯% মা স্তন্যদান শুরু করলেও মাত্র চার মাস পরে অর্ধেকেরও বেশি মা স্তন্যদান বন্ধ করে দেন। অথচ মায়েরা অন্তত ছয় মাস স্তন্যদান করলে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতি বৎসর এক হাজার কমে যেতে পারে। যুক্তরাজ্যে সত্তর বৎসর বয়সে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের হার ৬.৩% হলেও উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই হার মাত্র ২.৭%। অধিক সন্তান ও দীর্ঘমেয়াদে স্তন্যদানের কারণ উন্নয়নশীল দেশসমূহে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের হার কম বলে গবেষকগণ মনে করেন।

ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে-এর প্রধান নির্বাহী স্যার পল নার্স বলেন, আমরা যত কারণ আবিষ্কার করেছি তার প্রতিটিই এই ধারণাকে আরও মজবুত করে যে, হরমোন এবং সন্তান জন্মদানের মতো বিষয়সমূহ অবশ্যই স্তনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (সূত্র : ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, বিএমজে, ২০০২ : ৩২৫ : ১৮৪ (২৭ জুলাই)

এছাড়াও সুবিখ্যাত শিশু চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ আমানউল্লাহ বলেন, শিশু জন্মগ্রহণের পর প্রথম দু বৎসর মায়ের দুধ তার জন্য অপরিহার্য এবং খুবই উপকারী। কারণ এই দু বৎসরের মধ্যে শিশুদের মস্তিষ্কের উন্নতি সাধিত হয়। তাই এই সময়ে উক্ত শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প কিছু নেই।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই পবিত্র কুরআনের আলোকে প্রত্যেক নবজাতক শিশুকে কমপক্ষে দু বৎসর তার মায়ের দুধ খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমন– আল কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ-

অর্থ : আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বৎসর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৩)

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা নবজাতক শিশুদের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে যা বলছেন, তা মহানবী (সা) তাদের বহুপূর্বেই বলে গেছেন।

শিশুদের জন্যে মায়ের দুধ উত্তম খাদ্য

মায়ের বুকের দুধ পান করলে শিশু মানসিক এবং শারীরিক দিক হতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বারোটি উন্নয়নশীল দেশে শিশু মৃত্যুর হার রোধ করার উদ্দেশে ইউনিসেফ একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির নামকরণ করা হয় 'মায়ের দুধই সেরা'। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, মায়ের দুধ না পাওয়ার কারণে প্রতি বছর ১০ লাখ শিশুর মৃত্যু ঘটে। কয়েক মিলিয়ন শিশু মায়ের দুধ না পাওয়ার কারণে ইনফেকশনের শিকার হয় এবং নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে যায়।

এ কর্মসূচি যেসব দেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছিলো সেগুলো হচ্ছে, পাকিস্তান, বিলোটিয়া, ব্রাজিল, মিসর, ঘানা, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং তুরস্ক। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের দুধ খাওয়ানোর বিজ্ঞানসম্মত সুযোগ বৃদ্ধি করা। জাতিসংঘের সাহায্যপুষ্ট এ সংস্থার বক্তব্য হচ্ছে, বহু হাসপাতালে মায়ের দুধ না পাওয়ার কারণে শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে দুধ সরবরাহ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে ইউনিসেফ জানিয়েছে, মায়ের বুকের দুধ যেসব শিশু পান করে তাদের বোতলের দুধ পান করা শিশুদের চেয়ে শতকরা দশ ভাগ কম হাসপাতালে নিতে হয়। একথা একশভাগ প্রমাণিত হয়েছে যে, যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তারা মানসিক দিক হতে সুস্থ থাকে। কারণ মায়ের দুধ

স্বাভাবিকভাবে শিশুদের পুষ্টি ও শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। ইউনিসেফ নারী সংগঠনগুলোর কাছে অনুরোধ জানিয়েছে তারা যেন ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালায় যে, মায়ের দুধ পান করা শিশুর স্বাভাবিক অধিকার। বিশেষত গর্ভবতী মায়েদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে হবে। তারা যেন তাদের সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ানোর মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তারা মেধাবী হয়

যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করে তারা অধিক মেধাবী হয়ে গড়ে ওঠে। তারা নানা প্রকার রোগ হতে মুক্ত থাকে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ পান করেনি তারা স্কুলের ক্লাসে প্রায়ই চুপচাপ থাকে। তাদের বন্ধুর সংখ্যাও কম। গবেষণা অনুযায়ী মস্তিষ্ক রোগ সিজোফ্রেনিয়ার শিকার ৭০ ভাগ শিশুর আইকিউ রেকর্ড করা হয়েছে ১১০ এবং গাভীর দুধপানকারী শিশুদের আইকিউ রেকর্ড করা হয়েছে ১০০। একজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞের হিসাব অনুযায়ী মায়ের দুধের মধ্যে এমন কিছু অংশ থাকে, যা শিশুর মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অথচ গাভীর দুধে এরকম শক্তি থাকে না।(রিসার্চ রিপোর্ট)

যেসব মা শিশুকে দুধ পান করায় তাদের স্তন ক্যান্সার কম হয়

বর্তমানে দেখা যায়, কোনো মহিলার স্তনে গুটি দেখা দিলে সে মহিলা আশংকা করে তার স্তনে ক্যান্সার হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা ধারণা করা ভুল যে, তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে এবং চিকিৎসা অর্থহীন। কেউ কেউ স্তনের গুটি দেখানোর জন্যে ডাক্তারের কাছে যেতে বিলম্ব করে। অথচ এটা হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে যদি কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হয় তবে বিষয়টি জটিল হয়ে যায়। তার ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়।

স্তনে গুটি দেখা দিলে অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে ডাক্তারের সঙ্গে অবশ্যই পরামর্শ করতে হবে। গুটি ছোট থাকার সময়ে চিকিৎসায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশি বয়সে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে এর সাথে অন্য সমস্যা যুক্ত হয়ে মৃত্যু ত্বরান্বিত হতে পারে। স্তন ক্যান্সার শুনতে যতোটা গুরুতর মনে হয় বাস্তবে কিন্তু ততোটা গুরুতর নয়। বৃটেনের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় এ রোগে আক্রান্ত রোগীদের সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয়েছে। বলাবাহুল্য, মহিলাদের যেসব গুটি দেখা

দেয় তার ১০টির মধ্যে একটি ক্যান্সার বাকি ৯টি সাধারণ গুটি বা ফুঁসকুড়ি। যাদের স্তনে ক্যান্সার হয় তাদের অধিকাংশেরই স্তন কেটে ফেলার প্রয়োজন হয় না। যেসব মহিলার তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তাদের শতকরা ৮৫ ভাগ স্তন ক্যান্সার হওয়ার পরও ৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সময়ে তারা থাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারে। তবে রোগীর আত্মবিশ্বাসও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাকে চিন্তা করতে হবে, আমার কিছু হবে না, আমি পরাজিত হবো না। বর্তমানে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তদের জন্যে বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। যেসব উপায় অনুসরণ করা হলে স্তন ক্যান্সার রোধ করা যায় এখানে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে।

১. মোটাসোটা মহিলাদের স্তন ক্যান্সার বেশি হয়ে থাকে। সুস্থ থাকার সময় হতেই এদের চর্বিযুক্ত খাবার কম খেতে হবে। ওজন কমাতে হবে। খাদ্য তালিকায় সবজি, তরকারি, ডাল বাড়িয়ে দিতে হবে।

২. ত্রিশ বছর বয়স হওয়ার আগে যদি মহিলাদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৩. যেসব মহিলা সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ায় তাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের অধিকাংশ সুস্থ হওয়ার পর বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। ডাক্তার এস এ-এর রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. কালজিরা

BLACK CUMIN-SEED

কালিজিরা পরিচিতি

বাংলা নাম : কালিজিরা

ফার্সী নাম : শোনিজ

আরবি নাম : হাব্বাতুস সওদা

ইংরেজি নাম : Black cumin

বৈজ্ঞানিক নাম : Nigella sativa

"নাইজেলা" শব্দটি ল্যাটিন ভাষা নাইজেলাস বা নাইগার শব্দ থেকে উৎকলিত। যার অর্থ হলো "কালো"। ইতিহাস থেকে জানা যায়, রোমীয়রা কুলিনারী অর্থাৎ রান্নার কাজে ইহা ব্যবহার করত। গ্রিকরা ঔষধি ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করত। পরবর্তীতে পারস্য ও ভারতে এর ব্যবহারের প্রচলন ঘটে। ভারত উপমহাদেশে রান্না-বান্নাসহ রোগ নিরাময়েও এর ব্যবহার হয়ে এসেছে। রাসূল (সা)-এর কালিজিরা সম্পর্কিত মহামূল্যবান বাণীর প্রেক্ষিতে ইহা ভেষজ বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের দ্বার উন্মুক্ত করে। বিগত শতাব্দীতে মিশর, অস্ট্রেলিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, ভারতসহ বিভিন্ন দেশেও এই ভেষজের ওপর নানাবিধ গবেষণা করা হয়।

কালিজিরার অন্যতম কার্যকরী উপাদানসমূহ হলো

কালিজিরা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন-

اَلْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ-

আবু সালামা (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কালিজিরা ব্যবহার করবে। কেননা, কালিজিরা প্রত্যেক রোগের ঔষধ মৃত্যু ছাড়া।"

(সহীহ বুখারী, হা/৫৬৮৮ ও সহীহ মুসলিম হা/৫৮৯৬)

প্রথম বার

ডান নাশারন্দ্রে : ২ ফোঁটা

বাম নাশারন্দ্রে : ১ ফোঁটা

দ্বিতীয়বার

বাম নাশারন্দ্রে : ২ ফোঁটা

ডান নাশারন্দ্রে : ১ ফোঁটা

তৃতীয় বার

ডান নাশারন্দ্রে : ২ফোঁটা

বাম নাশারন্দ্রে : ১ ফোঁটা (তিরমিযী)

কালিজিরার উপকারিতা (খাওয়াসুল আদভিয়া হতে বর্ণিত)

১. ঠাণ্ডা জাতীয় ব্যাধি : সর্দি, কাশি, কফ ইত্যাদিতে অত্যন্ত উপকারী। পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস ও কম্পন রোগে কালিজিরার তৈল মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

২. যৌন ব্যাধি : স্নায়ুবিক দুর্বলতায় উপকারী।

৩. সর্দি, কাশি, বুকের ব্যথা, পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয়, উর্ধ্বমুখী বায়ুতে উপকারী।

৪. প্রসূতী রোগে উপকারী।

৫. Acne vulgaris তথা ব্রণের জন্য উপকারী

৬. শ্লেষ্মা বা বলগমী রোগির জন্য খুবই উপকারী।

৭. মূত্রথলীতে পাথর থাকলে মধুর সাথে কালিজিরা খেলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়।

৮. সুদরে হায়েজ বা অধিক ঋতুস্রাবের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

৯. মাত্রাতিরিক্ত প্রস্রাব প্রতিরোধক।

১০. ইহা কৃমি নাশক।

১১. মায়ের দুগ্ধ আনয়ন করে। (কিতাবুল মুফরাদাতি : খাওয়াসুল আদভিয়া)

কালিজিরা বীজ তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

কালিজিরার তেলে নানাবিধ মূল্যবান কার্যকরী উপাদান সনাক্ত করা হয়েছে। নিম্নে চার্টের সাহায্যে তা পেশ করা হলো-

Essential Oil's composition -কালিজিরা তেলে এদের শতকরা হার।

১ নং চার্ট

অত্যাবশ্যকীয় তেলের উপাদানসমূহ

১. কার্বন : ২১.১%

২. আলফা পাইনিন : ৭.৪%

৩. সাবিনিন : ৫.৫%

৪. বেটা পাইনিন : ৭.৭%

৬. অন্যান্য : ১১.৫%

২নং চার্ট

পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান কালিজিরা তেলে এদের শতকরা হার

১. প্রোটিন/আমিষ ২১.১%

২. কার্বোহাইড্রেট/শর্করা ৩৫%

৩. ফ্যাট / চর্বি ৩৫-৩৮%

৩নং চার্ট

নিউট্রিশনাল ভ্যালু পমিাণ

১. প্রোটিন	২০৮ মাইক্রোগ্রাম/গ্রাম		
২. থায়ামিন	২৫	"	"
৩. রিবোফ্লাভিন	১	"	"
৪. পাইরিডক্সিন	৫	"	"
৫. নায়াসিন	৫৭	"	"
৬. ফ্লোসাসিন	৬১০	"	"
৭. ক্যালসিয়াম	১.৮৫	"	"
৮. আয়রন	১০৫	"	"
৯. কপার	১৮	"	"
১০. জিংক	৬০	"	"
১১. ফসফরাস	৫.২৬৫	"	"

(বিঃ দ্রঃ উপরিউক্ত উপাদানগুলো প্রতি গ্রামে উপরিউক্ত পরিমাণে বিদ্যমান।)

কালিজিরা তেলের মধ্যে ১০০ মাইক্রোগ্রামে ফ্যাটি এসিডের মধ্যে নিম্নোক্ত অনুপাতে উল্লিখিত উপাদানগুলো বিদ্যমান

ফ্যাটি এসিড

১. মায়রিসটিক এসিড / Myristic Acid- ০.৫%

২. প্যালমিটিক এসিড / Palmitic Acid- ১৩.৭%

৩. প্যালমিটোলিক এসিড / Palmitolic Acid-০.১%

৪. স্টেয়ারিক এসিড / Stearic Acid-২.৬%

৫. ওলিক এসিড / Oleic Acid-২৩.৭%

৬. লিনওনিক এসিড/ Linonic Acid-৫৭.৯%

৭. লিনওলিক এসিড/ Linoleic Acid-০.২%

৮. এরাসিডিক এসিড/ Arachidic Acid1.৩%

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড

Saturated & unsaturated fatty Acid

১. সম্পৃক্ত এসিড (Saturated Acid)

২. এক অণু অসম্পৃক্ত এসিড (Mono-unsaturated Acid)

৩. বহু অণু অসম্পৃক্ত এসিড (Poly-unsaturated)

কালিজিরার ব্যবহার ও গুণাগুণ

১. **নার্ভাস টেনশনে :** এক কাপ চায়ের সাথে এক চা চামচ কালিজিরা তেল সেবনে স্নায়ুবিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

২. **কফ এবং এ্যাজমা :** কালিজিরা তেল বুকে পিঠে মাখলে এবং প্রত্যহ সকাল + দুপুর + সন্ধ্যায় এক চা চামচ তেল সেবনে কফ ও এ্যাজমাতে বিশেষ কার্যকরী।

৩. মেধা বা মেমোরী শক্তি বৃদ্ধিতে প্রত্যহ সকালে এক কাপ - চা এর সঙ্গে এক চা চামচ কালিজিরার তেল মিশ্রিত করে পান করলে বিশেষ উপকারি পাওয়া যায়।

৪. **হৃদরোগ ও ব্লাড ভেসেল স্টেনোসিস :** কালিজিরা + রসুন জোশান্দা আকারে বা চায়ের মতো নিয়মিত খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায় এবং শিরা-ধমনীর চর্বিকে গলিয়ে বের করতে সক্ষম।

৫. এছাড়া ইহা ডায়াবেটিস, মেনিনজাইটিস, যৌন-অক্ষমতাসহ বিভিন্ন রোগে কার্যকর। তবে রোগ বিশেষ ইহার ব্যবহার বিভিন্নমুখি হয়ে থাকে।

ক. গবেষকরা দেখেছেন যে, এই তেলের এমন কিছু কার্যকরী উপাদান রয়েছে যা কান্সার কোষ তৈরির কার্যকরী টক্সিন উপাদানের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল এবং রক্তের টক্সিসিটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

খ. সাউথ ক্যারোলিনার একদল গবেষক তাদের ল্যাবটরিতে গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, এর কার্যকরী উপাদান থাইমোকুইনোলাইন এবং ডাই থাই-মোকুইনোন। উভয়ই টিউমার কোষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গ. কালিজিরাতে বেশ কিছু পুষ্টিকর কার্যকরী উপাদান রয়েছে, যা লিম্ফসাইট কোষ তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং এন্টি-বডি তৈরিতে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল।

ক্যান্সার প্রতিরোধে কালিজিরা

আমেরিকার বিখ্যাত প্রফেসর ডঃ মোকামাল বলেছেন, ক্যান্সার সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো ফ্রি-রেডিক্যাল বা মুক্তমূলক। কালিজিরা তেলের essential oil তথা অত্যবশ্যকীয় তেল ঐসব মুক্তমূলক বা ফ্রি-রেডিক্যালগুলোর চতুর্দিকে একটি Bond তথা বন্ধন তৈরি করে, এতে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরকে ক্যান্সার মুক্ত করে। পরবর্তীতে একে মল-মূত্র ঘাম ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে অনেকেই বলেন, যখন কোনো লোককে পাগলা কুকুরে কামড় দেয়, তখন হতে পরবর্তী ১০/১২ দিন যদি সে লোক দুই বেলা করে পৌনে এক তোলা Error! পরিমাণ কাল জিরা গরম পানির সাথে সেবন করে তবে তার জলাতংক রোগ হবে না। কোনো লোকের শরীরে যদি পানি আসে, তখন যদি সে প্রতিদিন দুই বেলা করে ৭ দিন নিয়মিতভাবে আধা তোলা Error! করে কলিজিরা চিবায়ে খায় তবে তার শরীরের পানি কমে যাবে। (মুরাককাবাতে মুফরাদা, পৃষ্ঠা- ২৬৬)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, গর্ভবতী মেয়েরা বাচ্চা প্রসবের পর যদি কালিজিরা চিবায়ে বা পিষে খায় তবে তার পেশাবের বেগ বাড়বে এবং এতে

তার গর্ভথলী দ্রুত পরিষ্কার হবে এবং এই পেশাবের সাথে দেহের নানা দূষিত পদার্থ বের হয়ে আসবে এবং এতে সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনেকেই আরও বলেন, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কালিজিরা সেবন করলে মাথার সর্বময় রোগের জন্য বিশেষ উপকার সাধন করে এবং এতে পেশাবের বেগ বৃদ্ধি পায়, ফলে কিডনী রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে।

অথচ– মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই কালিজিরা যে সর্বরোগের ঔষধ একথা তিনি তার হাদীসে বলে গেছেন। যেমন :

اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلْمَةَ وَسَعِيْدٌ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ ـ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ وَالسَّامُ اَلْمَوْتُ ـ

অর্থ : ইবনে শিহাব বলেন আমাকে সংবাদ দিয়েছে আবূ সালমা ও সাঈদ বিন মুসাইয়িব, নিশ্চয় আবু হুরায়রা উভয়কে সংবাদ দেয়, নিশ্চয় তিনি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছেন, মহানবী (সা) বলেছেন, কালিজিরার মধ্যে 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের চিকিৎসার উপকরণ রয়েছে। তখন ইবনে শিহাব (রা) বলেন, 'সাম' হচ্ছে মৃত্যু। অর্থাৎ মহানবী (সা) বলেছেন, কালিজিরার মধ্যে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে।

(বুখারী, হা/৫৬৮৮ ২য় খণ্ড, ৮৪৯ পৃষ্ঠা, কিতাবুত তিব।)

৫. খেজুর
DATE

কুরআনে কারীমে খেজুর

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا-

অর্থ : "আমি জমিনে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যাইতুন ও খেজুর বৃক্ষ।" (সূরা-আবাসা : আয়াত-২৭)

আল্লাহ তায়ালা সূরা নাহলে খেজুর ও আঙ্গুরের কথা উল্লেখ্য করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سُكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا-

অর্থ : "খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা সাকার ও উত্তম খাদ্য তৈরি কর। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।"

(সূরা নাহল : আয়াত-৬৭)

এছাড়া সূরা আনআমের নিরানব্বই নম্বর এবং সূরা মরিয়মের তেইশ নম্বর আয়াতেও খেজুর এবং খেজুরের উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

খেজর সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান উদ্ধৃতি

খেজুরের সাথে যৌন শক্তির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য আকদ এবং বিয়ের সময় খেজুর ছিটানোর প্রাচীন পদ্ধতি চলে আসছে। শুষ্ক খেজুর চুষলে পিপাসা নিবারণ হয়। এজন্য অধিকাংশ হালুয়া ও কাষ্টারে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রসূতি মায়েদের জন্য তাজা খেজুরের চেয়ে উত্তম কোনো পথ্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা মারইয়াম (আ)-কে ঈসা (আ)-এর জন্মের সময় খেজুর খাইয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَهُزِّىْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا-

"খেজুরের শাখা নিজের কাছে টেনে নাও। তোমার ওপর তাজা পাকা খেজুরগুলো পড়তে থাকবে।" (সূরা মরিয়ম : আয়াত-২৫)

খেজুর শরীরের শিরার কোমলতা সৃষ্ট ব্যথা উপশম করে থাকে।

আবু নঈম (রহ) "কিতাবুত তিব্ব" এ লিখেছেন, রাসূল (সা)-এর কাছে মাখন মিশ্রিত খেজুর অত্যধিক প্রিয় ছিল।

ওলামায়ে কিরাম লিখেছেন, খেজুর ভক্ষণে কামশক্তি বৃদ্ধি পায়, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হয়। (তিব্বে নববী)

হাদীসে আজওয়া খেজুর

আজওয়া খেজুর হৃদ-রোগের মহৌষধ

আজওয়া খেজুর সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর পবিত্র বাণী সায়ীদ (রা) বর্ণনা করেন। একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (সা) আমাকে দেখতে তাশরীফ নিয়ে এলেন। রাসূল (সা) স্বীয় হস্ত মোবারক আমার বুকের ওপর রাখলেন। রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাতের শীতলতা আমার অন্তর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। অতঃপর রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করলেন, তুমি অন্তরে কষ্ট অনুভব করছ। তুমি হারেস ইবনে কালদাহ কাফিরের নিকট যাও। কারণ সে একজন চিকিৎসক। সে যেন মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর নিয়ে বীজসহ পিশে তোমার মুখে ঢেলে দেয়।

(আবু দাউদ, মিশকাত)

আজওয়া খেজুর, বিষের মহৌষধ

আজওয়া খেজুর মধ্যম আকৃতি হয়ে থাকে। এর ঘনত্ব ও মাধ্যম ধরনের এবং কালচে বর্ণের হয়। এই খেজুর সম্পর্কে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন-

وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ -

অর্থ : "আজওয়া জান্নাতের ফল। এর মধ্যে বিষের নিরাময় রয়েছে।

(তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ.

অর্থ : " সা,আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেন। রাসূল (রা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে সে দিন বিষ এবং যাদু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

(বুখারী, হা/৫৭৬৯)

আজওয়া খেজুর খুব মুল্যবান। বাংলাদেশে ১ কেজি খেজুরের দাম প্রায় ২০০০ থেকে ২৫০০ টাকা। বাংলাদেশের খুব কম জায়গায় এই খেজুরটি কিনতে পাওয়া যায়। আজওয়া খেজুরের জন্য বিখ্যাত মক্কা ও মদিনাই।

বরণী খেজুর

আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, "তোমাদের খেজুরগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম খেজুর হলো বরণী। এটা রোগ নিরাময় করে এবং এতে কোনো রোগ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।" (মুস্তাদরাকে হাকিম)

বরণী খেজুরের পরিচিতি

এই খেজুর কালো নয়। সামান্য লালিমা মিশ্রিত কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এর আকার অন্যান্য খেজুরের তুলনায় বড় এবং খুবই মিষ্টি ও স্বাদযুক্ত। শাস অধিক এবং বীচি ছোট হয়। এ কারণে সবাই এই খেজুর পছন্দ করে। রাসূল (সা) এই বরণী খেজুরকে রোগের ঔষধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

রাসূল (সা) হাসীস পছন্দ করতেন

মা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। "রাসূল (সা) হাসীস" পছন্দ করতেন। হাসীস তিনটি উপাদান যোগে প্রস্তুত করা হয়।

১. খেজুর ২. মাখন এবং ৩. জমাট দই। ইহা শারীরিক ও মানসিক শক্তিবর্ধক। ইহা যৌবন বর্ধক হিসেবে কাজ করে। খেজুরের সাথে তিল, কালিজিরা ও রসুন উপাদান যৌগে যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে।

সর্বোপরি খেজুর বিশ্বের একটি নন্দিত ফল। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই ফলটি অতি গুরুত্বের সাথে পুষ্টিকর ফলের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য (যেমন সিরকা) হিসেবে ব্যাপক সমাদর রয়েছে। মুসলিম পরিবারে খেজুর ব্যতীত যেন ইফতারী অসমাপ্ত রয়ে যায়।

খেজুর জন্মের ভৌগোলিক অবস্থান

মরুভূমিতে ইহা বেশি জন্মে। সেই সূত্র ধরেই আরব, ইরাকে বেশি জন্মে। এছাড়া পাকিস্তান, ভারতেও বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয়ে থাকে।

খেজুর ও কাকড়ি

আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে তাজা খেজুর এবং কাকড়ী একত্রে খেতে দেখেছি।"

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

রাসূল (সা)-এর খাওয়ার এই পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। رطب পাকা তরু-তাজা খেজুরকে বলে। কাঁচা হোক বা শুকনা হোক খেজুরের মেজাজ বা প্রকৃতি বা তাপমাত্রা গরম বা উষ্ণ হয়ে থাকে। অপরদিকে কাকড়ীকে আরবিতে কিসসা বলা হয়।

মূলত : কাকড়ী আদ্র ও শীতল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এ কারণে রাসূল (সা) খেজুরের উষ্ণ বা গরম স্বভাব বা মেজাজকে সমতায় আনায় জন্য এর সাথে শীতল-আদ্র প্রকৃতি বা মেজাজের খাদ্য কাকড়ী ফল সঙ্গে খেতেন।

কাঁকড়ির উপকারিতা

ইহা ফল ও সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা পিপাসা, গরম, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং রক্তের চাপ ইত্যাদি কমিয়ে দেয়। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বর্তমানে প্রস্রাব বর্ধক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে শরীর থেকে প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীরের খনিজ উপাদান। যেমন-সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি বের হয়ে যায় এবং রক্তের চাপ কমে যায়। কাকড়িও প্রস্রাব বৃদ্ধির মাধ্যমে একইভাবে রক্তের চাপ কমিয়ে দেয়। কাকড়ি দ্রুত হজম হয়। (হায়াতে জিন্দেগী-১১৪৪)

কাকড়ি অন্তরে শান্তি বা শীতলতা আনয়ন করে। প্রস্রাব সৃষ্টি করে। প্রস্রাবের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করে। মূত্র দ্বার দিয়ে পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি নির্গত হওয়া বন্ধ করে। মূত্রাশয়ের পাথর এবং মূত্রথলীর জন্য বিশেষ উপকারী।

(কিতাবুল মুফরাদাত : খাওয়াসুল আদভিয়া, পৃষ্ঠা নয়-২৭৮)

কাকড়ির মধ্যে নিম্নোক্ত খাদ্যোপাদান বিদ্যমান

১. পানির পরিমাণ শতকরা : ৭৫.৬ ভাগ

২. প্রোটিন-শতকরা -১/২ ভাগ

৩. শ্বেতসার শতকরা : ২/৩ ভাগ

এছাড়া ফ্যাটি এসিড, বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ যেমন পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, সালফার, লাইম ইত্যাদি বিদ্যমান।

(সিহহাত আওর তন্দুরস্তী, পৃষ্ঠা ২০)

খেজুর ও মাখন

বুসর সুলামী (রা)-এর দুই পুত্র আতিয়া (রা) এবং আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, "আমাদের নিকট রাসূল (সা) তাশরীফ আনলেন। আমরা রাসূল (সা)-এর সামনে তাজা খেজুর এবং মাখন রাখলাম। রাসূল (সা) মাখন এবং তাজা খেজুর পছন্দ করতেন।

(মিশকাত, যাদুল মাআদ, ৩য় খণ্ড)

কিতাবুল মুফরাদের উদ্ধৃতি

খেজুরের মেজাজ বা স্বভাব বা প্রকৃতি উষ্ণ ও গরম। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোপাদন রয়েছে। এটা রক্ত উৎপাদনকারী। হজম শক্তি বর্ধক যকৃৎ ও পাকস্থলীর শক্তিবর্ধক। কাম শক্তি বৃদ্ধিকরণ। মুখে রুচি আনয়নকারী প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, মুখের অর্ধাঙ্গ রোগ, পক্ষাঘাত এবং এ ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশকারী রোগের জন্য খুবই উপকারী।

খেজুরের বীচিও রোগ নিরাময়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইহা পাতলা পায়খানা বন্ধ করে। পোড়া খেজুর বীচির চূর্ণ প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করে এবং ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে। এ চূর্ণ মাজন হিসেবে ব্যবহার করলে দাঁত পরিষ্কার হয়। (কিতাবুল মুফরাদাত ঃ খাওয়াসুল আদভিয়া পৃষ্ঠা নং-৩৩৮)

খেজুর পেটের গ্যাস, শ্লেষ্মা, কফ দূর করে। শুষ্ক কাশি এবং এ্যাজমা রোগে উপকারী। (সিহ্‌হত ও যিন্দেগী, পৃঃ ১২৪)

খেজুরের প্রকারভেদ

খেজুর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এগুলোর রং আকার-আকৃতি, স্বাদ এবং গুণগত মানে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-আম্বরী (উত্তম ধরনের খেজুর) বরণী, জাবী, জালী কালমাহ, শাকাবী, আজওয়া ও সুখখাল (এই খেজুরের শুধু বীচি কাজে লাগে) ইত্যাদি এছাড়া সবাখখাল খেজুর রয়েছে। এর মেজাজ উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। এটাকে বীচিহীন মনে করা হয়। আম্বর খেজুর আকারে বড়, সুস্বাদু এবং দামী খেজুর। "তামার" খেজুরকে শুকনা খেজুরকে বলা হয়। রাসূলে (সা) এই খেজুরকে পছন্দ করতেন।

খেজুরের পুষ্টিগুণ

১০০ গ্রাম খেজুরে নিম্নোক্ত খাদ্য উপাদান বিদ্যমান

১. প্রোটিন : ২ গ্রাম।

২. কার্বোহাইড্রেট : ২৪ গ্রাম।

৩. ক্যালরী : ২ ক্যালরী

৪. সোডিয়াম : ৪.৭০ মিলি গ্রাম।

৫. পটাসিয়াম : ৭৫৪ মিলি গ্রাম।

৬. ক্যালসিয়াম : ৬৭.৯০ মিলি গ্রাম।

৭. ম্যাগনেসিয়াম : ৫৮.৯০ মিলি গ্রাম।

৮. কপার : ০.২১ মিলি গ্রাম।

৯. আয়রণ : ০.৬১ মিলি গ্রাম।

১০. ফসফরাস : ৬৩৮ মিলি গ্রাম।

১১. সালফার : ৫১.৬০ মিলি গ্রাম।

১২. ক্লোরিন : ২৯০ মিলি গ্রাম।

খেজুরের অন্যান্য উপকারিতা

ভেষজ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, খেজুরের প্রথম উপকার হলো অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা হৃদযন্ত্রে দুবর্লতায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। রুচিবর্ধক, স্নায়ুবিক শক্তিবর্ধক। ইহা রক্তবর্ধক। হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় ইহা বিশেষ উপকারী।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ-

অর্থ : "জান্নাতে দুধের এমন নহর প্রবাহিত হবে যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত-১৫)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ-

অর্থ : স্বচ্ছ নির্মল নির্ভেজাল ও খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও উপাদেয়।" (সূরা নাহল : আয়াত-৬৬)

৬. মিষ্টি

SWEET MEAT

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, শিশুদেরকে মিষ্টি খাওয়ালে, শিশুদের ব্রেইন প্রখর হয় এবং এতে শিশুদের ধী শক্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, মিষ্টি খেলে মানুষের মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা ও শান্ত থাকে, এতে মানুষের মন মেজাজ প্রফুল্ল হয় এবং মন মেজাজ প্রফুল্ল হলে মানব জীবনের পরিবেশও সুন্দর ও পবিত্র হয়। সুতরাং মানব জীবনের চরিত্র ও পরিবেশ সুন্দরকরণের ক্ষেত্রে মিষ্টির ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, কোনো খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার পর কিছু মিষ্টি খেলে, উক্ত খাদ্য দ্রব্য পেটে সহজেই হজম হয়ে যায়। কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস রোগ আছে, তাদের জন্য উক্ত মিষ্টি খাওয়ার উপদেশ গ্রহণযোগ্য নহে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই নিজে মিষ্টি পছন্দ করেন, তা তাঁর উম্মতদের প্রতি তাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমন– আল কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ۔

অর্থ : বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাস, তবে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৩১)

حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ۔

অর্থ : আয়েশা ছিদ্দিকা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহানবী (সা) মিষ্টি পছন্দ করতেন। (তিরমিযি হা/১৮৩১, ২য় খণ্ড–৫ম পৃষ্ঠা, আবুওয়াবুল আতআমা)

এছাড়াও হাদীস শরীফে এসেছে, মহানবী (সা) কোনো খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার পর কিছু মিষ্টি খাওয়া পছন্দ করতেন।

৭. যমযমের পানি

WATER OF JAMJAM

ইবরাহীম (আ) যখন ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাকে মক্কা শরীফে নিয়ে আসেন, তখন ইসমাঈল (আ) দুগ্ধপায়ী শিশু ছিলেন। ইবরাহীম (আ) তাঁদেরকে যমযম কূপের একটু ওপর দিকে একটি গাছের নিচে রেখে যান। সে সময় পবিত্র মক্কায় কোনো খাবার ও পানির ব্যবস্থা ছিল না। ইবরাহীম (আ) তাঁদের জন্য এক পোটলা খেজুর ও এক মশক পানি রেখে যান।

ইসমাঈল (আ)-এর মাতা ইবরাহীম (আ)-এর পেছনে পেছনে গিয়ে বলেন, আপনি আমাদেরকে এই জনমানবহীন প্রান্তরে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? যেখানে কোনো মানুষজন নেই। তিনি একথা বেশ কয়েকবার বলেন, কিন্তু ইবরাহীম (আ) তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন না। অত:পর মা হাজেরা ইবরাহীম (আ)কে বললেন, আল্লাহ তায়ালা কি আমাদেরকে এখানে রেখে যেতে আদেশ দিয়েছেন? তখন তিনি বললেন? হ্যাঁ, তখন মা হাজেরা (আ) বললেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। এরপর ইবরাহীম (আ) চলে যান এবং মা হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ)-এর নিকট ফিরে আসেন।

ইবরাহীম (আ) যখন হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে আসেন এবং তাঁরা চোখের আড়াল হয়ে যান। তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে তাঁদের জন্য দু'হাত তুলে এই দোয়া করেন-

رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ-

অর্থাৎ, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার পরিবার চাষাবাদহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট রেখে এসেছি। হে আমার প্রতিপালক! তারা যেন নামায কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের অন্তর তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে (বিভিন্ন প্রকার) ফল-ফলাদি দ্বারা রিযিক দান করুন। যাতে তারা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

(সূরা ইবরাহীম আয়াত-৩৭)

ইসমাঈল (আ)-এর মা হাজেরা স্বীয় সন্তানকে দুধ পান করাতে থাকেন এবং নিজে পানি পান করতে থাকেন। পানি যখন শেষ হয়ে যায় তখন শিশু ইসমাঈল (আ) পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে আরম্ভ করেন। মা হাজেরা তাঁকে মাটিতে উলট-পালট করতে দেখেন। শেষ পর্যন্ত বাচ্চার এই দুরাবস্থা সহ্য করতে না পেরে দিশাহীন হয়ে এদিক-সেদিক ছুটতে থাকেন। একটু দূরে গিয়ে 'সাফা' পর্বতকে নিকটে পান, তখন তার ওপরে উঠে ওয়াদীর (সমতল ভূমি) দৃষ্টি ফিরাতে থাকেন যে, কোনো লোক দৃষ্টিগোচর হয় কি-না? এবং তাদের কাছে কোনো খাদ্যপানীয় পাওয়া যায় কি-না? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। অত:পর তিনি নিরাশ হয়ে 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে আসেন। যখন তিনি সমতল ভূমিতে নেমে আসেন তখন তিনি বিপদগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে 'মারওয়া' পর্বতের দিকে ছুটে আসেন। সাহায্যের আশায় তিনি 'মারওয়া' পর্বতের ওপর থেকে এদিক-ওদিক তাকান। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে নেমে আসেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে তিনি 'সাফা' পর্বত থেকে 'মারওয়া' পর্যন্ত ছুটতে থাকেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, "এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'সাফা' ও মারওয়ার সায়ীর প্রচলন হয়।

তিনি যখন শেষবার 'মারওয়া' পর্বতে উঠেন তখন হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে মনোযোগ দিয়ে কান পেতে রাখেন যাতে বুঝতে পারেন যে, আওয়াজের উৎস কোথায়? পুনরায় একই আওয়াজ শুনতে পেয়ে খেয়াল করে দেখেন যে, যমযম কূপের নিকট একজন ফেরেশতা। অত:পর সেই ফেরেশতা নিজ পায়ের গোড়ালী বা ডানা দ্বারা মাটিতে আঘাত করে পানি নির্গত করেন।

মা হাজেরা ভয়ে ভয়ে সেখানে এসে নিজ হাত দ্বারা মাটি দিয়ে পাড় উঁচু করে পানি আটকিয়ে রাখেন। ফলে সেটি হাউজের মতো হয়ে যায়। অত:পর তিনি হাতের চুল্লুতে করে মশকে পানি ভরতে আরম্ভ করেন। অন্যদিকে অনবরত পানি প্রবাহিত হতে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন-

لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا-

অর্থাৎ, "তিনি যদি যমযমকে প্রবাহিত হতে দিতেন অথবা বলেন, হাতের চুল্লু দ্বারা পানি মশকে না ভরতেন তাহলে যমযম চির প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হতো।" অত:পর ঐ ফেরেশতা মা হাজেরাকে বললেন, মৃত্যু ভয় করবেন না। কেননা, এখানে আল্লাহর পবিত্র ঘর আছে। যাকে এ শিশু ও তাঁর পিতা পুনঃনির্মাণ করবেন। আল্লাহ তায়ালা নিজ প্রিয় বান্দাদেরকে ধ্বংস করেন না। (সহীহ বুখারী, হা/৩৩৬৪)

যমযম কূপের নামসমূহ

যমযম কূপের বহু নাম আছে। নাম অধিক হওয়া তার উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রমাণ বহন করে। বলা হয়ে থাকে যে, পানির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে তার নামকরণ করা হয়েছে যমযম। আরবি ভাষায় যমযমের অর্থ অধিক ও সমবেত। কতিপয় গবেষকের মতে মা হাজেরা মাটি দ্বারা বাঁধ দিয়েছিলেন যাতে পানি ডানে-বামে প্রবাহিত না হয়। তিনি যদি এরূপ না করতেন তাহলে পানি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ত এবং সব কিছু ভরে যেত। কারো কারো মতে এই বাঁধ দেয়া বা আটকে রাখাকে যমযম বলা হয়। যমযম কূপের আরও অনেক নাম আছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. 'শাব্বাআ' এর অর্থ হচ্ছে পরিতৃপ্তকারী, যেহেতু যমযমের পানি পান করার কারণে তৃষ্ণা দূর হয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায় এ কারণে যমযমকে "শাব্বাআ" বলা হয়।
২. 'বাররাহ' এর অর্থ হচ্ছে অকাতরে দানকারী।
৩. 'তাইবা' এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র, উত্তম, কল্যাণকর।
৪. 'আওয়ালা' এর অর্থ হচ্ছে সাহায্যকারী, সহায়তাকারী।
৫. 'সাফিয়া' এর অর্থ হচ্ছে আরোগ্যকর।
৬. 'বুশরা' এর অর্থ হচ্ছে সুসংবাদ, খুশির খবর।
৭. 'শারাবুল আবরার' এর অর্থ হচ্ছে পুণ্যবানদের পানীয়।
৮. 'মাযনূনাহ' এর অর্থ হচ্ছে নিরাপদ।

এ ছাড়াও আরও অন্যান্য নাম রয়েছে।

যমযমের পানির ফযীলত

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন-

خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطَّعَامِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ-

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে সর্বোত্তম পানি হলো যমযমের পানি। তাতে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাদ্য ও অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য রয়েছে। (জামেয়ে সগীর, হাদীস ৪০৭৭)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন-

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ-

অর্থাৎ: যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

আনাস (রা) বলেন, আবু জর গিফারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِيْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَجَ صَدْرِىْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِيْ صَدْرِىْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَعَرَجَ لِيْ اِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحْ قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ مَعَكَ اَحَدٌ؟ قَالَ مَعِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ

অর্থাৎ, "আমি মক্কায় (নিজ ঘরে শুয়ে) ছিলাম। তখন আমার ঘরের ছাদ ছিদ্র করা হয় এবং জিবরাঈল (আ) নেমে এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং সেটিকে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে দেন। অত:পর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসেন। সেগুলো আমার অন্তরে ঢেলে দিয়ে বুক বন্ধ করে দেন এবং আমাকে হাত ধরে আসমানে নিয়ে যান। যখন তিনি নিকটতম আকাশে আসলেন অত:পর জিবরাঈল (আ) আসমানের রক্ষককে বললেন, ফটক খুলে দাও। তখন রক্ষক বলল কে?

জিবরাঈল (আ) বললেন আমি। তখন রক্ষক জিজ্ঞাসা করল, তোমার সাথে কি কেউ আছে? উত্তরে জিবরাঈল (আ) বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ (সা) আছেন। (বুখারী-হাদীস ৩৩৪২)

আনাস ইবনে মালেক (রা) কর্তৃক বর্ণিত অন্য বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) ছোটকালে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলছিলেন, ইত্যবসরে জিবরাঈল তাঁর কাছে আসেন এবং রাসূল (সা)-কে শুইয়ে বুক চিরে ক্বলব (অন্তর) বের করে সেটিকেও চিরে তা থেকে জমাট রক্ত পিণ্ড বের করেন। অত:পর বলেন, এটি শয়তানের অংশ যা আপনার মধ্যে ছিল। অত:পর তিনি অন্তরকে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে নিজ স্থানে রেখে দেন। এ দৃশ্য দেখে অন্য শিশুরা রাসূল (সা)-এর দুধ মায়ের কাছে ছুটে এসে বলে, মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করা হয়েছে। তারা সকলে মিলে তাঁকে দেখতে আসেন। তখন রাসূল (সা) শরীরের রং পাল্টিয়ে গিয়েছে। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর বক্ষে সিলাইয়ের দাগ প্রত্যক্ষ করতাম।

যমযমের ফযীলতের মধ্যে এটিও একটি যে রাসূল (সা) তার জন্য নেফাকী থেকে মুক্তির মাধ্যম করেছেন যে, ব্যক্তি যমযমের পানি তৃপ্তি ও আন্তরিকতার সাথে পানি করবে।

মুজাহিদ (রহ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে কখনও দেখিনি যে, তিনি কাউকে খানা খাইয়েছেন কিন্তু যমযমের পানি পান করাননি। ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে কোনো অতিথি আসলে তাকে যমযমের পানি উপহার দিতেন। (আখবারে মক্কা, ফাকেহী-১১১৭-১১১৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমাদের আর মুনাফিকদের (পার্থক্যের) নিদর্শন এই যে, মুনাফিকরা যমযমের পানি পানে তৃপ্তি পায় না ও আন্তরিকতাও রাখে না।
(দারেকুতনী ২/২৮৮, বায়হাকী ৫/১৪৭)

যমযমের পারি দ্বারা ওয়াজু করা মুস্তাহাব, যাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (সা) পাত্রে করে যমযমের পানি আনতে বলেন। তাঁর জন্য পানি আনা হয়। অত:পর তিনি তা পান করেন এবং অবশিষ্ট পানি দ্বারা অজু করেন। (ইরওয়াউল গলীল, হাদীস ১১২৪)

মুসনাদে আহমদে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত

রমলের সাথে তিন চক্কর লাগান। তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত নামায পড়েন। অত:পর হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে আসেন। এরপর যমযমের দিকে ফিরে গিয়ে পানি পান করেন ও মাথায় ঢালেন।

(মুসনাদের আহমদ ৩/৩৯৪)

যমযমের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রা) বলেছেন : যমযমের পানি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ও বরকতময় পানি এবং মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয়, মূল্যবান ও পবিত্র পানি। আর সেটা হচ্ছে জিবরাঈল (আ)-এর খননকৃত এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ইসমাঈল (আ)-এর পানীয়। (আততিব্বুল বাদীল পৃ:৩৩)

মূলত যমযমের পানি অভুক্তের খাদ্য এবং অসুস্থ ব্যক্তির রোগমুক্তি স্বরূপ। এর পানি হাউজে কাউসারের পানি থেকে উত্তম এবং এর পানি দিয়েই রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ক্বলব (অন্তর) ধৌত করা হয়েছে।

ইমাম হাকিম তিরমিযী (রহ:) বলেছেন, যমযমের পানি পানকারী যদি তা তৃপ্তির জন্য পান করে থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তৃপ্ত করবেন।

আর যদি তা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। আর সে যদি তা রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে আরোগ্য দান করবেন। আর যদি সে অসৎ চরিত্র দূর করার উদ্দেশ্যে পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সচ্চরিত্রবান বানিয়ে দিবেন। আর যদি সে মনের সংকীর্ণতা দূর করার জন্য পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিবেন।

আর যদি সে মনের অন্ধকার দূর করার জন্য পান করে থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালা মনের অন্ধকার দূর করে দিবেন আর যদি সে মনের ধনাঢ্যতা, স্বচ্ছলতা, অমুখাপেক্ষিতা (আত্মার পরিতুষ্টি) অর্জনের জন্য পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে মনের স্বচ্ছলতা দান করবেন। আর যদি সে কোনো প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে তা পান করে আল্লাহ তায়ালা তা পূরণ করে দিবেন। আর কেউ যদি তা কোনো আকস্মিক সমস্যার কারণে পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সমস্যার সমাধান করে দিবেন। কেউ যদি তা বিপদ আক্রান্ত হয়ে পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার বিপদ দূর করে দিবেন। কেউ যদি সাহায্য প্রার্থনা করে তা পান করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করবেন।

মোটকথা, যে ব্যক্তি যে কোনো নেক নিয়তে ও সৎ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পান করবে আল্লাহ তায়ালা তার উদ্দেশ্য পূরণ করবেন।

(নাওয়াদিরুল উসুল-৩৪১, আত্তিবুল বাদীল পৃষ্ঠা ৩৪)

যমযমের পানি শেফা

সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, যমযমের পানি শেফা তথা রোগারোগ্যকর। হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সা) বলেছেন - .

اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ -

অর্থাৎ "জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের তাপ। সুতরাং তোমরা তাকে যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর। (মুসতাদরাক, হা/৭৪৩৯, মুসনাদে আহমদ-১/২৯১)।

যমযমের পানি শুধুমাত্র জ্বরেরই আরোগ্যকর নয়; বরং এটা সকল রোগই আরোগ্যকর। আর নিম্নোক্ত হাদীসখানি থেকেও একথা প্রমাণিত হয় : ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন-

خَيْرُ مَاءٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ مَزْزَمَ فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ

অর্থাৎ, যমযমের পানি হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের মধ্যে উত্তম পানি। তাতে রয়েছে ক্ষুধার্তের খাদ্য ও পীড়িতের শেফা (আরোগ্য)। (মু'জামে কারবীর, তাবরানী-১১১৬৭)

যমযম কূপের পানিতে রোগীর আরোগ্য লাভের একটি সত্য ঘটনা

দুরারোগ্য বহুরোগী যমযমের পানিতে আল্লাহর ফজলে আরোগ্য লাভ করেছে একূপ অসংখ্য ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিছু আগে লাইলা আলহুল নামে এক মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তিনি নিজের সুস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের গর্বে গর্বিতা হয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল ছিলেন। নিজের রোগের কথা জানতে পেরে তিনি চিকিৎসার জন্য বেলজিয়াম চলে যান। সেখানকার চিকিৎসকগণ বলেন, তার স্তন কেটে ফেলতে হবে এবং ক্যামিক্যাল ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। এ ধরনের চিকিৎসার ফলে দাঁত নখ ও চুল ঝড়ে যেতে পারে এবং চেহারায় দাড়ি গজাতে পারে। কিন্তু রূপের পূজারী এ মহিলা সৌন্দর্য বিনষ্টকারী এরূপ বিদঘুটে চিকিৎসা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান এবং সাধারণ চিকিৎসা

গ্রহণ করে দেশে চলে আসেন। এর ছমাস পরে তিনি অনুধাবন করেন যে, তার শরীরের ওযন হ্রাস পেয়ে গিয়েছে, চামড়ার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে নানা ধরনের তীব্র ব্যথা শুরু হয়েছে। যার ফলে বেলজিয়াম পুনরায় চলে যান। মহিলার স্বামীকে চিকিৎসকগণ বলেন, তার পুরো দেহে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি ফুসফুস পর্যন্ত স্পর্শ করে ফেলেছে। এ পরিস্থিতিতে তার চিকিৎসকরা বলল চিকিৎসা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এবং তার স্বামীকে উপদেশ দেন যেন তাকে নিয়ে মাতৃভূমিতে চলে চায়, যাতে আত্মীয় স্বজনের সামনে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। কিন্তু তার স্বামী যমযমের পবিত্র পানির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অত:পর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে এবিষয়টি তাকে ইলহাম করেন তথা তার মনে জাগিয়ে দেন। এরপর তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে মক্কা শরীফে আসেন। কা'বা শরীফকে দেখে মহিলাটি অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন এবং এই বলে দোয়া করেন: "হে আল্লাহ! তুমি আমার মনের আশাকে ধুলিৎসাত কর না; বরং তুমি আমাকে সুস্থ করে দিয়ে চিকিৎসকগণকে অবাক করে দাও। তারপর মহিলাটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন এবং পরিতৃপ্তির সাথে যমযমের পানি পান করা আরম্ভ করেন।

মহিলাটি কাবা শরীফে প্রশান্তি অনুভব করেন বিধায় তিনি হারাম শরীফে থাকার মনস্থ করেন ও তার স্বামীকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাকে নিয়ে আবাসিক হোটেলে না যান এবং তিনি হারাম শরীফে থেকে যান। মহিলাটির শরীরের অর্ধাংশে পোড়া ও ঘায়ে ভরে গিয়েছিল এতে তার দেহে ক্যান্সার ছড়িয়ে যাওয়ার সুনিশ্চিত ইংগিত পাওয়া যায়। হেরেম শরীফে অবস্থানরত অন্যান্য মহিলাগণ তাকে তার শরীরের উর্ধাংশ যমযমের পানি দ্বারা সর্বক্ষণ ধৌত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু (ধোয়ার জন্য) তিনি তার শরীরকে বেশি নড়াচড়া করতে ভয় করছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি সমস্ত ভয়-ভীতি ঝেড়ে ফেলে পুঁজ-রক্তে ভরা স্তন ও শরীরকে নিজ হাতে যমযম কূপের পানি দিয়ে ধুতে শুরু করেন। ফলে সকলকে বিস্মিত করে দিয়ে আল্লাহর রহমতে তার ফোঁড়া ও ক্ষত আরোগ্য হয়ে যায়।

এতে করে নবী করীম (সা)-এর বাণী-

مَاءُ زَمْزَمَ فِيْهِ..... وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ

(যমযমের পানিতে ... রুগ্ন ব্যক্তির জন্য আরোগ্য (শেফা ও রয়েছে) - এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং পবিত্র যমযমের পানির গোপন বৈশিষ্ট্য রহস্য ও মর্যাদার কথাও প্রমাণিত হয়। আর এ কথাটি কবির ভাষায় কতইনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে-

اَللّٰهُ اَوْدَعَ عَنَاصِرَ رُكِّبَتْ - فِيْهِ يُحَارُ بِكُنْهِهَا الشُّرَّاحُ- مَنْ قَالَ

زَمْزَمَ قُدِّسَتْ- اَسْرَارُهَا عِنْدَ الْاِلٰهِ فَمَا عَلَيْهِ جُنَاحٌ

(আল্লাহ তায়ালা যমযমের পানিতে এমন বরকতময় উপাদান রেখেছেন যার রহস্য উদঘাটন করতে ব্যাখ্যাকারগণ দিশেহারা হয়ে যান।

কেউ যদি বলে যে, যমযম আল্লাহর নিকট পবিত্র ও মর্যাদান্বিত তবে তার কোনো গুনাহ হবে না।)

খাদ্যস্বরূপ যমযমের পানির ভূমিকা

আবু জর (রা) শুধুমাত্র যমযমের পানি পান করে পূর্ণ একমাস কাটিয়ে দিয়েছেন। এই একমাসের দীর্ঘ সময়ে তিনি যমযমের পানি ছাড়া কিছু আহার করেন নি। এরপরও তিনি কোনো দুর্বলতা ও অসুস্থতা অনুভব করেন নি এবং তার মাঝে এর কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। আবু জর (রা) স্বয়ং বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ত্রিশ দিন-রাত এখানে আছি। তিনি বললেন, পানাহার কোথায় করতে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যমযমের পানি ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না। এরপরও আমি এত মোটা হয়ে যাই যে আমার মেদ বেড়ে গেল এবং কোনো রকম দুর্বল অনুভব করিনি। রাসূল (সা) বললেন, যমযমের পানি বরকতময় ও খাদ্য। (মুসলিম, ৪২৭৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যমযম সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, আমরা যমযমের পানিকে ক্ষুধা নিবারণকারী ও দরিদ্রদের উত্তম সহায়ক বলে মনে করতাম। (মজমাউস জাওয়াইদ ৩/২৮৬, আব্দুর রাজ্জাক ৫/১১৭)

৮. কুরবানি

SACRIFICE OF THE BEASTS

মহানবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর উম্মতগণকে কুরবানি করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এবং তিনি এই কুরবানির পক্ষে এভাবেও বলেছেন যে, যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ কুরবানি করার সমর্থ থাকতেও কুরবানি না করে, তবে সে যেন আমার এই ঈদের নামায পড়তে না আসে। এতে প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানের জন্য কুরবানি করা অত্যাবশ্যক। নিম্নে কুরবানির ওপর মহানবী (সা)-এর দু'টি হাদীস পেশ করা হল -

وَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ.

অর্থ : মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণ আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এই কোরবানীর হাকীকত কি? উত্তরে মহানবী (সা) বললেন, এটি তোমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এতে আমাদের লাভ কি? তখন রাসূল (সা) বললেন, কুরবানির প্রতিটি লোমে লোমে নেকী রয়েছে। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ভেড়া দুম্বার পশমের বেলায় কি? তখন রাসূল (সা) বললেন : ইহারও প্রতিটি পশমে পশমে নেকী রয়েছে।

(ইবনে মাজাহ- ৩১২৭) হাদীসটি যয়ীফ।

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ. وَّجَدَ سَعَةً لِّاَنْ يُّضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضَرُ مُصَلَّانَا.

এ ছাড়াও মহানবী (সা) আরও বলেছেন, আমার কোনো উম্মতের পক্ষে কুরবানির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার যে উম্মত কুরবানি করে না সে যেন আমাদের এই ঈদগাহে না আসে। (সুনানুল কুবরা লি বাইহাকী- হা/১৯৪৮৫)

فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَا عَمِلَ اِبْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَّوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, ঈদুল আযহার দিন একমাত্র রক্ত প্রবাহিতকরণ অর্থাৎ কোরবানী করা ব্যতীত বনী আদমের অন্য কোনো আমল বা কাজ আল্লাহর দরবারে অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামত দিবসে ঐ জীব তার শিং, লোম ও খুরসহ উপস্থিত হবে এবং কুরবানির রক্ত মাটিতে পতিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা কুবানির পশু কুরবানি করে সন্তুষ্ট থেকো। (তিরমিজী হা/১৫৭২)

ওপরে উল্লিখিত দু'টি হাদীসে কুরবানি ওপর এরূপ গুরুত্ব দেখে, পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে কেউ বলেন যে, হাদীসে যেভাবে কুরবানি করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সেভাবে যদি মানুষ কুরবানি করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে কুরবানি পশুগুলো পৃথিবী হতে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের একথাটি ঠিক নয়। কারণ মহানবী (সা) কুরবানি করার জন্য যে পশুগুলো নির্বাচন করে দিয়েছেন, সে পশুগুলো আজও আছে এবং কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে। কারণ তিনি কুরবানি করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তাই সেগুলো মানুষ অধিক মূল্যে কুরবানির জন্য বিক্রয় করবে বলে বিপুল উৎসাহে অতি যত্নসহকারে লালন পালন করেন। এবং যারা আল্লাহ তায়ালাকে খুশী করার জন্য কুরবানি করবে তারা ইহা অধিক মূল্যে ক্রয় করেন। যদি মহানবী (সা) উক্ত পশুগুলোর দ্বারা কুরবানি প্রথা চালু না করতেন তবে পৃথিবীর মানুষ তাকে এতো যত্ন সহকারে আবাদ করতেন না। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এমন কিছু পশু আছে যেগুলো হালাল কিন্তু মহানবী (সা) সেগুলোকে কুরবানি করার জন্য নির্বাচন না করাতে সেগুলো আজ পৃথিবী হতে বিলুপ্তির পথে। যেমন– হরিণ, খরগোস ইত্যাদি।

এছাড়াও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মহানবী (সা) যেসব পশুগুলো কুরবানির জন্য নির্বাচন করে দিয়েছেন, যদি সেগুলোর গোশত ভক্ষণ হালাল না হতো অথবা কুরবানির জন্য নির্বাচন না করতেন তবে উক্ত প্রাণীগুলোর পক্ষে এই পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে পারত না? কারণ তারা খুবই নিরীহ এবং কোনো মানুষও তাদের প্রতি কোনো রক্ষণাবেক্ষণ করতো না। ফলে তারা অতিদ্রুত পৃথিবী হতে বিলীন হয়ে যেতো।

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানির পশুগুলো দ্বারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চাইলে কুরবানির গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে যে সকল পশু পৃথিবী হতে বিলুপ্তির পথে সেগুলোকে যদি মহনবী (সা) কুরবানি করার জন্য নির্বাচন করে যেতেন, তবে সেগুলো আর কখনও পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হতো না। কারণ তখন মানুষ তার প্রতি যত্ন নিতেন এবং যত্নসহকারে লালন পালন করতেন এবং পৃথিবীতে তারা আজ গরু, ছাগল ও উট-দুম্বার মতো পর্যাপ্ত বিরাজ করতো।

৯. জলপাই তৈল

OLIVE OIL

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পেয়েছেন যে, জলপাই তৈল খাদ্যের মধ্যে ব্যবহার করলে শরীরের কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে এবং এর ব্যবহারে এলডিএল অর্থাৎ লাইপো প্রোটিন কমায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আরও অনেক গবেষণা করে জানতে পেরেছেন যে, জলপাই তৈলে কিছু পরিমাণে ক্যান্সার প্রতিরোধক উপাদানও আছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জলপাই তৈলের ব্যবহারে মানব দেহের বিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিসের কোপও অনেকাংশে কমায়।

গ্রীকরা মনে করেন যে, জলপাই গাছ হচ্ছে, তাদের দেবী এথিনার উপহার। (জনকণ্ঠ ২৩-০৫-০১)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে জলপাই সম্পর্কে বলে গেছেন। যেমন—

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ.

অর্থ : এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা-সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্যে তৈল ও নানা রং ও গুণাগুণ উৎপন্ন করে।

(সূরা মুমিনূন : আয়াত-২০)

اَلْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْتَدِمُوْا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهٗ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ.

অর্থ : ওমর বিন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা জলপাই তৈল দ্বারা তরকারী পাকাও এবং তা দ্বারা মালিশ কর নিশ্চয় উহা বরকতপূর্ণ গাছ। (তিরমিজি হা/১৮৫১, ২য় খণ্ড-৭ম পৃষ্ঠা আবুবয়াবুল আতআমা ও ইবনে মাজা হা/৩৩১৯, ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃষ্ঠা আবুবয়াবুল আতআমা)

সুতরাং দেখা যায় যে, জলপাই-এর তৈল যে একটি উপকারী তৈল তা মহানবী (সা) আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বেই এই পৃথিবীর মানুষদেরকে বলে গেছেন এবং এর ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা জলপাই তৈলের উক্ত গুণাগুণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

১০. তৈল

OIL

ক্যানাডার বিখ্যাত ফিজিও থেরাপিষ্টের বিজ্ঞানী স্যার জেমস সাগম বলেন, আমি মাথায় তেল লাগানোকে একদিকে সময়ের অপচয় ও ধূলাবালি আটকে থাকার কারণ মনে করতাম। অনেক গবেষণার পর আমি যে তথ্য সংগ্রহ করলাম তা হলো :

মাথায় তেল ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের চাপ রোধ হয়। মাথাব্যাথার পুরাতন রোগী ভালো হয়। ঘাড়ে রগের ব্যথা ভালো হয়। কাঁধের ব্যথা ও খিঁচুনি ভালো হয়। দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা দূর হয় এবং চেহারার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলদায়ক। আর মাথায় চুল আঁচড়ানোর দ্বারা এক প্রকার উষ্ণতা সৃষ্টি হয় যা পশম বা চুলের মাধ্যমে শরীরের শিরা-উপশিরার ব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই তিনি নিজে মাথায় তেল ব্যবহার করেছেন এবং তার সকল উম্মতগণকে তা ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। যেমন–

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রিয় নবী (সা) তাঁর পবিত্র মাথা মোবারকে বেশি বেশি তেল লাগাতেন এবং স্বীয় দাড়ি মোবারক আঁচড়াতেন।

অর্থাৎ মহানবী (সা) যা-যা করেছেন, তা তিনি পৃথিবীর সকল মানুষদেরকে করতে বলেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে 'মহানবী (সা)-কে' অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

অর্থ : বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাস, তবে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

(সূরা-আল ইমরান : আয়াত-৩১)

১১. লাউ
GOURD

খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলেন যে, লাউ বা লাউ জাতীয় কোনো সবজি বেশি বেশি খেলে পেট ও মাথা ঠাণ্ডা থাকে। তারা আরও বলেন যে, লাউ পেটের জন্য খুব উপকারী সবজি এবং যে কোনো পেটের পীড়ায় লাউ খেলে পেটের জন্য অবশ্যই উপকার হবে। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, নিয়মিত লাউ খেলে তার পেটে কোনো রোগ থাকবে না এবং লাউ ডায়েরিয়া রোগীর এক বিশেষ ঔষধ।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই, পৃথিবীর মানুষদেরকে লাউ-এর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি বেশি বেশি লাউ খেতে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। এবং আল্লাহ তায়ালাও তাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ۔

অর্থ : বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস তবে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ কাজগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন।

(সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৩১)

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنَ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هٰذِهِ الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هٰذَا قَالَ هٰذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَّاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا۔

অর্থ : জাবির (রা) তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমি মহানবী (সা)-এর বাড়িতে গেলাম এবং তাঁর নিকট লাউ দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি বললাম, এটা কি? তখন মহানবী (সা) বললেন, এটা লাউ যা আমরা বেশি বেশি পরিমাণে খাদ্য হিসেবে খেয়ে থাকি।

(সুনানে ইবনে মাজা হা/৩৩০৪, ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃ. আবুওয়াবু আতআমা)

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, লাউ-এর উপকারিতা সম্পর্কে মহানবী (সা) জানতেন, তাই তিনি ইহা বেশি বেশি ভক্ষণ করেছেন এবং পৃথিবীর মানুষদেরকে খাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়ে গেছেন। যা বর্তমান যুগের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন।

১২. লবণ

SALT

খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের যখন তীব্র ক্ষুধা লাগে, তখন দেহের আভ্যন্তরীণ পিত্তথলী হতে এক প্রকার বিষাক্ত তিক্ত রস নির্গত হয় এবং ইহা এসে তার মুখের জিবের মধ্যে অবস্থান করে। তাই যদি কোনো মানুষ তার তীব্র ক্ষুধার মধ্যে কোনো খাদ্য- দ্রব্য খাওয়ার পূর্বে তার জিবে একটু লবণ দেয়, তখন তার উক্ত লবণ খাওয়ার দ্বারা তার জিবের উক্ত বিষাক্ত রসের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তখন সে যে খাদ্য-দ্রব্য খায় তাতে তার বেশ মজা লাগে এবং সে তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে এবং সে খাদ্য অতি সহজেই তার পেটে গিয়ে হজম হয়। তাই উক্ত খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা সকলকেই তার খাদ্য খাওয়ার পূর্বে তার জিহ্বায় একটু লবণ দিতে বলেন।

এছাড়াও খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা আরো বলেন, তরকারি রান্না করার সময়, ইহার পানিতে মাছ, গোশত, শাক, সব্জী, হলুদ, মরিচ, পিঁয়াজ ও রসুনের বিষাক্ত ও দূষিত পদার্থগুলো পরস্পর একত্র হয়ে মিশে যায় এবং সমস্ত তরকারিই তখন স্বাদহীন হয়ে যায়। তাই তখন উক্ত তরকারিকে সুস্বাদু ও মজাদার করার জন্য প্রধান ভূমিকা রাখে একমাত্র লবণ। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন, তরকারিকে সুস্বাদু করার মূল মন্ত্র হচ্ছে লবণ। এ জন্য লবণের বিকল্প নেই। অতএব দেখা যায় দেহকে সংরক্ষণের জন্যও লবণের ভূমিকা অপরিসীম।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই লবণের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীস বলে গেছেন, রোগের ঔষধ, এবং লবণ হচ্ছে তরকারিকে সুস্বাদু করার জন্য মূল মন্ত্র। যেমন এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করা হলো-

حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ اَبِىْ عِيْسٰى عَنْ رَجُلٍ اَرَاهُ مُوْسٰى عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ اِدَامِكُمُ الْمِلْحُ ـ (ابن ماجه جلد الثانى صفه ٢٣٨ ابواب الاطعمة)

অর্থ : আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, লবণ হচ্ছে তোমাদের তরকারির মূলমন্ত্র।

(ইবনে মাজা হা/৩৩১৫, ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃ. আবওয়াবুল আত্বআমা।) হাদীসটি যয়ীফ

১৩. খাদ্যের পুষ্টি

NUTRITION OF FOOD

হিন্দু ধর্মের একজন বিখ্যাত খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানী বলেছেন যে, কোনো প্লেটে কোনো রসালো খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার পর, উক্ত খাদ্য দ্রব্যের পলি স্যাকারাইজ নামে খাদ্যের মৌলিক ভিটামিন, উক্ত খাদ্য দ্রব্যের প্লেটের তলায় ও তার আঙ্গুলের মাথায় এসে জমা হয়ে থাকে। তাই তিনি প্রত্যেক মানুষকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, কোনো মানুষ যখন কোনো প্লেটে কোনো রসালো খাদ্য দ্রব্য খায়, তখন যেন সে তা খাওয়ার পর তার আঙ্গুল ও উক্ত প্লেটের তলা খুব ভালো করে চেঁটে খায়। তাহলে তার দেহে উক্ত খাদ্যের মৌলিক ভিটামিন প্রবেশ করবে এবং তার দেহের দৈহিক উপকার সাধন করবে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানী প্রমাণ করে বলেছেন যে, কোনো প্লেটে কোনো রসালো খাদ্য দ্রব্য রেখে খাওয়ার পর উক্ত প্লেটের তলা ও আঙ্গুল চেঁটে খেলে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

আরো অন্যান্য খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোনো প্লেটে কোনো রসালো খাদ্য দ্রব্য রেখে খাওয়ার পর তাই খাদ্য দ্রব্যের মৌলিক উপাদানগুলো উক্ত প্লেটের তলায় জমা হয়ে থাকে। উক্ত প্লেটে খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার পর তার মধ্যে পানি দ্বারা হাত ধুলে তাতে উক্ত খাদ্য দ্রব্যের মৌলিক উপাদানগুলো পানিতে মিশে যায় এবং সেই পানির কিছু অংশ চোখে দিলে চোখের দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই তাদের দেয়া উক্ত রসালো খাদ্যদ্রব্য প্লেটে রেখে খাওয়ার পর তার তলের অংশ ও তার আঙ্গুল চেঁটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে হাদীস বলে গেছেন। যেমন–

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَعِقِ الْاَصَابِعِ وَالصُّحْفَةُ ـ وَقَالَ اَنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ اَيَةِ الْبَرْكَةِ ـ (ترمذى جلد الثانى صفه ٢ كتاب الاطعمة)

অর্থ : জাবির (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় মহানবী (সা) খাদ্য খাওয়ার পর আঙ্গুল ও উক্ত খাওয়ার প্লেট চেঁটে খাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার পর আঙ্গুল ও প্লেট চেঁটে খাওয়ার মধ্যে অনেক বরকত বা উপকার রয়েছে যা তোমরা জান না।

(মুসিলম- হা/৫৪২০)

১৪. রাসূল (সা)-এর খাদ্যাভাস

THE HABIT OF EATING OF RASUL (SM)

রাসূল (সা)-এর পবিত্র কার্যাবলি ও শিক্ষা ব্যবস্থা হেকমত ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। রাসূল (সা)-এর খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমেও তা উপলব্ধি করা যায়। নিম্নোক্ত খাদ্যসমূহ একত্রে খেতেন না-

لَمْ يَجْمَعْ قَطُّ بَيْنَ لَبَنٍ وَسَمَكٍ.

অর্থ : দুধ ও মাছ কখনও-এক সঙ্গে খেতেন না।

وَلَا بَيْنَ لَبَنٍ وَحَامِضٍ.

অর্থ : দুধ ও টক জিনিস কখনও একত্রে খেতেন না।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) নিম্নোক্ত খাদ্যগুলো খেতেন না।

দুটি গরম খাদ্য, দু'টি ঠাণ্ডা খাদ্য, দু'টি চর্বিযুক্ত খাদ্য, দু'টি আঠালো খাদ্য, দু'টি নরম খাদ্য, দু'টি শক্ত খাদ্য একত্রে খেতেন না। এমন দু'টি জিনিস একত্রে খেতেন না যা একই স্বভাব বা মেজাজ বা প্রকৃতিতে পরিণত হবে।"

অর্থাৎ উষ্ণ-শুষ্ক মেজাজের যে কোনো খাদ্যের সাথে অন্য আরেকটি উষ্ণ-শুষ্ক মেজাজের খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। কারণ উভয় খাদ্য গ্রহণে শরীরের মেজাজ বা প্রকৃতি দ্বিগুণ উষ্ণ-শুষ্ক প্রকৃতির হয়ে যাবে। এতে শরীর মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে যাবে এবং রাসূল (সা) উষ্ণ-প্রকৃতির খাদ্যের সঙ্গে-এর বিপরীত ধর্মের প্রকৃতি বা মেজাজের খাদ্য যেমন– শীতল-আর্দ্র প্রকৃতির খাদ্য একত্রে গ্রহণ করতেন। এতে শরীর উভয় খাদ্যের তাপমাত্রা ব্যালেন্স বা সুষম করত। ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়াসমূহ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

وَلَا بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ كَقَابِضٍ وَّمُسْهِلٍ وَسَرِيْعُ الْهَضْمِ وَبَطِيْئِه.

অর্থ : বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী কোনো জিনিসও একত্রে খেতেন না। যেমন একটা আঠাল খাদ্য এবং একটা নরম খাদ্য; একটি দ্রুত হজম সম্পন্ন এবং অন্যটি দেরিতে হজমসম্পন্ন খাদ্য এক সঙ্গে খেতেন না।"

وَلَا بَيْنَ شَوِى وَّهَبِيْخٍ وَّلَا بَيْنَ طَرِى وَّقَدِيْدٍ.

অর্থ : ভুনা এবং রান্না খাদ্য, টাটকা এবং বাসী খাদ্য একত্রে খেতেন না–
(যাদুল মা'আদ : খ- : ২)

রাসূল (সা)-এর পরিত্যাজ্য খাদ্যসমূহ

وَلَمْ يَكُنْ يَاْكُلُ طَعَامًا فِىْ وَقْتِ شِدَّةِ حَدَدَتِه.

অর্থা : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক গরম জিনিস খেতেন না।

وَلَا شَيْئًا مِّنَ الْاَطْعِمَةِ الْعَفِنَةِ وَالْمَالِحَةِ كَالْكَوَامِخِ.

অর্থ : রাসূল (সা) যে কোনো প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য পছন্দ করতেন না এবং চটপটি জাতীয় খাদ্য (যেমন- চাঁটনী) পছন্দ করতেন না।

وَلَا طَبِيْخًا بَائِتًا يَسْخِنُ لَهُ لِغَدٍ.

অর্থ : রাত্রের রান্না (বাসী) পরের দিন খেতেন না। –(যাদুল মা'আদ)

রাসূল (সা) দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য অপছন্দ করতেন (পিঁয়াজ)

জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) আবু আইয়্যুব আনসারী (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আইয়্যুব (রা) যখনই খানা খেতেন, তখন রাসূল (সা)-এর জন্য খাদ্যের কিছু অংশ পাঠিয়ে দিতেন। এ নিয়মে একদিন তিনি কিছু খানা পাঠালেন, রাসূল (সা) এই খানা খেলেন না। তখন আবু আইয়্যুব আনসারী (রা) রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে খানা না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহর রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন, এর মধ্যে পিঁয়াজ মিশ্রিত রয়েছে। তখন তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! পিঁয়াজ কি হারাম? রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন-

وَلَكِنِّىْ اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهِ.

অর্থ : "হারাম নয় বটে, তবে দুর্গন্ধের কারণে আমি এটা পছন্দ করি না।"
(তিরমিযী, হা/ ১৮০৭)

রাসূল (সা) যে শুধু পিঁয়াজ খাওয়া থেকেই বিরত থাকতেন তা নয়; বরং দুর্গন্ধযুক্ত এমন কোনো জিনিসই তিনি খেতেন না, যা দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়।

উবাইদুল্লাহ ইবনে আবী ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উম্মে আইয়্যুব (রা) বলেছেন, রাসূল (সা)-এর জন্য খাদ্য তৈরি করলেন। যার মধ্যে কিছু শাক-সব্জিও ছিল। রাসূল (সা) উক্ত খাদ্য পছন্দ করলেন না। রাসূল (সা) সাহাবীগণকে বললেন, "তোমরা খেয়ে নাও। আমি তোমাদের মতো নই; আমার ভয় হয় যে, (এই খানার কারণে) আমার সাথিদের তথা ফেরেশতাদের কষ্ট হবে।" (তিরমিযী, হাদীস - ১৮১০)

খাদ্যের মেজাজ বা প্রকৃতি বা স্বভাবের সমতা আনয়নে এবং প্রতিক্রিয়া দূরীকরণে রাসূল (সা)-এর হিকমত অবলম্বন :

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়্যুম (রহ) তাঁর "যাদুল মা'আদ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

যদি রাসূল (সা) কোনো ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ করতেন, তখন তিনি অন্য কোনো ভালো খাদ্যের দ্বারা খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব দূর করে নিতেন। অর্থাৎ কোনো খাদ্যের উষ্ণ-শুষ্ক বা গরম মেজাজকে অন্য কোনো শীতল-আর্দ্র বা শীতল খাদ্য দ্বারা পরিশুদ্ধি করে নিতেন। আবার শুকনা খাদ্যের প্রভাবকে আর্দ্র খাদ্যের মাধ্যমে পরিশুদ্ধি করে নিতেন।"

অতঃপর আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়্যুম (রহ) কাঁকড়ি ও তাজা খেঁজুরের উদাহরণ দেন, যা একটা অন্যটার ক্ষতিকর প্রভাব দূরীভূত করে থাকে। এভাবে রাসূল (সা) তাজা খেঁজুরের সাথে খুরবুজা খেতেন এবং বলতেন, খুরবুজা-খেজুরের গরমকে দূর করে দেয়।" (যাদুল মা'আদ)

হাদীসে জবের দলিয়া বা জবের ছাতু :

মা আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। "পরিবারের কারো জ্বর হলে রাসূল (সা) তাঁর জন্য জবের দলিয়া বা জবের ছাতু তৈরি করার নির্দেশ দিতেন এবং সে মতে তা তৈরি করে রোগীদেরকে খাওয়ানো হতো।" (যাদুল মা'আদ)

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) অপর বর্ণনায় বলেন। "কেউ যদি রাসূল (সা)-এর নিকট এ সংবাদ নিয়ে আসত যে, জনৈক ব্যক্তির পেটে অসুখ হয়েছে, খাদ্য গ্রহণ করছে না। তাহলে তিনি (সা) নির্দেশ দিতেন তাকে তালবিনা বা জবের দালিয়া বা জবের ছাতু তৈরি করে খাওয়াও।

অতঃপর রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র কসম এটা তোমাদের পেটকে এমনভাবে পরিষ্কার করে, যেমনভাবে কোনো ব্যক্তি স্বীয় চেহারা হতে ময়লা পরিষ্কার করে থাকে।" (যাদুল মা'আদ, মুসতাদরাকে হাকেম)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা

বর্ণিত আছে, কোনো বাড়িতে কারো আকস্মিক মৃত্যু হলে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তালবিনার বুন্দিয়া রান্নার জন্য নির্দেশ দিতেন। সেমতে তালবিনা পাকানো হতো, আর মা আয়েশা (রা) নিজ হাতে গোশত ও রুটির টুকরো এক সাথে মিশ্রিত করে সরীদ তৈরি করতেন এবং সরীদের মধ্যে তালবিনা মিশ্রিত করে বলতেন, "তোমরা এটা খাও।" কারণ– আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, তালবিনা রুগীদের মনে প্রশান্তি আনে এবং মৃত্যু শোক দূর করে। (বুখারী হা/৫৪১৭, মুসলিম হা/৫৯০০)

রাসূল (সা) রুগীদের জন্য জবকে একটা উত্তম পথ্য, পেটের পিড়ার একটি উপকারি ঔষধ এবং দুর্বলতায় বিশেষ শক্তিবর্ধক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান সভ্যতার ক্রমবর্ধমান উন্নতির পাশাপাশি খাদ্যসহ বিভিন্ন জিনিসের মোড়ক ও প্রকাশের মাধ্যমও পরিবর্তিত হয়েছে। হরলিক্সা, মালটোভা ইত্যাদি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাসূল (সা)-এর সময়ে জবের ছাতু পেটের পীড়া, দুর্বলতা, সহজেই হজম হয়, এমন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হতো। যা জব কিংবা মিষ্টি মিশ্রিত খাদ্যের সমন্বয়ে তৈরি করা হতো। বর্তমানে হরলিক্স কিংবা মালটোভার তৈরির উপাদানও গম কিংবা জব যা শারীরিক দুর্বলতা ও হজমী দুর্বলতায় ব্যবহৃত হয়। অথবা রোগগ্রস্ত দুর্বল ব্যক্তিকে কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর হরলিক্স/মালটোভা খাওয়ার অন্য পরামর্শ দেয়া হয়। সর্বোপরি এটা একদিকে যেমন খাদ্য, অপরদিকে তেমনি শোকের প্রতিষেধকও বটে।

কুরআন মজীদে পাখির গোশত

ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ.

অর্থ : "যেখানে রয়েছে পাখির গোশত যা বেহেশতবাসীদের জন্য অত্যন্ত প্রিয়।" (সূরা ওয়াকেয়া; আয়াত-২১)

১৫. যা জানা অত্যাবশ্যক

১. কেউ যদি দুধ আর মাছ একত্রে নিয়মিত কয়েকদিন খায় তাহলে ঐ ব্যক্তি লেপ্রসী বা কুষ্ঠ ও গাউট রোগে আক্রান্ত হবে।

২. দুধের সাথে মদ খেলে গাউট রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৩. সিদ্ধ ডিম কিন্তু যা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এমন ডিম খেলে হাপানী রোগ হয়।

৪. ডিম ও দুধ একত্রে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যতা, দাঁতে ব্যথা, হ্যামোরয়েড Hemorrhoids হয়।

৫. দীর্ঘ দিন ডিম খেলে মুখমণ্ডলে (Face) দাগ বা স্পট দেখা দেবে। সেই সাথে লবণাক্ত খাদ্য (Salted Foods) এবং লবণাক্ত মাছ একত্রে নিয়মিত কিছুদিন খেলে ভেনেসেকশন বা শিরায় (Vein) ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভিটিলিগো (যা এক প্রকার মাথা ব্যথা) দেখা যায়।

৬. নরম জাতীয় মাছ গোশত খাওয়ার পরে গোসল (Bath) করলে মুখমণ্ডলের (Facial paralysis) হয়।

বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটস-এর মতে, খুব বেশি উপকারী জিনিস থেকে কম ক্ষতিকর জিনিস উত্তম। সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য ক্লান্ত হয়ে যাওয়া অথবা ধৈর্য হারিয়ে ফেলা কর্ম পরিহার করা উচিত। যে সব কাজ-কর্ম অলস করে দেয়, সেটা থেকেই বিরত থাকতে হবে। এবং অতিরিক্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করতে হবে।

বিখ্যাত অ্যারাবিয়ান চিকিৎসক জনাব আল হারিথ বিন কালাদাহ সাহেবের মূল্যবান উক্তি : যদি সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে চাও, তবে টাটকা সতেজ পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল এবং পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত খাবার গ্রহণ করুন। যখন পানি পিপাসা লাগে শুধু তখনই পরিমিত পানি পান করুন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি পান হতে বিরত থাকুন। দুপুরের আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। রাত্রে খাদ্য গ্রহণের পর ঘুমানো যাবে না। ঘুমানোর আগে অবশ্যই প্রাকৃতিক প্রয়োজন অর্থাৎ মলমূত্র পরিত্যাগ করতে হবে। ভারী অথবা পেটভর্তি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পর গোসল করা যাবে। শীতের দিনে ১০ বার গোসল করা অপেক্ষা গরমের দিনে একবার গোসল করাই উত্তম। রাত্রে মৃত প্রাণীর গোসত খাওয়া মৃত্যুর নিকটবর্তী

করে দেয়। বৃদ্ধা মহিলার সাথে সহবাস জটিল ও মারাত্মক রোগের কারণ এবং দ্রুত বার্ধক্য আনয়ন করে।

আল হারিথ (Alharith) বলেন, যদি কেহ দীর্ঘ মেয়াদী রোগমুক্ত জীবন যাবন করতে চায় যদিও চিরস্থায়ী বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাদেরকে যথাসময়ের পূর্বেই দুপুরের ভোজ (Lunch) এবং রাত্রিকালীন ভোজ (Dinner) শেষ করা উচিত হবে। পাতলা সুতী কাপড় পরিধান করা উচিত এবং অতিরিক্ত সহবাস হতে বিরত থাকা উচিত।

তিনি আরো বলেন, চারটি জিনিস শরীরকে দুর্বল করে

১. ক্ষুধার্ত অবস্থায় সহবাস করা।

২. পেট ভর্তি আহার সম্পন্ন করেই গোসল করা।

৩. মৃত প্রাণির গোশত ভক্ষণ করা।

৪. বৃদ্ধা মহিলার সাথে সহবাস (Intercourse) করা।

আল হারিথের মৃত্যুকালে কিছু সংখ্যক লোক তাকে বলল, আমাদেরকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন যাতে আপনার অবর্তমানে আমরা উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন, শুধুমাত্র যুবতী মেয়েলোককে বিয়ে করবে। ফল পরিপূর্ণ পাকলে তবেই সেটা খাবে। যে মৌসুমে যে ফল পাওয়া যায় সেটাই খাবে। শুধুমাত্র রোগে আক্রান্ত হলেই ঔষধ খাবে। প্রতিমাসে তোমার পেটকে পরিষ্কার করবে (i.e.V)। সুতরাং দূষিত বলগম বা কফ এবং ছফর বা পিত্ত দূর কর তবেই তুমি সজীব নির্মল নি-রোগ থাকতে পারবে। মধ্যাহ্নের পর বিশ্রাম কর এবং রাত্রে আহার শেষে চল্লিশ কদম হাটাহাটি কর।

* কেউ সহবাস করল, অথচ বীর্য সম্পূর্ণ নির্গমন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না, তাহলে মূত্রনালীতে পাথর (Urinary Calculus) তৈরি হবে।

জনৈক সম্রাট স্বীয় চিকিৎসককে বললেন, আপনি হয়তো দীর্ঘদিন আমাদের মাঝে থাকবেন না। কাজেই আমাকে নি-রোগ ও সুস্থ্য থাকার ব্যবস্থাপত্র বলে দিন, যা আপনার অনুপস্থিতিতে আমাদের কাজে আসবে। চিকিৎসক বললেন :

১. শুধুমাত্র যুবতী মেয়েকে বিবাহ করবেন।

২. সতেজ বা ফ্রেস গোশত ভক্ষণ করুন।

৩. অসুস্থ্য হলে, তবেই ঔষধ সেবন করবেন।

৪. যে অঞ্চলে যে ফল পাওয়া যাবে এবং যে মৌসুমে যে ফল পাওয়া যায় তাই ভক্ষণ করুন।

৫. ফল পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় ভক্ষণ করুন।

৬. খাদ্যদ্রব্য ভালোভাবে চিবিয়ে ভক্ষণ করুন।

৭. যদি দিনের বেলায় খাদ্য খান তাহলে সামান্য সময় বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

৮. রাতে খাদ্য গ্রহণ করার পরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করুন।

৯. খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই খাদ্য গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ ক্ষুধা না লাগলে কিছুই খাবেন না।

১০. নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহবাস করবেন না। কারণ এতে বার্ধক্য আনয়ন করে।

১১. প্রস্রাবের বেগ চাপিয়ে রাখবেন না।

১২. পেট বা পাকস্থলী ভর্তি অবস্থায় কোনো কিছু খাবেন না। কারণ ঐ সময় ঠিকমত হজম হবে না।

১৩. সপ্তাহে একদিন অথবা এক মাসের মধ্যে আপনার পাকস্থলীকে বা পেটকে পরিষ্কার করুন (বমির মাধ্যমে হতে পারে)।

ইমাম শাফী (রহ) বলেন, চারটি জিনিস শরীরে শক্তি আনে

১. গোশত খাওয়া

২. সুগন্ধি ব্যবহার করা

৩. স্ত্রী সহবাস ছাড়াও প্রত্যহ গোসল করা

৪. কিতান (Kattan.Linen) কাপড় পরিধান করা।

চারটি জিনিস শরীরে সজীবতা ও শক্তি আনয়নকারী

১. কা'বা (kabah)-এর পার্শ্বে বসা।

২. ঘুমানোর আগে কৌল (kohl) জাতীয় সুরমা ব্যবহার করা।

৩. সবুজ জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকা।

৪. বাড়ির চারপার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।

চারটি জিনিস দৃষ্টিশক্তি হ্রাসকারী

১. ময়লা জাতীয় জিনিস দেখা।

২. বসার সময় কাবা শরীফকে পেছনের দিকে রাখা।

৩. মেয়েলোকের স্ত্রী লিঙ্গ দেখা।

৪. ক্রেসিফাইড ব্যক্তি অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি নিমক (লবণ) দিয়ে সকালের খানা শুরু করে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর থেকে সত্তর প্রকার বালা মুসিবত দূর করে দেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ একুশটি লাল কিশমিশ খায় সে তার দেহে খারাপ কোনো কিছু দেখবে না। গোশত খেলে গোশত বাড়ে। হালুয়া খেলে পেট বেড়ে যায় এবং অণ্ডকোষ ঝুলে পড়ে। গরুর গোশত রোগ, তার দুধ আরোগ্য, তার ঘি ঔষধ এবং চর্বি দেহ থেকে সমপরিমাণ রোগ দূর করে দেয়। কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ও মেসওয়াক শ্লেষ্মা নিবারক। যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন চায়, সে যেন সকালের খানা প্রাতঃকালে খায়, সন্ধ্যায় কম আহার করে এবং জুতা পরিধান করে।

হাজ্জাজ জনৈক চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করল, আমাকে এমন বিষয় বলে দিন, যা আমি মেনে চলি এবং লঙ্ঘন না করি। চিকিৎসক বলল, মহিলাদের মধ্যে যুবতী ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না। গোশত মধ্য কেবল জওয়ান পশুর খাবেন। পাকা কলা ভালোরূপে চিবিয়ে খাবেন। সেই খাদ্য খাবেন যা মনে চায়। খেয়ে পানি পান করবেন না। আর পানি পান করে খাবেন না। প্রস্রাব পায়খানা আটকিয়ে রাখবেন না। দিনের খাদ্য খেয়ে নিদ্রা যাবেন, রাতের খাদ্য খেয়ে নিদ্রার পূর্বে পায়চারী করবেন, তা একশত কদম হলেও। জনৈক হাকীম তার পুত্রকে বলল : সকালে কিছু খাওয়া ছাড়া বের হয়ো না। খাদ্যের সংযম সুস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর যেমন অসংযম রোগীর জন্য ক্ষতিকর।

ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী খাওয়া চার প্রকার

১. এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া-এটা আল্লাহ তা'য়ালার ক্রোধের কারণ।

২. দুই আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া এটা অহংকার।

৩. তিন আঙ্গুলে খাওয়া- এটা সুন্নাত তরীকা।

৪. পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া- এটা তীব্র লোভের পরিচায়ক।

চারটি বস্তু দেহকে দুর্বল করে–

১. অধিক সহবাস

২. অধিক দুঃখ

৩. প্রায়ই খালি পেটে পানি পান করা

৪. বেশি পরিমাণ টক খাওয়া।

তিন বস্তু দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে–

১. কেবলামুখী হয়ে বসা

২. নিদ্রার সময় সুরমা লাগানো

৩. সবুজ বনানী দেখা

পয়গম্বরগণ চিৎ হয়ে শয়ন করেন। কেননা, তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেন। আলেম ও আবেদগণও ডান পার্শ্বে শয়ন করেন। রাজা বাদশারা খাদ্য হজম হওয়ার জন্য বাম পার্শ্বে শয়ন করেন। উপুড় হয়ে শয়ন করা শয়তানের কাজ।

জালেমের খাদ্য খাবে না। জোর জবরদস্তি করলে সামান্য খাবার খাবেন। কথিত আছে, যন্নুন মিসরী গ্রেফতার হয়ে কিছুদিন কয়েদখানায় অতিবাহিত করেন। তার এক ধর্ম ভগ্নি সুতা কেটে কয়েদখানার দারোগার হাতে খানা প্রেরণ করল তিনি তা খেলেন না। মুক্তি পাওয়ার পর সেই ভগ্নি এসে অভিযোগ করলো তিনি বললেন, খাদ্য হালাল ছিল; কিন্তু জালেমের পাত্রে এবং তার হাতে এসেছিল তাই আমি খাইনি। অর্থাৎ দারোগার মারফতে না এলে খেতাম। বলা বাহুল্য এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকওয়া।

ফাতাহ মুসলী (রা) একবার বিশর হাফির সাথে দেখা করতে গেলেন। বিশর দেরহাম বের করে খাদেম আহম্মেদকে বললেন- উৎকৃষ্ট ভালো ব্যঞ্জন কিনে আন। আহম্মেদ বললেন, আমি খুব পরিচ্ছন্ন রুটি, কিছু দুধ ও উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে আনলাম এবং সবগুলো ফাতাহ মুসেলীর সামনে রেখে দিলাম। তিনি খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলন। অতঃপর বিশরে হাফি আমাকে বললেন, আহম্মেদ আমি উৎকৃষ্ট খাদ্য আনতে বলেছিলাম কেন জান? এর কারণ ছিল, উৎকৃষ্ট খাদ্য আন্তরিক শোকর ওয়াজিব করে। ফাতাহ আমাকে খেতে বলেননি। এর কারণ মেযবানকে খেতে বলা মোমেনের জন্য জরুরি নয়। অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলেন

কেন জান? এর কারণ তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হলে পাথেয় নেয়া ক্ষতিকর হয় না। তিনি যেন এসব মাছয়ালা তোমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন। আবু আলী রুদবারী এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন। তিনি দাওয়াত করেন, এক হাজার বাতি জ্বালালেন। এক ব্যক্তি আপত্তি করে বলল, আপনি অপব্যয় করেছেন। তিনি বললেন, তুমি ভিতরে গিয়ে সেই বাতিটি নিভিয়ে দাও। যেটি আমি আল্লাহর ওয়াস্তে জ্বালাইনি। সে ভিতরে গিয়ে শত চেষ্টা করল। কিন্তু একটি বাতিও নিভাতে পারল না। অবশেষে সে হার মানতে বাধ্য হলো। যে বাড়িতে কেহ মারা যায় সে বাড়িতে খাদ্য পাঠানো মুস্তাহাব। সে মতো জাফর ইবনে আবু তালিমের মৃত্যু সংবাদ এলে রাসূল (সা) বললেন, জাফরের লোকজন মৃতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে খাদ্য তৈরি করতে পারবে না। তাদের কাছে কিছু পাঠিয়ে দাও। কাজেই এটা সুন্নাত। খলিফা আল মামুনের চিকিৎসকের মতে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি মেনে চললে রোগমুক্ত থাকা সম্ভব।

১. পাকস্থলী বা উদর ভর্তি অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।
২. চর্বন জাতীয় যে কোনো প্রকার খাদ্য ভালোভাবে না চিবিয়ে গলা ধঃকরণ করা যাবে না। কারণ ঐ খাদ্যগুলো হজম হবে না।
৩. অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এর ফলে বার্ধক্য এসে যায়।
৪. বৃদ্ধা মহিলার সাথে সহবাস করা যাবে না। কারণ ইহা হঠাৎ মৃত্যুর কারণও হতে পারে।
৫. ক্ষুধা না লাগলে খাওয়া যাবে না এবং কিছু ক্ষুধা অবস্থাতেই আহার শেষ করতে হবে।
৬. গরমের দিনে বেশি গোশত খাওয়া যাবে না।
৭. শীতকালে প্রত্যহ এক গ্লাস মৃদু গরম পানি পান করবে শীতকালে সে অনেক রোগ হতে দূরে থাকবে।

চারটি কারণে অসুখ ও দুর্বলতা দেখা দেয়

১. অতিরিক্ত কথা বলা।
২. অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করা।
৩. অতিরিক্ত ঘুমানো।

৪. অতিরিক্ত আহার করা।

নিম্নলিখিত কারণে মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে হয়

১. অতিরিক্ত পরিমাণে রসুন, শিম, বেগুন খেলে।

২. অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করলে।

৩. বেশি বেশি হাসাহাসি করলে।

৪. হতাশা অবসন্নতায় ভুগলে।

৫. বিষাক্ত কোনো কিছু গ্রহণের ফলে।

৬. দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গতায় (Loneliness) ভুগলে।

১৬. গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কিছু টিপস্

* আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন- আমার নিকট নেফাস ওয়ালী মহিলাদের খেজুর সমতুল্য কোনো শেফা (রোগমুক্তি) নেই এবং রোগীর জন্য মধুতুল্য কোনো জিনিস নেই।
* রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, "নেফাসের অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীদেরকে খেজুর খাওয়াও। কেননা, মরিয়ম (আ) থেকে যখন ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার ইলমের চেয়ে কোনো উত্তম খাদ্য থাকতো তবে তিনি তারই ব্যবস্থা করবেন।
* রাসুল (সা) ইরশাদ করেছেন, নেফাসের মধ্যে নারীদের খাদ্য তালিকায় তাজা খেজুর অথবা শুকনা খেজুর থাকে, তার সন্তান হয় অত্যন্ত সহনশীল (নযহাতুল মজলিশ দ্বিতীয় খণ্ড)।

১৭. মহামারী আকাশে প্লেগ রোগে জনগণের করণীয়

ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল খলিফার সঙ্গে সিরায়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দামেস্ক-এর অদূরে জাবিয়া নামক স্থানে পৌছার পর তারা খবর পান। সিরিয়ায় এখন মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। প্রত্যহ বহু লোক এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ব্যাপক আকারে প্রাণহানী ঘটছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল বললেন, আমরা মহামারীর ভিতর প্রবেশ করবো না এবং জ্বলন্ত আগুনে লাফিয়ে পড়বো

না। অন্যদল অভিমত প্রকাশ করলেন, আমরা সেখানে যাবো। কেননা, কুরআনে মৃত্যুর ভয়ে স্থান ত্যাগ করার নিন্দা করা হয়েছে।

"আপনি সে লোকদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। অথচ তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার"।

অতঃপর উভয় দল খলিফার খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাইল। খলিফা বললেন, এখান থেকে প্রস্থান করা উচিত এবং মহামারীর ভেতর প্রবেশ না করা উত্তম। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাদের অভিমত খলিফার বিপরীত ছিল তারা আরজ করলেন, আমরা আল্লাহ তা'য়ালার তাকদীর দেখে তাঁরই তাকদীরের দিকে যাব। এতে দোষ কি? এরপর তিনি একটি দৃষ্টান্ত অবতারণা করে বললেন, মনে কর তোমাদের মধ্যে কারো কাছে একটি ছাগলের পাল আছে এবং বিচরণের জন্য দুটি চরণ ভূমি আছে। একটি সবুজ ঘাসে পূর্ণ ও অপরটি শুষ্ক। পালের মালিক যদি সবুজ ঘাস বিশিষ্ট চরণ ভূমিতে ছাগল চড়ায়, তবু আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী হবে। শ্রোতারা সকলেই খলিফার এই বক্তব্য যথার্থ বলে মেনে নিল। এরপর তিনি পরামর্শের জন্য আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। পরের দিন আব্দুর রহমান এসে বললেন, আমিরুল মুমেনিন এ সম্পর্কে আমি রাসূল (সা)-এর মুখ থেকে যা শুনেছি তাই আমার অভিমত। খলিফা বললেন, সুবহান আল্লাহ আপনি কি শুনেছেন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। আব্দুর রহমান বললেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি "যখন তোমরা কোনো ভূ-খণ্ডের মহামারীর কথা শুন তখন সেখানে প্রবেশের দুঃসাহস দেখিও না। আর যদি যেখানে তোমরা আছো সেখানে মহামারী দেখা দেয়, তবে ভয়ে সে স্থান ত্যাগ কর না"। ওমর (রা) এই হাদীসে নিজের মতের সমর্থন দেখতে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কিরাম জাবিয়া থেকে সরিয়ে আনলেন।

এখন দেখা উচিত এ ধরনের বিষয় যদি তাওয়াক্কুলের শর্ত হয় তবে সাহাবায়ে কেরাম কেমন করে তাওয়াক্কুল বর্জন করতে একমত হলেন? অথচ তাওয়াক্কুল দ্বীনের উচ্চতর মাকামসমূহের অন্যতম।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে যে শহরে মহামারী সেখান থেকে চলে যেতে কেন নিষেধ করা হলো? অথচ চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী মহামারীর

কারণ হচ্ছে বায়ু দূষিত হওয়া। দূষিত বায়ু থেকে বেঁচে থাকা একটি উত্তম চিকিৎসা। হাদীসে এর অনুমতি দেয়া হলো না কেন? এর জবাব, নিঃসন্দেহে দূষিত পরিবেশ থেকে পলায়ন করা নিষিদ্ধ হতে পারে না। দূষিত বায়ু কেবল বাহ্যিক দেহে লাগলেই ক্ষতি হয়ে যায় না; বরং সর্বক্ষণ এতে শ্বাস-গ্রহণ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। যদি বায়ুতে রোগ জীবানূ মিশ্রিত থাকে এবং তাতে বেশি মাত্রায় শ্বাস গ্রহণ করা হয়। তবে শ্বাসের মাধ্যমে জীবানু দেহের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে পৌছে ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্ত্রসমূহকে প্রভাবিত করে। এমতাবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি মহামারী এলাকায় বসবাস করার পর সেখান থেকে চলে যায় তবে দূষিত বায়ুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

দূষিত বায়ুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে তখনই পারবে যখন আক্রান্ত এলাকায় ব্যক্তি বিশেষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রবল থাকবে এবং দূষিত বায়ুর প্রভাব কম থাকবে। অতএব মহামারী থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত হবে না; বরং পালিয়ে দূষিত বায়ুর প্রভাব নিয়ে অন্যত্র গেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষীণ থাকা ব্যক্তি বিশেষের তা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরবর্তীতে তা সম্প্রসারণ হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করবে। আক্রান্ত এলাকা থেকে সেবা যত্নশুশ্রুষা করা যেত। জনগনের উপকার হতো। কারণ মুসলমানেরা সকলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো এক অঙ্গের ব্যথা হলে অন্য অঙ্গটিও ব্যথিত হয়ে যাবে। এ কারণে হাদীসে মহামারী থেকে পলায়নকারিদেরকে জেহাদের সারি থেকে পলায়নকারীদের সমতুল্য বলা হয়েছে। কারণ এ ধরনের পলায়নের মধ্য অন্য মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টা পাওয়া যায়।

১৮. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা
(DAY OF THE NEW MOON AND FULL MOON)

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অমাবস্যার সময় পৃথিবীর প্রতি চন্দ্রের মহাকর্ষ বলের প্রভাব স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কমে যায় এবং চন্দ্রের প্রতিও পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের প্রভাব স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কমে যায়, এতে পৃথিবীর প্রতিটি জীবদেহের দৈহিক গতিবেগ স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। ফলে জীবদেহে সৃষ্টি হয় অস্বস্তি ও অস্থিরতা। আর যখন পূর্ণিমা শুরু হয় তখনও পৃথিবীর প্রতি চন্দ্রের মহাকর্ষ বলের প্রভাব স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেড়ে যায় এবং চন্দ্রের প্রতিও পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের প্রভাব স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেড়ে যায়। এতেও পৃথিবীর প্রতিটি জীব দেহের দৈহিক গতিবেগ স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। ফলে, পৃথিবীর প্রতিটি জীবদেহে সৃষ্টি হয় অস্বস্তি ও অস্থিরতা।

তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি জীব দেহকে উক্ত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রভাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কিছুটা উপায় হচ্ছে উক্ত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ে পৃথিবীর প্রতিটি জীবদেহকে হালকা জাতীয় সামান্য নরম কিছু খাবার গ্রহণ করা, অথবা উপবাস থাকা। কারণ ঐ সময় হালকা খাবার যা শুকনা জাতীয় তা গ্রহণ করলে, তখন শরীরও হালকা থাকে এবং তার উপর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চাপ পড়লেও তেমন অস্বস্তি অনুভব হয় না। কিন্তু অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যে ভারী রসালো খাবার গ্রহণ করলে, এতে শরীর ভারী হয়ে যায় এবং তার উপর আবার পতিত হয় অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চাপ, এতে শরীর আরও ভারী হয়ে যায়, ফলে দেহে নানা অশান্তি-অস্থিরতা ও আরও নানা বিষ-ব্যাথা দেখা দেয়।

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই পৃথিবীর মানুষদেরকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতি মাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মধ্যে নিয়মিতভাবে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে হাদীসে বলে গেছেন, যেমন–

عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ۔

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ধৈর্য্যের মাস হচ্ছে, প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে তিন দিন রোযা রাখা। অর্থাৎ সারাজীবন অমাবস্যা-পূর্ণিমাসহ নিয়মিতভাবে তিন দিন রোযা রাখা।

(নাসায়ী হা/ ২৪০৮ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা-৩২৭, কিতাবুস সিয়াম)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامٍ ثَلٰثَةَ عَشَرَ وَاَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ۔

অর্থ : আবু জার (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) তাঁর সাহাবাদেরকে প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতে আদেশ করে গেছেন। (নাসায়ী, হা/২৪২৬ ১ম খ-, ৩২৯ পৃষ্ঠা, কিতাবুস সিয়াম।)

১৯. এইড্স

AIDS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

এইডস্-একয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম, একটি প্রাণঘাতী সামাজিক ব্যাধি। শতাব্দীর মহামারী এক দুরারোগ্য কালব্যাধি এইডস্ বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও দীর্ঘদিন হতেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে অসহায়ত্বের মধ্যে নিমজ্জিত করে অবশেষে মৃত্যুর কালগহ্বরে নিক্ষেপ করে।

১৯৮৫ সালের বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্রাভিনেতা রক হাডসনের এইড্সে অকাল মৃত্যু ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সারা বিশ্বের সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে ওঠে এইড্স। এর আগে ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট এ রোগের ভাইরাস শনাক্ত করে। ১৯৮৬ সালে এই ভাইরাসের নাম দেয়া হয় (HIDV (Human Immuno Deficiency Virus), ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ রোগ সর্বপ্রথম শনাক্ত করা হয়। ওই একই বছরের জুন মাসে আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন অঞ্চলে এইড্স রোগে আক্রান্ত রোগী পরিদর্শনের জন্য বের হন। সর্বপ্রথম তারা এইড্সে আক্রান্ত মেয়ে মহলে প্রবেশ করে তাদের জীবন ইতিহাস শুনে রিপোর্ট পেশ করে বলেন যে, উক্ত এইড্সে আক্রান্ত মেয়েদের কেউ একাধিক পুরুষের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত ছিল। আবার তাদের কেউ বেশি বেশি পরস্পর মেয়ে মেয়ে সমকামে লিপ্ত ছিল। আবার তাদের কেউ কেউ

তাদের মাসিক অবস্থায় পুরুষের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত থাকত। আবার তাদের কেউ কেউ তাদের পিছন দিক দিয়ে পুরুষদেরকে যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিতেন।

তারপর উক্ত বিজ্ঞানীর দল, এইড্‌স রোগে আক্রান্ত ছেলে মহলে প্রবেশ করে তাদের জীবন ইতিহাস শুনে রিপোর্ট পেশ করে বলেন যে, উক্ত এইড্‌সে আক্রান্ত ছেলেদের কেউ একাধিক মেয়ের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত ছিল। আবার কেউ পরস্পর পুংমৈথুন করেছে, আবার তাদের কেউ মেয়েদের মাসিক অবস্থায় অথবা মেয়েদের পিছন দিক দিয়ে যৌন কর্ম করেছে।

উক্ত বিজ্ঞানীরা এইড্‌সে আক্রান্ত উক্ত দু'টি ছেলে ও মেয়ে মহলের পরিদর্শনের মাধ্যমে জানতে পারে যে, উপরোক্ত ছেলে-মেয়েদের যৌন কর্মগুলিই হচ্ছে এইড্‌স রোগ সৃষ্টির মূল কারণ। এছাড়াও এরপর উক্ত বিজ্ঞানীরা এইড্‌স সৃষ্টির আরও দু'টি কারণ বের করেছে, যেমন- কোনো ছেলে যদি এইড্‌স রোগে আক্রান্ত কোনো মেয়ের সাথে যৌন কর্ম করে, অথবা কোনো মেয়ে যদি এইড্‌স রোগে আক্রান্ত কোনো ছেলেকে তার সাথে যৌন কর্ম করার সুযোগ দেয়। তবে উক্ত ছেলে অথবা মেয়ের এইড্‌স রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথবা, এইড্‌স রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সিরিঞ্জের সুঁচ অথবা তার রক্ত যদি কোনো সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করানো হয় তবে উক্ত সুস্থ ব্যক্তিরও এইড্‌স রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তাই বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত ছেলে-মেয়েদের যৌনকর্মগুলো না করার জন্য বিশ্ববাসীকে কঠোরভাবে আদেশ করেছেন। কারণ উক্ত যৌন কর্মগুলো করলে জীবনের যে কোনো সময় উক্ত ঘাতক ব্যাধি হতে পারে এবং হয়ে গেলে তার রক্ষা নেই। (জনকণ্ঠ ২৩-১২-২০০২ ইং)

অথচ মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই পবিত্র কুরআনের আলোকে উক্ত ছেলে-মেয়েদের যৌন কর্ম সম্পর্কে কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন এবং বলেছেন যে, নূহ (আ) ও লূত (আ) উভয়ের আমলের নারী-পুরুষেরা বর্তমান এইড্‌স রোগে আক্রান্ত নারী-পুরুষের ন্যায় যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উভয় নবী (আ)-এর জাতিদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এছাড়াও মহানবী (সা) পবিত্র কুরআনের আলোকে নারী-পুরুষের মধ্যে উক্ত যৌনকর্মগুলো না করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আদেশ বা সতর্ক করে গেছেন। যেমন–

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

অর্থ : তোমরা হায়েয বা মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সংগম হতে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়। (সূরা বাকারা : আয়াত-২২২)

وَالَّذَانِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا

অর্থ : তোমাদের মধ্যে হতে যে দু'জন সেই কুকর্মে (পুংমৈথুনে) লিপ্ত হয়, তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান কর। (সূরা নিসা : আয়াত-১৬)

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ۔

অর্থ : তোমরা তো যৌন কর্ম বশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। অর্থাৎ গুরুতর অন্যায় করেছ। (সূরা আরাফ : আয়াত-৮১)

১৯৮১ সালে নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় দু'জন লোক নিউমোসিস্টিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য এই দুজনই ছিলেন সমকামী। দেখা গেল, দুজনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন সবার ধারণা হলো সমকামীদের মধ্যে এ রোগ দ্রুত ছড়ায়। প্রাথমিকভাবে এই অসুস্থতার নাম দেয়া হয় গে-রিলেটেড ইমিওনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম বা গ্রিড। এর জীবাণু হিসাবে এল এভি এরপর এইচটি এলভি-৩ অতঃপর এইচ আইভি নামটি স্থায়ী হয়। ১৯৮২ সালে রোগটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় এইড্স।

এই ঘাতক ব্যাধিটি যেন মানব সমাজে প্রসার লাভ করতে না পারে সে জন্য মহানবী (সা) এই রোগটি আবিষ্কার হওয়ার দেড় হাজার বছর পূর্বেই পবিত্র কুরআনের আলোকে এই বিশ্বের সমস্ত মানুষকে বলে গেছেন যে, তোমরা কখনও যেনার ধারে কাছে যাবে না এবং যেনা হচ্ছে নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্যের স্ত্রী কিংবা অন্য কোনো নষ্টা মেয়ের সাথে দৈহিক মিলনে

লিপ্ত হওয়া। এবং তিনি পুংমৈথুন, সমকাম ও যেনার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান এ জন্যই দিয়ে গেছেন যে, যাতে মানুষ এইড্স রোগের ভয়ে অন্যায় কাজসমূহের দিকে না যায়। যেমনঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : যিনাকারী নারী ও যিনাকারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই একশত করে বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি কোনো প্রকার দয়ার আবেগ যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও। আর তাদের এই দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন অবশ্য প্রত্যক্ষ করে। (সূরা নূর : আয়াত-২)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ : بَايِعُوْنِيْ عَلٰى اَنْ لَّا تَزْنُوْا ـ (متفق عليه)

অর্থ : উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (সা) একদল সাহাবা (রা) কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন– তোমরা আমার নিকট এ কথার উপর বায়আত গ্রহণ কর যে, তোমরা কখনও যিনা করবে না। (বুখারী হা/৩৮৯২)

২০. অজু
ABLUTION

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের পেশাব পায়খানা করার সময় দেহ হতে বিষাক্ত অপবিত্র দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, ইহা বের হওয়ার জন্য দেহের শেষ প্রান্তের অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের মধ্যে জমা হয়ে অবস্থান করতে থাকে। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, উক্ত অপবিত্র বিষাক্ত দূষিত পদার্থকে দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, পায়খানা পেশাব করার পর সাথে সাথে দেহের উক্ত শেষ প্রান্তের অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গগুলো ভাল করে ধুয়ে ফেলা। নচেৎ ইহা দ্বারা দেহের অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা দেহের শেষ প্রান্তের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে নির্বাচন করেছেন, দেহের মাথা ও মুখমণ্ডলকে, দেহের দু'হাতের কনুই হতে দু'হাতের দশ আঙ্গুল পর্যন্ত এবং দেহের দু'পায়ের টাকনু হতে দু'পায়ের দশ আঙ্গুল পর্যন্ত অংশকে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই প্রত্যেক ওযুতেই নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের নির্বাচিত উক্ত অঙ্গ প্রত্যেঙ্গগুলো খুব ভাল করে ধৌত করাকে ফরয বা অত্যাবশ্যক বলে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পেশাব পায়খানার সাথে সাথে শরীর হতে অপবিত্র পদার্থ নির্গত হয়ে ইহা দেহের শেষ প্রান্তের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহে গিয়ে উপনীত হতে থাকে, তা তিনি জানতেন, তাই তিনি উক্ত অপবিত্র পদার্থকে দূর করার জন্য তাঁর উম্মতের প্রতি ওযুর ব্যবস্থা করে গেছেন। অর্থাৎ অজু হচ্ছে উক্ত নাপাক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করা। যা তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ হতে পেয়েছেন। যেমন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا (سورة المائدة اية نمبر_٦)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে, তাঁর পূর্বে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করবে, তারপর দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত

করবে, তারপর মাথা মাসেহ করবে, তারপর দু'পায়ের টাকনু হতে শুরু করে আঙ্গুল পর্যন্ত ধৌত করবে। (সূরা মায়িদা : আয়াত-৬)

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, দেহের মধ্যে ওযুর স্থানগুলো ধৌত করলে ইহার মধ্যে দেহের যাবতীয় জমাকৃত নাপাকী ময়লাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায়।

একজন অমুসলিম বিজ্ঞানী এক মুসলমানকে অযু করতে দেখলেন। তিনি দেখলেন যে, কব্জি হতে কনুই অংশ ধৌত করার সময় ব্যবহৃত পানিকে নিচ হতে নয় বরং কনুই (পর্যন্ত) হতে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। তিনি এই পন্থা দেখে বড়ই প্রভাবিত হলেন। এরপর তিনি মাথা ও ঘাড়ের উপর মাসেহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, মাথা ও ঘাড় ধোয়া হলো না, যাতে উত্তপ্ত অবস্থায় ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। মাথা ও ঘাড় না ধুয়ে হাত বুলালেন (মাসেহ করলেন) যাতে প্রশান্তি ছাড়াও শিরার মধ্যে কম্পনের অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ধোয়ার দ্বারা হয় না।

যেহেতু কোমর ও ঘাড়ের সম্পর্ক শ্লেষার উৎস স্থলের সঙ্গে এবং মস্তিষ্ক শিরার কার্যাবলীতে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ পদ্ধতিকে দেখে (সেই অমুসলিম বিজ্ঞানী) এমনই প্রভাবিত হন যে, তিনি ইসলামের সামনে নিজ শির নত করে দিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ১৩০০ বছর পূর্বে যে ব্যক্তিত্ব নামাযের পূর্বে পবিত্রতা এবং অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গের পরিচ্ছন্নতার এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন তিনি নবী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

অজুর দৈহিক উপকারিতা

প্রফেসর ডাক্তার মুহাম্মাদ আলমগীর খান এবং আরসিপি জীবাণু হতে আত্মরক্ষার জন্য অজুর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন :

অজু স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলনীতির একটি। এটি জীবাণুর বিরুদ্ধে এক অতি বড় ঢাল। যেসব জীবাণুর কারণে বহু রোগ জন্মলাভ করে থাকে। এসকল জীবাণু আমাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে। বায়ু, যমিন এবং আমাদের ব্যবহৃত সব জিনিসের ওপর এ কষ্টদায়ক (জীবাণু) প্রভাব বিস্তার করে আছে।

মানবদেহ একটি দুর্গের ন্যায়, ছিদ্রপথ অথবা জখমের স্থান ছাড়া এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নাক মুখের ছিদ্রগুলো সর্বদা জীবাণুর আক্রমণের মধ্যে আছে এবং আমাদের হাতগুলো এসব জীবাণুকে ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে (আত্মঘাতী) সাহায্য করে থাকে। অজুর মাধ্যমে আমরা

শুধু এসব ছিদ্রের মধ্যেই নয় বরং আমাদের দেহের ঐ সব অংশের দিকে কয়েকবার ধৌত করা হয়, যা কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে না এবং সহজে জীবাণুর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে, এজন্য অজু আমাদেরকে অনেক রোগ হতে রক্ষা করার উত্তম এক মাধ্যম।

অজু ও মানবদেহ

হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (যিনি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়, চিকিৎসা ও আঘাত বিভাগের প্রধান এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হতে দীনিয়াত এ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন) তিনি অজুর দৈহিক উপকারিতার বিষয়ে লিখেছেন :

'অজুর দ্বারা মানুষের ঐ সব অঙ্গ যা খোলা থাকে যেমন– হাত, মুখ, নাক, চোখ, চেহারা ইত্যাদি ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যায়। এসব অঙ্গগুলো সব সময় খোলা থাকায় এবং এগুলো দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের দুর্গন্ধ ও নোংরা জিনিসের সাথে মিলে থাকে এবং বেশির ভাগ সক্রিয় রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। অজুর মাধ্যমে এসব আবর্জনা ধৌত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। অজুর আরও উপকারিতা এই যে, ঘুম ও স্বপ্নের মাধ্যমে যে অবস্বাদ গ্রস্ততা, ক্লান্তি মানব প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় তা অজুর পরে দূর হয়ে যায়। মানুষের মন মগজে সতেজতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য যে, অজু শিরার কেন্দ্রগুলোতে কম্পন সৃষ্টি করে। (ইসলামের স্বাস্থ্যগত মূলনীতি, পৃ. ৩১, ডা. সাইয়েদ হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন, প্রকাশক হাইয়া আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)।

অজুর উপকারিতা

তুরস্কের ডাক্তার ডডহুলুক নূর বাকী, অজু স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম মাধ্যম-এর অধীনে অজুর চিকিৎসাগত উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি (Blood Circulatory System) এর উপর অজুর প্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর লিমফটিক সিসটেম (Lymphatic)-এর উপর অজুর মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রভাবের বিশ্লেষণ করেছেন যা নানা প্রকারের রোগ ব্যাধি হতে সুরক্ষার নিয়ম। সর্বশেষে অজু এবং শারীরিক বৈদ্যুতিক স্থিতি-এর উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আলোচনা করেছেন। (A static electricity of the body)

ডাক্তার নূর বাকী-এর দৃষ্টিতে, যে পদ্ধতিতে অজু করা হয় এর উদ্দেশ্য, দেহের মধ্যেকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। এর কয়েকটি দিক হলো-

১. দেহকে সংরক্ষণের জন্য লিমফটিক ব্যবস্থা (Lymphatic System) এর সঠিক পদ্ধতিতে কাজ পূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক যে, দেহের কোনো ক্ষুদ্র অংশেও নজর করা যায় না। অজু এ কাজের দায়িত্ব বহন করে।

২. দেহের মধ্যকার সংরক্ষণের নিয়ম এর নড়া-চড়া করার জন্য কেন্দ্রস্থল এ স্থান যা নাকের পিছনে নাসারন্ধ্রের মধ্যে হয়ে থাকে এবং এ সকল স্থান ধৌত করা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

৩. ঘাড়ের দুপাশে অজুর দ্বারা কম্পন সৃষ্টি করার লিমফটিক পদ্ধতি (Lymphatic System)-এর ক্রয়ে ফার্লানের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অজুর পানি প্রবাহ

একজন নামকরা জার্মানি গুণী ও প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম জীবয়ুলদ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কুরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের শিক্ষার ওপর চিন্তা-ভাবনা করার পরে এ সত্যকে স্বীকার করে তিনি লিখেছেন–

গোসল দ্বারা দেহ এবং অজুর দ্বারা এর অঙ্গগুলো পবিত্র করা জরুরি, যা সাধারণ কাজকর্ম অথবা চলা-ফেরার মধ্যে খোলা থাকে। মুখ পরিষ্কার করা মিসওয়াক করা, নাকের ভেতরকার ময়লা-আবর্জনা দূর করা –এ সকলই স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এ আবশ্যকগুলোর বড় শর্ত হলো পানি প্রবাহের ব্যবহার যা বাস্তবে জীবাণুর অস্তিত্ব হতে পবিত্র করে।

অজুর চিকিৎসাগত উপকারিতা

অজুর ধারা অনুযায়ী অজুর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বর্ণনা করা হলো।

হাত ধোয়া

যখন অজু করা হয় তখন সর্বপ্রথম দুহাত তিনবার ধোয়া হয়, এরূপ করা নবী করীম (সা)-এর সুন্নাত। হাদীস শরীফে এরূপ কাজকে গুনাহ হতে পাক করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেহেতু রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন–

فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ.

অর্থ : যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ্ পড়ে যেতে থাকে, এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে।

(সুনানে নাসায়ীঃ হা/১০৩ মাথাসহ দুইকান মাসেহ অধ্যায়ঃ ১০৩ নম্বর)

যেহেতু হাত ধোয়ার দ্বারা মানবদেহে প্রচুর পরিমাণে উপকার সাধিত হয়, এর কয়েকটি আলোচনা করা হলো :

আমরা বিভিন্ন জিনিস হাত দ্বারা ধরে থাকি, যেহেতু হাত খোলা থাকে এতে হাতের ওপর বিভিন্ন রোগের জীবাণু বা বিভিন্ন কেমিক্যাল (Chemicals) বিদ্যমান থাকে যা আমাদের হাতকে কলুষিত করে। যদি হাত না ধুয়ে কুলি করা হয় বা নাকে পানি দেয়া হয় তাহলে এসব জীবাণু সহজেই আমাদের মুখ বা নাকের মাধ্যমে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহকে নানা প্রকারের রোগে আক্রান্ত করে। এজন্য হাত ধোয়ার উপর এতোই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে বিভিন্ন ধরনের রোগ আমাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। এর ধারাবাহিকতায় আমেরিকার অধ্যাপক ডাক্তার সাহেদ আতহার এম. ডি লিখেছেন–

Hand washing is being emphasized more and more in Hospitals now in order to prevent spread of germs. However Non-Maslim did not know that hand washing is 50 importan has been ordered in the Quran 1400 years ago. (Health Guidelines from Quran and Sunnah P.60)

বর্তমানে হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট জোর দেয়া হচ্ছে, হাসপাতালগুলোতে যাতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে না পারে। অমুসলিমগণ জানেন না যে, হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

খাজা শামসুদ্দিন আজিমী লিখেছেন, যখন অজু করি তখন আঙ্গুলের ফাঁকগুলো হতে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন বৃত্ত তৈরি করে যে, যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার দূরীকরণের, বৈদ্যুতিক শৃংখলার শক্তি বেড়ে যায় এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ এক সীমা পর্যন্ত হাতের মধ্যে ঝলক দেয়, এ কাজের দ্বারা হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সঠিক পদ্ধতিতে অজু করার দ্বারা আঙ্গুলের মধ্যে এমন লাবণ্য তৈরি হয়, তার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাগজ বা সিটের ওপর পরিবর্তন করার সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয়ে যায়।

কুলি করা

অজুর সময় তিনবার কুলি করা সুন্নাত। এর দ্বারা গুনাহ্ ঝরে যায়। যেমন রাসূল (সা) ইরশাদ করেন-

اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ۔

অর্থ : যখন মুমিন বান্দা অজু করার সময় কুলি করে, তখন তার মুখের সকল গুনাহ্ ঝরে যায়। (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি পৃ. ২৬৩) (সুনানে নাসায়ী, হা/১০৩ মাথাসহ দু-কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

কুলির দ্বারা দাঁতের মধ্যকার খানা ঢুকে থাকা কণা মুখ হতে বের হয়ে যায়। যদি দাঁতের অভ্যন্তর হতে এসব কণা বের না করা যায় তাহলে এগুলো দাঁত, মস্তিষ্ক এবং গলার বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে যায়।

কুলি করার দ্বারা যা মুখকে পরিষ্কার করে, তা দাঁতের রোগ হতে মুক্ত করে, চোয়াল মজবুত হয় এবং দাঁতের মধ্যে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়, রুজি বেড়ে যায় এবং মানুষ টনসিলের রোগ হতে সুরক্ষিত থাকে।

নাকে পানি দেয়া

নাকে পানি দেয়াও নবী করীম (সা)-এর সুন্নাত। ডান হাত দ্বারা নাকে তিনবার পানি দিবে এবং বাম হাত দ্বারা পাক পরিষ্কার করবে। এভাবে হাদীস শরীফে নাক পরিষ্কার করারও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন : মুমিন যখন অজু করার সময় নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে, তখন নাকের গুনাহ্ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়। (এসব গুনাহ বলতে ছগীরা গুনাহের কথা বলা হয়েছে। কবীরা গুনাহ বিশেষভাবে তাওবা ও ফিরে আসার সিদ্ধান্তে মাফ হয়ে থাকে।

(ক. মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি পৃ. ২৬৩)

সুনানে নাসায়ী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন–

فَاِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهِ۔

অর্থ : মুমিন বান্দা অজু করার সময় যখন নাক ধোয়, তখন নাকের সকল গুনাহ্ ঝরে যায়। (সুনানে নাসায়ী, হা/১০৩ মাথাসহ দু'কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

নাক ধোয়া এবং পরিষ্কার করার মধ্যে যেখানে পবিত্রতা অর্জিত হয়, সেখানে চিকিৎসাগত উপকারিতাও অর্জিত হয়। কুলি করার পর নাকে

পানি দেয়া হয়, নাক মানব দেহের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগ দেয়ার যোগ্য অঙ্গ। নাকের উত্তম যোগ্যতা এই যে, আওয়াজকে অন্তরঙ্গ করে এবং সহ্য ক্ষমতা সৃষ্টি করে। আঙ্গুল দ্বারা নাকের ছিদ্রের নাসারন্ধ্রকে দাবিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে আপনার নিকট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। নাকের মধ্যকার পর্দাগুলো আওয়াজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মস্তকের জ্যোতি একত্র করে। বিশেষ অংশগুলো পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে নাকের বড় ভূমিকা রয়েছে। নাক ফুসফুসের জন্য বায়ুকে পরিষ্কার, গরম এবং উপযুক্ত করে তোলে।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যহ প্রায় শত ঘনফুট বায়ু নাকের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করে। বায়ুর এত বড় পরিমাণে একটি বড় কক্ষ ভরে যাবে। বরফের মওসুমে জমা এবং শুষ্ক দিনে আপনি বরফের ময়দানে (Skating) স্কেটিং শুরু করে দিন, কিন্তু আপনার ফুসফুস শুষ্ক হাওয়ার দ্বারা সমস্যায় পড়ে না। সে এর এক অযুতাংশও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, যদিও এমতাবস্থায় তার এত বায়ুর প্রয়োজন হয় যা গরম ও আর্দ্র হাওয়ায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে ৮০% আর্দ্র এবং ৯০° ফারেনহাইট উষ্ণ বায়ু চায়। ফুসফুস জীবাণু হতে পবিত্র ধোঁয়া অর্থাৎ ধুলা ও ময়লা মুক্ত বায়ু চায়। এরূপ পরিমাণ বায়ু জমাকৃত একটি এয়ার কণ্ডিশন ছোট ট্রাংকের সমান হবে অথচ নাকের মধ্যে কুদরতের নিয়ম একে এমন সংক্ষিপ্ত এবং সমন্বিত (Integrated) করে দিয়েছেন যে, সে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা।

নাক বায়ুকে আর্দ্র করার জন্য Error! গ্যালন (এক-চতুর্থাংশ গ্যালন) আর্দ্রতা প্রতিদিন তৈরি করে থাকে। পরিষ্কার এবং অন্যান্য শক্ত কাজ নাসারন্ধ্রের চুলগুলো করে থাকে। নাকের মধ্যে এক খাদক ঝাড়ু আছে। এ ঝাড়ুর মধ্যে অদৃশ্য শলাকা রয়েছে যা হাওয়ার মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছানো ক্ষতিকর জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। জীবাণুগুলো মেশিনের মতো ধরা ছাড়াও অদৃশ্য শলাগুলোতে এক প্রতিরোধী মাধ্যম রয়েছে যাকে ইংরেজিতে Lysonimon বলা হয়। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে নাক চোখগুলোকে Infection হতে রক্ষা করে। যখন কোনো নামাযি ব্যক্তি অজু করার সময় নাকের ভেতর পানি দেয়, তখন পানির মধ্যে কার্যকরী বৈদ্যুতিক রশ্মি অদৃশ্য লোম-এর কার্যকরী শক্তি বাড়ায়। যার ফলে মানুষ অসংখ্য অদৃশ্য রোগ হতে সুরক্ষিত থাকে।

মুখমণ্ডল ধোয়া

অজু করার সময় একবার চেহারা ধোয়া ফরয এবং তিনবার ধোয়া নবী করীম (সা)-এর মুবারক সুন্নাত। চেহারার সীমা মাথার চুলের গোড়া হতে নিয়ে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত। হাদীস শরীফে চেহারা ধৌত করা রহমতের কারণ। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন–

فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ۔

অর্থ : অজুকারী যখন নিজ চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারার গুনাহগুলো ঝরে যায় এমনকি চোখের পালকের শিকড় হতেও বের হয়ে যায়।

এরপরে নবী করীম (সা) আরো বর্ণনা করেন : অজুকারী যখন মুখমণ্ডল ধোয় তখন সকল গুনাহ এবং অপরাধ এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেন আজই তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।

(মুসনাদে আহমদ, হা/১৯০৯১ খ.-৫, আরবি পৃ. ২৬৬)

মুখমণ্ডল ধোয়ার অনেক বেশি চিকিৎসাগত, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। নিচে সে সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা হলো :

চেহারা ধোয়ার বড় হিকমত নিহিত রয়েছে যে, এর দ্বারা অবয়বে নম্রতা ও সূক্ষ্মতার সৃষ্টি হয়। ময়লা ধুলার দ্বারা বন্ধ লোমকূপ খুলে যায়। চেহারা উজ্জ্বল, পূর্ণ আকর্ষণ ও ভীত হয়ে যায়। মুখ ধোয়ার সময় পানি যখন চোখের মধ্যে যায় তখন এর দ্বারা চক্ষুর অবয়বে শক্তি পৌঁছায়। গোলকের সাদা এবং মনির মধ্যে উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। অজুকারীর চোখ পূর্ণ আকর্ষণীয় সুশ্রী ও নিদ্রালু হয়ে যায়। চেহারার ওপর তিনবার হাত বুলানোতে সীনা ও মস্তিষ্কের ওপর প্রশান্তি আসে।

আজকাল যখন আমরা ঘর হতে বের হই এবং আমাদের চলাচল এমন স্থান দিয়ে হয় যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যেমন অনেক স্থানে ময়লা ধুলার বর্জ্য-স্তুপ পড়ে রয়েছে অথবা প্রাণী বা মানুষের বর্জ্য খোলা পড়ে রয়েছে, কোথাও বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ যেমন নাড়ী-ভুড়ি,

রক্ত ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে। এসব স্থান জীবাণুর স্বর্গরাজ্য এবং যখন এটা খোলা পড়ে থাকে তখন এর জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে এবং যখন মানুষ এসব স্থান অতিক্রম করে তখন এসব জীবাণু মানুষের হাত, চেহারার ওপর আক্রমণ করে এবং আমরা যখন দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার আমাদের চেহারা মোবারক ধৌত করি তখন এসব জীবাণু হতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি যা চেহারায় পৌছানোর পর নাক-মুখের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ ঘটাতে পারে না।

আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা ময়লা আবর্জনা। শিল্পের উন্নতি আমাদেরকে এ কঠিন সমস্যার ব্যাপারে অধিক সজাগ করে। কারখানার চিমনি হতে বের হওয়া গ্যাস এবং গাড়ির সাইলেন্সার হতে বের হওয়া ধোয়া দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এ আবহাওয়ার মধ্যে কার্বন-ডাই অক্সাইড এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড ব্যতীত সালফার-ডাই-অক্সাইড মিশে যাচ্ছে। যদি এসব গ্যাস হাওয়ার মধ্যে বেশি বেশি থাকে এবং একজন মানুষের ঘামের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে চেহারার ওপর থাকা ঘামের ফোঁটা এই গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস (কার্বন এসিড, সালফিউরিক এসিড) এ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এই ঘাম দ্বারা সৃষ্ট এসিড মানব চর্মকে খারাপ করে দেয়। এজন্য চেহারা ধোয়ার দ্বারা ঘাম এবং বিষাক্ত ক্যামিক্যাল ইত্যাদি ধুয়ে চলে যায় এবং মানুষ চর্মরোগ এবং চেহারার অ্যালার্জী হতে মুক্ত ও নিরাপদ থাকে।

অজুর মাধ্যমে চেহারা ধোয়ার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন রোগ হতে বাঁচতে পারে। চোখের অসুখের সময় ডাক্তারগণ বার বার চোখ ধোয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হাকীম মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ চাগতাঈ-এর মতে অজু করার পর যে অঙ্গগুলো ভিজে যায়, মেডিকেল সাইন্স অনুযায়ী যদি এ অঙ্গগুলো আর্দ্র থাকে তাহলে চোখের রোগ হতে মানুষ বেঁচে যায় এবং যে সব চোখে কাঁচে আর্দ্রতা কমে, তা শেষ হয়ে যায় এবং রোগী ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

দিনের মধ্যে বারবার অজুর জন্য চেহারা ধৌত করার কারণে এর সৌন্দর্য বেড়ে যায়। আমেরিকার কাউন্সিল ফর বিউটি-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লেডিবিচার এক আশ্চর্য ও চমৎকার তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার বক্তব্য

হলো যে, মুসলমানদের কোনো প্রকারের মেডিক্যাল জাতীয় (Madicated) লোশনের প্রয়োজন নেই। তারা ইসলামী অজুর মাধ্যমে চেহারা ধুতে থাকে এবং মুসলমানগণ কয়েকটি রোগ হতে বেঁচে থাকে।

দাড়ি খিলাল করা

অজু করার সময় হালকা দাড়ি ধোয়া যায় এবং ঘন দাড়ি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করে চুলগুলোকে ভিজানো হয়, এটা নবী করীম (সা)-এর সুন্নাত।

দাড়ি ধোয়া অথবা খিলাল করার দ্বারা চুলের গোড়া ভিজে যায় এবং সেগুলো মজবুত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। দাড়ি খিলাল করার দ্বারা সব প্রকারের জীবাণু (Common Germs) এবং (Contaglious Germs) ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। দাড়ির চুলে জমে থাকা পানি গলায় শক্তি যোগায়। এভাবে থাইরয়েড গ্লান্ড এবং গলার সকল রোগ হতে বাঁচায়।

নবী করীম (সা)-এর সব কথায় হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে। অজু ও নামায-এর বিধানাবলি যা একাধারে প্রভুর সন্তুষ্টি ও আত্মিক উন্নতি এবং কল্যাণ সাধিত হয়। ঐভাবে মানবদেহ এবং দুনিয়ার জীবন-এর কয়েকটি সমস্যা হতে বেঁচে যায়।

আজ মানুষের দুনিয়া-আখেরাতের জীবনের কল্যাণ ও সফলতার নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামের বিধানের ওপর আমল করা, অপর কোনো ধর্ম এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। ঐ কারণে সব ধর্ম বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখবেন।

কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া

অজু করার সময় কনুইসহ হাত একবার ধোয়া ফরয এবং তিনবার ধোয়া সুন্নাত। মুমিন বান্দার এ ধরনের আমলকে রহমতের কারণও বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন :

فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ۔

অর্থ : যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ ঝরে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও করতে থাকে।

(সুনানে নাসায়ী : হা/১০৩ মাথাসহ দুই কান মাসেহ অধ্যায়- ১০৩ নম্বর)

বাহুর এ অংশে বিভিন্ন প্রকারের রক্তনালী বা শিরা রয়েছে। এর মধ্যে শিরা (Arterie) এবং রগ (Veins) উভয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেহের এ অংশ বিভিন্ন প্রকার রোগকে চিহ্নিত করার জন্য বড়ই সাহায্যকারী। এখান হতে রগের অনুসন্ধান (Pulse) এবং রক্তচাপ (Blood Pressure) ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়। এ অংশগুলো ধোয়া এবং ম্যাসেজ করার দ্বারা মানবদেহের ওপর ধনাত্মক (উপকারী) প্রভাব পড়ে থাকে। পানি রক্তের উত্তাপকে কমিয়ে উচ্চ রক্তচাপ (High Blood pressure) কে কমিয়ে দেয়।

মাথা মাসেহ করা

এক-চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা ফরয এবং একবার পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। মুসলমানদের এক আমলকেও খারাপ কাজের কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন?

এ ব্যাপারে নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন–

فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ۔

অর্থ : অজুকারী যখন মাথা মাসেহ করে, তখন তার মাথা হতে গুনাহসমূহ ঝরতে থাকে এমনকি তার দুই কানের নিচ হতেও।

(সুনানে নাসায়ী, হা/১০৩ মাথাসহ কান মাসেহ করা অধ্যায়- ১০৩ নম্বর)

মাথা মাসেহ করার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক হিকমত পাওয়া যায়। যেহেতু জ্ঞানবান বলতে জানেন যে, মাথার ওপরের চুল মানুষের এন্টেনার (Antenna) কাজ করে থাকে। এ কথা সব অনুভূতিসম্পন্ন লোকই জানে যে, মানুষ তথ্যের ভান্ডারের নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো কাজের ব্যাপারে খবর না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কাজ করতে পারে না। যেমন খান্য আমরা খাই যখন ক্ষুধা লাগে, পানি তখন পান করি যখন ভেতর হতে পানি পানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। শোবার জন্য বিছানার ওপর ঐ সময়ে শুয়ে পড়ি যখন আমাদের এ খবর মিলে যে, আমাদের শিরাগুলোর আরামের প্রয়োজন। খুশির জয্বা বা অনুভূতি আমাদের ওপর ঐ সময় প্রকাশিত হয় যখন আমাদের খুশির বিষয়ে কোনো খবর জমা হয়। এরূপে অসন্তুষ্টি, রাগ ইত্যাদিও খবরের ওপর নির্ভর করে হয়।

অজু করার নিয়ত মূলত আমাদের এ কথার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে যে, আমরা এ কাজ আল্লাহ তাআলার জন্য করছি। অজুর বিধান পূর্ণ করার

পর যখন আমরা মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌছি তখন আমাদের মেধা আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তি হতে ঘুরিয়ে আল্লাহ তায়ালার সত্তার দিকে কেন্দ্রিভূত হয়। মাসেহ করার সময় যখন আমরা মাথার ওপর হাত বুলাই মাথার চুলগুলো (Antenna) এ কথাকে গ্রহণ করে যা সকল প্রকারের কুসংস্কার, বঞ্চনা এবং আল্লাহ তা'আলার গণ্ডির বিপরীত, অর্থাৎ বান্দার মেধা এ সংবাদকে গ্রহণ করে যা সকল সংবাদের মূল উৎস (আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা) এর রাস্তাই আমাদের রাস্তা।

কান মাসেহ করা

কান মাসেহ করা রাসূল (সা)-এর সুন্নাত। কানের ভেতরের দিকে (পেট) ভিজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা এবং বাইরের দিকে (পিঠ) আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করার মাধ্যমে কানের সকল প্রকারের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং এর দ্বারা শ্রুতির ওপর অন্তরঙ্গ প্রভাব পড়ে থাকে। যখন কানগুলো মাসেহ করা হয় তখন হৃদয়ের ওপর আশ্চর্য রকমের আনন্দের ছাপ পড়ে থাকে।

মুখের ব্রণ

মুখমণ্ডল নিয়মিত ধোয়া হলে মুখে ব্রণ উঠতে পারে না, অথবা ওঠার সম্ভাবনা কমে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে যতো রকমের ক্রিম, লোশন বাজারে পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহার করা হলে চেহারায় দাগ পড়ে। চেহারার সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্যে বার বার মুখমণ্ডল ধোয়া আবশ্যক।

'আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি'র পরিচালক লেডি বিচার একটি বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানদের কোনো প্রকার রাসায়নিক লোশন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। ইসলামী মতে অজু করার মাধ্যমে মুখমণ্ডল ধোয়া হলে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

চেহারার এলার্জি

চেহারার এলার্জির রোগীরা যদি নিয়মিত অজু করে তাহলে এলার্জি হওয়ার আশংকা কমে যায়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এলার্জি হতে আত্মরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর নিয়ম হচ্ছে নিয়মিত মুখ ধোয়া, ওযুর মাধ্যমেই এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

চেহারার ম্যাসেজ

অজুর সময় তিন বার মুখমণ্ডল ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় তিন বার হাত দিয়ে মুখ ম্যাসেজও করা হয়। এ সময় মুখে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় এবং মুখের ধুলো ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। চেহারা তিন বার ধোয়ার যৌক্তিকতা হচ্ছে, প্রথমবার মুখে পানি দিলে ময়লা নরম করা হয়, দ্বিতীয় বার পানি দিলে ময়লা দূর হয়ে যায়, তৃতীয় বার পানি দেয়ায় ময়লা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

ভ্রূতে পানির প্রভাব

অজুর মাধ্যমে ভ্রূতে পানি লেগে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, ভ্রূ ভেজা থাকলে চোখের এমন মারাত্মক রোগ হতে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যেসব রোগের কারণে চোখের দৃষ্টিশক্তি পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

একবার আমার কাছে একজন অন্ধ রোগী এসে জানালো কয়েক মাস হতে আমার চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে। চিকিৎসকরা বলেছেন, চোখের রস এবং সিক্ততা কমে যাওয়ার কারণেই এ রকম অবস্থা হয়েছে।

চক্ষুরোগ হতে বাঁচুন

আপনাদের ঘরে কারো চোখে ব্যথা হলে আপনারা চোখে পানির ছিটা দেয়ার পরামর্শ দেন। এটা একটা ভালো ব্যবস্থা, অথচ এ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানের অজুর মধ্যে নিহিত আছে, এর মাধ্যমে চোখের অসুখ কমে যায়। চোখে পানি দেয়া হলে ধোঁয়া, ধুলোবালি ধুয়ে যায়। ধুলোবালি, ধোঁয়া নাক চোখকে প্রভাবিত করে। পানি দিয়ে ধোয়া হলে চোখ নানা রকম অসুখ হতে রক্ষা পায়।

চোখ, পানি ও স্বাস্থ্য

ইউরোপের একজন ডাক্তার চোখ, পানি ও স্বাস্থ্য নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি প্রতিদিন কয়েকবার পানি দিয়ে চোখ ধোয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, তোমরা প্রতিদিন একাধিকবার মুখ ধোও, তা না হলে তোমরা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবে। অথচ ইহা মুসলমানেরা অজুর মাধ্যমে দিনে কমপক্ষে পাঁচবার করছেন।

অজুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

ইঞ্জিয়ার নকশেবন্দী তার রচিত 'মাওয়ায়েছে' লিখেছেন, মহানবী (সা) প্রতিদিন সকালে ঘুম হতে উঠে অজু করতেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের যুগে বলা হয়েছে, ঘুমোবার পর চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে চোখে পিচুটি জমে। এতে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে ঘুম হতে উঠেই চোখে পানির ছিটা দিতে হবে। যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্যে উঠবে এবং অজু করবে, তারপর ফজরের জন্যে উঠবে এবং অজু করবে, এভাবে একাধিকবার অজু করা হলে চোখের রোগ ভালো হয়ে যায়। তাছাড়া মুখমণ্ডল ধোয়া হলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকার হয়।

অজু ও রক্তচাপ

শরীয়তে আদেশ রয়েছে, তোমরা রাগান্বিত হলে অজু করবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, যখন রক্তচাপ বেড়ে যাবে তখন অজু করবে। এ উভয় বিধান লক্ষ্য করলে গবেষণার নতুন পথ খুলে যায়। ক্রোধের সময় রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদরোগের কারণে যখন উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয় তখন অজু করা হলে রক্তচাপ কমে যায়।

একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের অভিমত

একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, উচ্চ রক্ত চাপের রোগীকে অজু করাতে হবে। অজু করানোর পর রক্তচাপ পরিমাপ করা হলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে, রক্তচাপ কমে গেছে।

এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন মনস্তত্ত্ববিদ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সালামত আযিয। তিনি বলেন, অজু হৃদরোগ আরোগ্য হওয়ার একটি উত্তম উপায়। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদরা প্রতিদিন অজুর মতো করে কয়েকবার দেহে পানি লাগানোর পরামর্শ দেন, কিন্তু এসব জ্ঞান গবেষণার কয়েকশ বছর আগেই ইসলাম ওযুর বিধান প্রবর্তন করেছে।

অজু করার সময়ে প্রথমে হাত ধোয়া, এরপর কুলি করা, তারপর নাকে পানি দেয়া, তারপর মুখ ধোয়া, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার বিধান রয়েছে। পর্যায়ক্রমিক এ রকম ধৌতকরণের মধ্যেও বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিকতা রয়েছে।

অজু করার পর অবশিষ্ট পানি

হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে, অজু করার পর অবশিষ্ট পানি পান করা হলে সুস্থ থাকা যায়। এ বিষয়ে ডাক্তার ফারুক আহমদ গবেষণা করে বলেছেন, অজু করার পর অবশিষ্ট পানি পান করার সুফল প্রথমে কিডনী লাভ করে। এ পানি পান করার ফলে প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এ ছাড়া অজুর অবশিষ্ট পানি পান করা হলে অবৈধ সংসর্গের ইচ্ছা মনে জাগে না। যেসব রোগীর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় তাদের এ সমস্যা দূর হয়ে যায়। এছাড়া অজুর অবশিষ্ট পানি পান হৃদপিণ্ড, কিডনি, পাকস্থলীর শুষ্কতা দূর করে দেয়।

পশ্চিম জার্মানিতে একটি সেমিনার এবং ওযু

পশ্চিম জার্মানিতে এ বিষয়ে একবার একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল আলোচ্যসূচি ছিল অবসাদের চিকিৎসা ওষুধ ব্যতীত অন্য কী উপায়ে করা যায়? একজন ডাক্তার জানালেন, তিনি অবসাদের রোগীদের কয়েকজনের ওপর পরীক্ষা করেছেন। তাদের প্রতিদিন পাঁচবার মুখ ধুতে বলেছেন। কয়েক মাস পর দেখা গেলো তারা সুস্থ হয়ে গেছে। সেই ডাক্তার পরে মানসিক রোগীদের আলাদা একটি দল গঠন করেছেন, তাদের হাত, পা, মুখ দৈনিক পাঁচবার ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে তাদের মানসিক রোগ দূর হয়ে গিয়েছিল। আলোচনার শেষ দিকে তিনি এ সিদ্ধান্তে আসেন, হতাশা রোগ মুসলমানদের কম হয়। কারণ তারা প্রতিদিন পাঁচবার হাত-মুখ ধোয়, অর্থাৎ অজু করে।

২১. ওপেন হার্ট সার্জারী

OPEN HEART SURGERY

ওপেন হার্ট সার্জারী হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের চিকিৎসা জগতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক বিস্ময়কর অপারেশন। এই অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানব দেহের বক্ষের ঠিক মাঝখানের বাম পাশের ছাকনীর হাড় কেটে বক্ষ চিরে ইহার সম্পূর্ণ হৃদযন্ত্রটি বের করে এনে ইহার প্রতিটি রক্ত চলাচলের পথ সচল করে, ইহাকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুইয়ে, আবার ইহাকে দেহের যথাস্থানে স্থাপন করে দিয়ে, উক্ত বক্ষের চিরা দুই অংশকে চেপে ধরে একত্র করে সেলাই করে দেয়াই হচ্ছে মূলত ওপেন হার্ট সার্জারীর অপারেশন।

অথবা এই ওপেন হার্ট সার্জারীর অপারেশনের সূচনা বর্তমান বিশ্বের সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের প্রায় দেড় হাজার বৎছর পূর্বে পবিত্র মক্কা নগরীতে সূত্রপাত হয়েছিল, খুব সম্ভব সেখান হতেই শুরু করে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ওপেন হার্ট সার্জারীর অপারেশন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা শুরু করেন। এরপর তারা যুগের পর যুগ এ ব্যাপারে নানা গবেষণা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঐক্যমত পোষণ করে। পরিশেষে তারা হৃদযন্ত্রের রোগীদের মাঝে ওপেন হার্ট সার্জারীর অপারেশন শুরু করেন এবং এতে তারা সফলকাম হন।

উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স যখন আনুমানিক ছয় বৎছর শুরু হয়েছিল, তখন তিনি বিবি হালিমার বাড়িতে লালিত পালিত হতেছিলেন এবং তখন বিবি হালিমারও এক ছেলে ছিলেন, সেও আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সমবয়সের ছিলেন।

কথিত আছে যে, ঐ সময় কোনো একদিন বিকালে মহানবী (সা) তাঁর দুধ ভাই হালিমার ছেলের সাথে বাড়ির একটু দূরে খেলতে গেলেন, সেখানে হঠাৎ করে কোথা হতে যেন ধব ধবে সাদা পোশাকধারী দুজন লোক এসে শিশু মহানবী (সা)-কে আঁকড়ে ধরে তাঁর বক্ষ চিরে ফেললো, এ দৃশ্য দেখে হালিমার ছেলে চীৎকার দিয়ে দৌড়িয়ে বাড়িতে এসে হালিমার নিকট উক্ত ঘটনা খুলে বললেন, সাথে সাথে হালিমা ও তাঁর স্বামী দৌড়িয়ে উক্ত শিশু মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গেলেন এবং গিয়ে দেখেন যে, শিশু মুহাম্মদ

(সা) সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন, তখন তারা উভয়ে শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, একটু পূর্বে তোমার কি হয়েছিল, উত্তরে শিশু মুহাম্মদ (সা) বলেন যে, হঠাৎ অপরিচিত ধবধবে সাদা পোশাকধারী দুজন লোক এসে আমাকে আঁকড়িয়ে ধরে আমার বক্ষ চিরে আমার হৃদযন্ত্র বের করে আনে এবং তারা উভয়ে উক্ত হৃদযন্ত্র হতে কি কি যেন বের করে ফেলে দিয়ে আবার উক্ত হৃদযন্ত্রটি দেহের মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে, বক্ষকে চেপে ধরে আগের মতো করে দিয়ে চলে গেল। এছাড়া আমি আর কিছু বলতে পারব না।

এছাড়াও মহানবী (সা)-এর উপর অহী নাযিল হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয়বার মহানবী (সা)-এর বক্ষ চিরে তাঁর হৃদযন্ত্র বের করে, ফেরেশতারা তার হৃদযন্ত্রের ওপেন হার্ট সার্জারীর অপারেশন করে তার হৃদযন্ত্রকে অহীর মতো ভারী শক্তি বহন করার জন্য উপযোগী করেন। যেমন পবিত্র কুরআন তার সত্যতার প্রমাণ দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

অর্থ : "যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ পাকের ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।" (সূরা হাশর : আয়াত-২১)

মানব দেহের হৃদযন্ত্র যে অসুস্থ বা কোনো কিছু করার ব্যাপারে অকেজো হয়ে যায় সে ব্যাপারে নিম্নে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করা হল : যেমন–

عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا فِى الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

অর্থ : নোমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত: তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বাণী প্রদান করেছেন। সাবধান! নিশ্চয়ই মানব দেহের মধ্যে এমন একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে যা সুস্থ থাকলে গোটা দেহই সুস্থ থাকে,

আর অসুস্থ বা দূষিত হয়ে পড়লে সমস্ত দেহটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাবধান! সেটাই হচ্ছে হৃদযন্ত্র বা অন্তকরণ।" (বুখারী হা/৫২ ও মুসলিম হা/৪১৭৮)

এছাড়াও মহানবী (সা)-এর মে'রাজ গমনের পূর্বে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতার মাধ্যমে তৃতীয়বার তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারীর অপারেশন করেন যাতে তাঁর পক্ষে প্রথম আকাশ হতে সপ্তম আকাশ আরশ-কুরসীসহ কোটি কোটি আলোকবর্ষ মাইল ভ্রমণ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। যেমন– পবিত্র কুরআন তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। যেমন–

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ- وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذِىْ- اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ـ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ـ

অর্থ : "আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা যা ছিল আপনার জন্যে দুঃসহ আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।" (সূরা-আল-ইনশিরাহ : আয়াত-১-৪)

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ওপেন হার্ট সার্জারির অপারেশন করে যে গর্ব করছেন, তার মূল সূত্রপাত হয়েছে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উক্ত বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাগুলো হতেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২২. কুলি

GARGLING

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আমাদের চার পাশের বায়ুমণ্ডলে ছড়ায়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস জীবাণুসহ আরও নানা অসংখ্য প্রকার রোগ জীবাণু এবং সেগুলো আমাদের মুখের নিঃশ্বাসে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে এবং সেখানে ধ্বংস হয়। আর যেগুলো সেখানে ধ্বংস হতে পারে না, সেগুলো আবার সেখান হতে বের হয়ে আসে। উক্ত রোগ জীবাণুগুলো আমাদের দেহে আসা যাওয়া করার সময় ইহাদের কিছু কিছু আমাদের দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশে প্রবেশ করে সেখানে সক্রিয় হয়ে উক্ত যন্ত্রাংশগুলোর ক্ষয়সাধন করতে থাকে। আবার কিছু কিছু সেখানে ধ্বংসও হয়ে যায় এবং যেগুলো ধ্বংস হতে পারে না সেগুলো আমাদের দেহের ক্ষয়সাধন করতে করতে পরিশেষে আমাদের দেহের উক্ত যন্ত্রাংশগুলো সম্পূর্ণরূপে অকেজো করে দেয় তখন আমাদের অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়।

এছাড়াও উক্ত রোগ জীবাণুগুলো আমাদের মুখের নিঃশ্বাসের সাথে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করার সময় ইহাদের কিছু কিছু আমাদের দেহের প্রশ্বাসের নির্গত আঠালো কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাথে মিশে আমাদের দেহের খাদ্যনালীর টিউবের ভেতরের চারপাশের দেওয়ালে বিষাক্ত আবরণ ফেলতে থাকে, যার ফলে আমাদের কণ্ঠনালীতে কফ-কাশির সৃষ্টি হয়, কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়, এভাবে দীর্ঘদিন চললে আমাদের কণ্ঠনালীতে নানা অসংখ্য জটিল জটিল রোগের সৃষ্টি হয়ে যায়। এছাড়াও এদের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রাংশে আরও নানা অসংখ্য প্রকার জটিল জটিল রোগের সৃষ্টি হয়ে অবশেষে আমাদের দেহের খাদ্যনালীতে ও দেহের ভেতরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সারও পর্যন্ত হয়ে যায়।

উক্ত আলোচ্য ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসসহ অন্যান্য রোগ জীবাণু দ্বারা আমাদের মধ্যে যাদের নানা জটিল রোগসমূহ হয়ে গেছে, তাদের জন্য চিকিৎসকগণ চিকিৎসার জন্য নানা ঔষধ পত্র দিয়েছেন, কিন্তু যাদের উক্ত রোগসমূহ এখনও হয়নি, তাদেরকে উক্ত রোগসমূহ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যারা নিয়মিতভাবে গোসল অথবা হাত মুখ ধৌত করার সময়, মুখের খাদ্যনালীতে সম্ভাব্য পরিমাণ আঙ্গুল দিয়ে

গড় গড় করে কুলি করবে এবং তাদের এই কুলিতে তাদের উক্ত খাদ্য নালীর টিউবের ভেতরের চারপাশের দেওয়ালের মধ্যে আঠার মতো লেগে থাকা সমস্ত ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসসহ যাবতীয় রোগ জীবাণুগুলো বের হয়ে আসবে এবং এতে খাদ্যনালীর উক্ত টিউবের ভেতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বেড়ে যাবে এবং তার খাদ্যনালীর মধ্যে কখনও কোনো মারাত্মক রোগ হবে না। এবং কণ্ঠস্বর সতেজ ও স্বক্রিয় থাকবে। এছাড়া গড় গড় করে কুলি করলে, ফুসফুস হৃদযন্ত্র ছাড়াও দেহের আরও অন্যান্য যন্ত্রের মধ্য হতে জমাকৃত ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসসহ আরও নানা বিষাক্ত রোগজীবাণু গড় গড় করা কুলির সাথে বের হয়ে আসে। ফলে ফুসফুস হৃদযন্ত্রসহ দেহের অন্যান্য যন্ত্রাংশগুলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়, যার ফলে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশগুলো সতেজ ও স্বক্রিয় হয়, অর্থাৎ গড় গড় করে কুলি করলে দেহের আভ্যন্তরীণ সকল যন্ত্রাংশগুলো পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে, যার ফলে শ্বাসকার্য ভালো ভাবে চলে এবং এতে ফুসফুসের কার্যক্রম সুন্দর হয় এবং এর ফলে রক্ত দূষিত হয় না, আর রক্ত দূষিত না হওয়ার কারণেই দেহের অন্যান্য যন্ত্রাংশগুলো সহজে নষ্ট হয় না। ফলে দেহ দীর্ঘদিন সুস্থ থাকে। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য গড় গড় করে কুলির বিকল্প আর কিছু দেখা যায় না।

এছাড়াও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আরো বলেন যে, রোযা ব্যতীত গোসলে ও ওযুতে, গড়গড় করে কুলি করলে কখনো তার মুখে কোনো সমস্যা হবে না। অর্থাৎ- তার গলায় কখনো টনসিল সমস্যা হবে না, জিহ্বা সতেজ থাকবে, দাঁতে কোনো সমস্যা হবে না খাদ্যে রুচি থাকবে, মুখের ভেতর কখনো কোনো ঘা হবে না ইত্যাদি।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক গোসলে (রোযা ব্যতীত) প্রত্যেক মানুষকে গড় গড় করে কুলি করা ফরয বা অত্যাবশ্যক করে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এছাড়াও তিনি রোযা ব্যতীত প্রত্যেক অজুতে গড় গড় করে কুলি করাকে সুন্নাত বা তাঁর আদর্শ বলে গণ্য করে এবং তা পালন করার জন্য তাঁর সকল উম্মতকে আদেশ করে গেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে তাঁর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثًا۔

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি মহানবী (সা)-কে অজুর সময় এক হাতের আঙ্গুল মুখে দিয়ে গড় গড় করে কুলি করতে দেখেছি, এভাবে তিনি তিনবার মুখে পানি দিয়ে মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতেন। (তিরমিযী হা/২৮ ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা, কিতাবুত-তাহারাত)

عَنْ اِبْنِ اَبِيْ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَوْكَفَ ثَلٰثًا الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ عِنْدَ الْغُسْلِ۔

অর্থ : ইবনে আবি আউস (রা) তাঁর দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, আমি রাসূল (সা)-কে তাঁর গোসলের সময় দেখেছি যে, তিনি অবশ্যই মুখে হাত দিয়ে তিনবার গড় গড় করে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিয়ে সে পানি নিঃশ্বাসে টেনে মস্তিষ্কে উঠায়ে আবার জোরে ছেড়ে দিতেন। (নাসায়ী হা/৮৩ ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهٗ دَسَمًا.

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় মহানবী (সা) একদা দুধ পান করেন। তারপর তিনি পানি আনতে বলেন, তারপর তিনি সেই পানি দ্বারা গড় গড় করে কুলি করলেন এবং তিনি বললেন দুধে চর্বি রয়েছে।

(তিরমিযী - হা/৮৯ ১ম খণ্ড ১৩/১৪ পৃষ্ঠা, কিতাবুত তাহারাত)

দুধ পান করার পর মহানবী (সা) গড় গড় করে কুলি তিনি এজন্যই করেছেন যে, দুধের ঘনত্বের কারণে চর্বি যেন গলার টিউবের ভিতরের চার পাশে লেগে থাকতে না পারে।

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, যারা রোযা ব্যতীত নিয়মিতভাবে গোসল কিংবা অজুর সময় গড় গড় করে কুলি করবে, তাদের গলার খাদ্য নালীর টিউবের ভেতরের চারপাশে কখনও কোনো প্রকার রোগজীবাণু শক্তভাবে অবস্থান করতে পারবে না এবং তাদের খাদ্যনালী কখনও কোনো প্রকার

সংকোচন বা অস্বাভাবিক হবে না। অর্থাৎ গড় গড় করে কুলির দ্বারা খাদ্যনালী ও হৃদযন্ত্রের যাবতীয় রোগ জীবাণুর দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থগুলো বের হয়ে আসে এবং এর দ্বারা খাদ্যনালী ও হৃদযন্ত্র যাবতীয় রোগজীবাণু হতে মুক্ত, সতেজ ও কর্মক্ষম থাকে। তাই প্রত্যেক মানুষের দেহের সুস্থতার জন্য গড় গড় করে কুলি করা আবশ্যক। যা মহানবী মুহাম্মদ (সা) বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই বিশ্ববাসীদেরকে বলে গেছেন।

২৩. খৎনা

KHATNA

বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে গবেষণা করে দেখেছেন যে, ছেলেদেরকে খৎনা করালে উক্ত খৎনাকৃত ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনে 'এইডস' রোগ হওয়ার আশংকা ৫০% কমে যায়। পৃথিবীতে শুধু দু'টি জাতি তাদের ছেলেদেরকে খৎনা করায় ১. মুসলমান জাতি ২. ইহুদী জাতি। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল মানব গোষ্ঠীর ছেলে মহলে জরিপ করে দেখতে পেয়েছেন যে, পৃথিবীর যে জাতির লোকেরা তাদের ছেলেদেরকে খৎনা করায়, তাদের ছেলে মহলে 'এইড্স' রোগের সংখ্যা ৫%ও দেখা যায় না, কিন্তু পৃথিবীর যে সকল জাতির লোকেরা তাদের ছেলেদেরকে খৎনা করায় না, তাদের ছেলে মহলে 'এইড্স' রোগের সংখ্যা ১০ শতাংশেরও বেশি দেখা যায়। এতে প্রমাণ করে যে, খৎনা করালে ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবনে 'এইডস' রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৫০% কমে যায়। এবং এই গবেষণা কাজ বিজ্ঞানীরা উগান্ডায় পরিচালনা করে সফল হয়েছেন তাই তারা বর্তমানে উগান্ডাকে 'এইড্স' প্রতিরোধের জন্য সারা বিশ্বের জন্য মডেল হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, কারণ তারা উগান্ডাতে ছেলেদের মধ্যে খাতনা করার বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করে দেশটিতে এইড্স আক্রান্তের সংখ্যা ১৫% হতে কমে পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মার্কিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের গত বৎছর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, উগান্ডা ও কেনিয়ায় খৎনা করা বহুগামী পুরুষদের মধ্যে 'এইড্স' আক্রান্তের সংখ্যা কমপক্ষে

৫০% কমে গেছে অর্থাৎ প্রতীয়মান হয় যে, খৎনা করা ছেলেরা যদিও কোনো কারণে বহুগামী একাধিক নষ্টা মেয়েদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত থাকে তবুও তাদের 'এইড্স' রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৫০% কম থাকে এবং তারা যদি পুংমৈথুনেও লিপ্ত থাকে তবুও তাদের 'এইড্স' রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৫০% কম থাকে কিন্তু খৎনা ছাড়া ছেলেরা যদি বহুগামী একাধিক নষ্ট-মেয়েদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত থাকে তবে তাদের 'এইড্স' রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৯৯%-এর চেয়েও বেশি থাকে এবং তারা যদি কোনো কারণে কখনও পুংমৈথুনে লিপ্ত থাকে তবে তাদেরও এইড্স রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৯৯%-এরও বেশি থাকে। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, 'এইড্স' রোগের আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকার জন্য খৎনার বিকল্প আর কিছু দেখা যায় না। (প্রথম আলো ৫.১০.২০০৭ ইং)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) বর্তমান যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের প্রায় দেড় হাজার বৎছর পূর্বে পৃথিবীর ছেলেদের এইডস রোগ হতে বাঁচার জন্য খৎনা করানোর প্রথা চালু করেছিলেন। এবং তিনি এ প্রসংগে বলেছেন যে, ছেলেদেরকে খৎনা করানো আমার এক বিশেষ আদর্শ, এই আদর্শটি হচ্ছে আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ)-এর এবং এর মধ্যে ছেলেদের জীবনে অনেক বরকত রয়েছে যা তোমরা জান না। এই পৃথিবীতে একমাত্র ইব্রাহীম (আ)-ই ছেলেদের কল্যাণের জন্য খৎনা করানোর প্রথা চালু করেছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) ও জাতির জনক ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত আদর্শটি অতি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে তার উম্মতের সকল ছেলেদের খৎনা করানোর জন্য জোর নির্দেশ দিয়ে তাঁর একটি বিশেষ আদর্শ বা সুন্নাত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে গেছেন।

যেমন, উক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْاِخْتِتَانُ ـ وَالْاِسْتِحْدَادُ ـ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ ـ وَنَتْفُ الْاِبِطِ ـ (نسائى شريف جلد اول، كتاب الطهارة صفه نمبر)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন, ফিৎরাতে ইব্রাহীম অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ)-এর আদর্শ হচ্ছে পাঁচটি। ১. খৎনা, ২. মেয়েদের কান, নাক ছিদ্র করা, ৩. গোঁফ কাটা, ৪. হাত-পায়ের আঙ্গুলের নখ কাটা ৫. বগল তলের পশম তুলে ফেলা।

(নাসায়ী, হা/৯ ১ম খণ্ড, কিতাবুত তাহারাত, পৃষ্ঠা নং ৭)

এছাড়াও দ্যা আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিকসের সাম্প্রতিক রিপোর্ট মতে, খৎনা করালে শিশু ছেলেদের মূত্রপথের সংক্রমণ রোগ প্রতিহত হয়। অধিকাংশ ছোট ছেলেদের মূত্রপথের সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত হয়। এর ফলে প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া, জ্বর, খাবারে অনীহা এবং স্বাস্থ্য ভালো না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা লেগেই থাকে। খৎনা করালে এসব সমস্যা দূর হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরাও খৎনা করালে অবশ্যই কিছু সুফল পান যেমন খৎনা পুরুষদের লিঙ্গের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। খৎনা যৌনবাহিত রোগের ঝুঁকি কমায়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পুরুষের খৎসা এইচআইভি প্রতিরোধে একটি কার্যকর ব্যবস্থা। তবে এটা আংশিক সুরক্ষা দেয়। বহুগামিতার ফলে এইচআইভির বিস্তার প্রতিরোধ করতে পারে না।

লিঙ্গের মাথায় প্রদাহ হলে লিঙ্গাগ্রের ত্বকে চুলকানি ও জ্বালা পোড়া করলে, খৎনা করালে তা সেরে যায়।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, খৎনা হচ্ছে সবল পুরুষত্বের প্রতীক, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা যেকোনো পুরুষের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য বিশেষ করে এইচআইভি নিয়ন্ত্রণের জন্য খৎনা করানোর নির্দেশ দেন। লিঙ্গমুণ্ডুতে প্রদাহ এবং লিঙ্গের ক্যান্সারের চিকিৎসায়ও খৎনা করানো হয়। থাইমোসিসের চিকিৎসায় অহরহ খৎনা করানো হচ্ছে।

(নয়া দিগন্ত তাং ৬.১.২০০৮ ইং)

খৎনার উপকারিতা

আমেরিকার চিকিৎসা বিষয়ক ম্যাগাজিনের মার্চ ১৯৯০ ইং সংখ্যায় খৎনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধ হতে জানা যায়, আমেরিকায় ৬১% হতে ৮৫% শিশুর খৎনা করানো হয় জন্মের পরেই। আমেরিকায় ইহুদীর সংখ্যা কম, মুসলমানের সংখ্যাও কম। খ্রিস্টানরাই খৎনার সুন্নাত পালন করছে।

এর কারণ কী? খ্রিষ্টানরা সাধারণত খৎনা করায় না। ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা তো খৎনার বিপক্ষে। আমেরিকার শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রতিটি শিশুর খৎনা করানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য। রাসূল (সা)-এর নির্দেশিত একটি স্বাভাবিক সুন্নাত আমেরিকায় ব্যাপকভাবে পালন করা হচ্ছে। খৎনা সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। শুধু আমেরিকা নয় বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসে খৎনা

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) ৮০ বছর বয়সে কুঠারের সাহায্যে খৎনা সম্পূর্ণ করেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইব্রাহীম (আ) সর্বপ্রথম খৎনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাসূল (সা)-এর উম্মতদের মধ্যে এ নিয়ম পালন করা হয়েছে। এমনকি ইসা (আ)-এরও খৎনা করানো হয়েছিল। খ্রিস্টানরা এ কথা অবিশ্বাস করে না। যেমন অবিশ্বাস করে না যে শুকর খাওয়া হালাল নয় বরং হারাম।

ইহুদীরা বিশেষভাবে খৎনার সুন্নাত পালন করে। তাকবিনে উল্লেখ রয়েছে, মনে রেখো আমার এবং তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এ চুক্তি হয়েছে, প্রতিটি বালকের খৎনা করানো হবে।

খ্রিস্টান ধর্মে প্রথমদিকে খৎনার প্রচলন ছিল কিন্তু খ্রিস্টানরা তাদের পয়গম্বরের শিক্ষা বিকৃত করেছে এবং সেই শিক্ষা হতে দূরে সরে গেছে। বার্নাবাস রচিত বাইবেলে খৎনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যীশু জবাব দিলেন, আমি সত্য বলছি, খৎনা না করানো লোকের চেয়ে কুকুর অনেক উত্তম।

খৎনা সম্পর্কে আমেরিকার শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের অভিমত ওয়াশিংটনের সামরিক হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের প্রধান প্রফেসর ভাইস ওয়েল আমেরিকান ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ম্যাগাজিনের মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় লিখেছেন, ১৯৭৫ সালেও আমি ছিলাম খৎনার ঘোর বিরোধী। খৎনার সংখ্যা কমানোর যেসব কার্যক্রম চলছিল আমি সেসব কাজে অংশীদার ছিলাম। কিন্তু ১৯৮০ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে যে, যেসব শিশুর খৎনা করানো হয়নি তাদের প্রস্রাবের নালির মধ্যে রোগের পরিমাণ

অধিক পাওয়া যায়। তবুও আমি খৎনাকে জীবনের অপরিহার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করিনি। বরং আমি বলেছি প্রয়োজনের সময় খৎনা করানো যেতে পারে। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে যখন আরো বেশি গবেষণা করা হলো এবং সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করা হলো, তখন যে ফলাফল পাওয়া গেল, সেটা ছিল আমার ধারণার বিপরীত। অবশেষে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি যে, খৎনাকে জীবনের অপরিহার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

শুধু তাই নয় বরং আমেরিকার শিশু চিকিৎসা বিষয়ক একাডেমী ১৯৮৯ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সে রিপোর্ট ছিল ১৯৭০ সালে প্রকাশিত রিপোর্টের বিপরীত, ফলে খৎনার যারা বিরোধিতা করেছিল তারা মতামত পরিবর্তন করলো এবং শিশুদের খৎনার উপকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলো। বর্তমান যুগের চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার পর রীতিমত জোয়ার এসেছে বলা যায়। মানুষ নিজেদের মতামত পরিবর্তন করেছে, নীতির পরিবর্তন হয়েছে। যারা খৎনার যতো বিরোধী ছিল তারা ততো বেশি সমর্থনে পরিণত হয়েছে। এতে আরো একবার প্রমাণিত হয়েছে যে, সময়ের পরিবর্তন হলেও মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কুরআনে বলা হয়েছে, ফিতরা তাল্লাহি ফাতারান্নাছা আলাইহা। অর্থাৎ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা স্বভাব আঁকড়ে ধরো যে স্বভাবের ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রফেসর ভাইস ওয়েল ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ তার চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে সময় ক্যালিফোর্নিয়ার মেডিকেল অর্গানাইজেশনের সকল সদস্য সম্মিলিতভাবে বলেছেন যে, শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খৎনা অপরিহার্য। ক্যালিফোর্নিয়ার মেডিকেল অর্গানাইজেশনের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রফেসর ভাইস ওয়েল বলেন, তারপর হতে আমি খৎনার দীর্ঘ বিরোধিতা হতে সরে এসেছি, আমি ক্যালিফোর্নিয়ার মেডিকেল অর্গানাইজেশনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খৎনা এবং যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা

১৯৯০ সালে নিউ ইংল্যান্ডে জার্নাল অব মেডিসিনে ডাক্তার শিউন লিখেছেন, শিশুদের খৎনা তাদের সারা জীবনের জন্য যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এর ফলে

শৈশবে যৌনাঙ্গের মাথার দিকের বর্ধিত অংশের নিচে রোগ-জীবাণু জমা হতে পারে না।

ডাক্তার শিউন বিশ্বের খ্যাতনামা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। যৌনাঙ্গের ক্যান্সার রোধে যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনে বলেন, যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতা একটা কঠিন বিষয়। বিশ্বের পশ্চাৎপদ অনুন্নত দেশেসমূহেই শুধু এ সমস্যা প্রকট নয় বরং আমেরিকা এবং অন্যান্য উন্নত দেশেও এ সমস্যা প্রকট। যেসব সমাধান দেয়া হচ্ছে সেসব বিশেষভাবে ফলদায়ক নয়। ব্রিটেনের যেসব স্কুলে শিশুদের খৎনা করানো হয়নি সেসব স্কুলে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, তাদের শতকরা ৭০ ভাগের যৌনাঙ্গের অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে। ডেনমার্কে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জনের পুরুষঙ্গের উপরিভাগ অপরিচ্ছন্নতার কারণে কুঁচকে গেছে। উপরোক্ত বক্তব্য দিয়েছেন খৎনা সম্পর্কে গবেষণাকারী বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এ রোগের চিকিৎসার কথা আগেই উল্লেখ করেছে। রাসূল (সা) এ সম্পর্কে আমাদেরকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা রূম : আয়াত-৩০)

খৎনা এবং পেশাবের নালির সংক্রমণ

১৯৮৯ সালের জরিপের পর জানা গেছে যে, খৎনা করা শিশুদের তুলনায় যাদের খৎনা করা হয়নি তাদের পেশাবের নালির সংক্রমণের সম্ভাবনা শতকরা ৩৯ ভাগ বেশি। চার কোটি শিশুর উপর জরিপ চালিয়ে দেখা দেছে যে, প্রফেসর ভাইস ওয়েলের বিবরণ অনুযায়ী খৎনা না করা শিশুদের পেশাবের নালির সংক্রমণ অধিক পাওয়া গেছে। স্কলারদের একটি টিমের গবেষণায় দেখা গেছে, যদি আমেরিকায় খৎনা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন না হতো তবে আরো বিশ হাজার লোক হৃদরোগের রোগী হওয়ার সম্ভাবনার সম্মুখীন হতো। ব্রিটেনের সানমেট নামের ম্যাগাজিনে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, যদি শিশুদের খৎনা করা হয় তবে পেশাবের নালির সংক্রমণ শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।

খৎনা এবং যৌনাঙ্গের ক্যান্সার

ব্রিটেনের চিকিৎসাবিষয়ক ম্যাগাজিনে বিএমজিতে ১৯৭৭ সালে যৌনাঙ্গের ক্যান্সার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ইহুদীদের মধ্যে যৌনাঙ্গের ক্যান্সার খুব কমই দেখা যায়। মুসলিম দেশসমূহেও যৌনাঙ্গের ক্যান্সার খুব কম। কারণ এসব দেশের শিশুদের শৈশবেই খৎনা করা হয়। যৌনাঙ্গের ক্যান্সার বিশ্বের বহু দেশে উদ্যেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষত চীন এবং পুর্টোরিকোতে ১২ হতে ২২ শতাংশ পুরুষ যৌনাঙ্গের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ক্যান্সার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে যে, যৌনাঙ্গের ক্যান্সার যৌনমিলনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রতিবেদনে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অবৈধ যৌন সংগমের কারণেই যৌনাঙ্গের ক্যান্সার দেখা দেয়।

আমেরিকার শিশুরোগ বিষয়ক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, খৎনা না করা ব্যক্তি যে কোনো সময়েই যৌনাঙ্গের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। নবজাত শিশুর খৎনা করানোর মাধ্যমে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রোধ করা যায়।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ যে আশংকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, ইসলাম শুরু হতেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয়?

খৎনা এবং যৌন রোগ

ম্যাগাজিন নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল ফর মেডিসিনে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের যৌনাঙ্গের সংক্রমণ এবং যৌন রোগ হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে খৎনা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অস্ট্রেলিয়ার এক সাম্প্রতিক জরিপে জানা যায়, খৎনা না করা লোকদের চার রকমের যৌন রোগ হতে দেখা যায়। ১. জেন্টাল হারপেস ২. ক্যান্ডিডিয়াসিন ৩. গনোরিয়া ৪. সিফিলিস।

খৎনা ও এইড্স রোগ

আমেরিকার বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিনে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে খৎনা এবং এইড্স সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে, খৎনা এইড্স হতে রক্ষা করে। আমেরিকা এবং আফ্রিকায় তিনটি জরিপের ফলাফল এ প্রবন্ধে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা খৎনা করে না তারাই এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, যারা মহান আল্লাহর বিধানের সরাসরি বিরোধিতা করে পাপের পঙ্কিলতায় নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছে তারাই এইড্স হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইসলামের বিধান খৎনা ব্যবহার করে চলেছে। খৎনার মধ্যে তারা তাদের রোগ নিরাময়ের আশ্রয় খুঁজছে। তবে এরকম ধারণা করা যাবে না যে, খৎনা করা হলেই এইড্স এর গজব হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, খৎনা যারা করে না তাদের তুলনায় যারা খৎনা করে তাদের এইড্স হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম। খৎনা করা না করা উভয় শ্রেণীর লোকই এইড্সে আক্রান্ত হয়ে থাকে। আধুনিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রচারিত শরীয়তে মানুষের পরলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি ইহলৌকিক কল্যাণেরও নিশ্চয়তা দেয়। স্বভাব ধর্ম হতে দূরে চলে যাওয়ার জন্য যারাই চেষ্টা করেছে তারাই ব্যর্থ হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

(উইকলি মেডিকেল সার্ভে আমেরিকা)

২৪. গুন্না
THE HUMMING SOUND

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নিরিবিলি অবস্থায় গুন গুন করলে অথবা গুন গুন করে আস্তে আস্তে কথা বললে বা গান করলে মস্তিষ্কের ও হৃদযন্ত্রের বিষাক্ত দূষিত পদার্থগুলো সেখান হতে বাষ্প হয়ে বের হয়ে আসে। তখন মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্র নানা অসুবিধাদায়ক জটিলা হতে সতেজ ও আরামদায়ক হয়। এছাড়াও তারা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, নিয়মিতভাবে নিরিবিলি অবস্থায় যদি কেউ গুন গুন করে তবে তার কখনও মস্তিষ্কে ও হৃদযন্ত্রে কোনো রোগ হবে না। অর্থাৎ তার কখনও মাথা ব্যথা ও বুকে ব্যথা ও অস্থিরতাজনিত কোনো রোগ হবে না। এবং মাথা ধরা ও বুকে চাপ চাপ ভাব ও রক্তের চাপজনিত কোনো রোগ তার কখনও হবে না।

এছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, পবিত্র কুরআন পাঠ করার সময় যে নূ'নে গুন্না ও মি'মে গুন্না করে পাঠ করতে হয়, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, নূ'নে গুন্না দ্বারা মস্তিষ্কের জন্য উপকার হয়। অর্থাৎ নূনে গুন্না দ্বারা মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ জীবাণু বাষ্প হয়ে নাকের ছিদ্র পথ দিয়ে বের হয়ে আসে এবং মী'মে গুন্না দ্বারা হৃদযন্ত্রের যাবতীয় রোগ জীবাণু বাষ্প হয়ে মুখের খাদ্য নালী দিয়ে বের হয়ে আসে। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, নূ'নে গুন্না দ্বারা নাকের ছিদ্র পথ কখনও সংকুচিত হতে পারে না। অর্থাৎ-নাকের ছিদ্র পথকে প্রসারিত বা স্বাভাবিক রাখার জন্য নূনে গুন্না অপরিহার্য এবং মীমে গুন্না দ্বারা ও নুনে গুন্না দ্বারা হৃদযন্ত্র ও খাদ্য নালী কখনও সংকুচিত বা অস্বাভাবিক হতে পারে না। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ও খাদ্যনালীকে নানা সংকোচন হতে নিরাপদ রাখার ইচ্ছা পোষণ করলে, অবশ্যই নূনে গুন্না ও মীমে গুন্নার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাভাবিক ও সতেজ রাখার জন্য অবশ্যই তাকে কুরআন পাঠ করার সময় সর্বদাই নূনে গুন্না ও মীমে গুন্না করে পাঠ করতে হবে। নচেৎ তারা কখনও উক্ত রোগের সমস্যা হতে রক্ষা পাবে না।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপর্বেই উক্ত পবিত্র কুরআন পাঠ করার সময় নূনে গুন্না ও মীমে গুন্নাকে ওয়াজিব বা অতি জরুরি বলে ঘোষণা করে গেছেন। এবং তিনি বলেছেন, যদি কেউ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার সময় নূনে গুন্না ও মীমে গুন্না আদায় না করে

পাঠ করে, তবে সে গুনাগার হবে। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে, পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে সহীহ্ শুদ্ধ করে পাঠ করার মধ্যে মানব দেহের সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা রয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস–

حَدَّثَنَا سَعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ "اَلْقُرْاٰنُ" (ابن ماجه جلد الثانى صفه ٢٥٠ ابواب الطب)

অর্থ : আলী (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন সর্বরোগের উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে 'আল কুরআন' অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করার সময় সহীহ্ শুদ্ধ করে নূনে গুন্না, মীমে গুন্না ও ইহার প্রতি হরফের ঠিক ঠিক মাখরাজ আদায় করে পাঠ করবে তার জীবনে কখনও কোনো রোগ হবে না। (ইবনে মাজাহ হা/৩৫০১, ২য় খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠা আবওয়াবুত তিব্ব।)

অতএব লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নিরিবিলি অবস্থায় গুন গুন করে সুর করলে এতে এর প্রভাব মস্তিষ্কে ও হৃদযন্ত্রে পড়ে এবং এর দ্বারা হৃদযন্ত্রে ও মস্তিষ্কের যাবতীয় সমস্যা ও বিষ ব্যথা দূরীকরণে সাহায্য করে। তাই যাদের মস্তিষ্কে ও হৃদযন্ত্রে সমস্যা আছে তাদের অবশ্যই উচিত নিরিবিলিতে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কিছুক্ষণ গুন গুন করে সুর করা। অথবা পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে নূনে গুন্না ও মীমে গুন্নাগুলো ঠিক ঠিক মতো আদায় করা। এছাড়া নূনে গুন্নাহ ও মীমে গুন্না দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কার্যে বিশেষ উপকার সাধন করেন।

২৫. গোঁফ

WHISKERS

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, গোঁফকে লম্বা করে রাখলে, নাকের নিঃশ্বাসের সাথে দেহের আভ্যন্তরীণ হতে বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও দেহের আরও নানা রোগজীবাণু বের হয়ে আসে। এগুলো উক্ত লম্বা গোঁফে লেগে থাকে। এছাড়াও দেহ হতে নির্গত দূষিত পদার্থ উক্ত লম্বা গোঁফের গোড়া দিয়ে বের হয়ে উক্ত লম্বা গোঁফের সর্বত্র অবস্থান করতে থাকে। এই লম্বা বিষাক্ত বা দূষিত গোঁফ যখন কোনো গ্লাসে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করার সময় যে কোনোভাবে উক্ত দূষিত গোঁফ উক্ত পানীয় দ্রব্যের মধ্যে লেগে উক্ত গোঁফ ভিজে যায়, তখন উক্ত গ্লাসের পানীয় দ্রব্য দূষিত হয়ে যায় এবং তখন তা পান করলে, দূষিত জীবাণুগুলো দেহের ভেতর চলে যায় এবং সতেজ হয়ে দেহে আবার নতুন করে যে যে রোগের পরিবেশ অনুসারে সেই সেই রোগের সৃষ্টি করে। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, গোঁফের দূষিত পদার্থ বা রোগজীবাণু হতে বাঁচা বা রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে গোঁফ না রাখা, অর্থাৎ গোঁফ কেটে ফেলে রাখার আর কোনো বিকল্প নেই।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই গোঁফ রাখাকে তাঁর প্রত্যেক উম্মতের জন্য হারাম করে গেছেন। যেমন– এ সম্পর্কে তাঁর একটি হাদীস :

عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ : যায়িদ ইবনে আরকামা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, কেউ যেন গোঁফ না রাখে। যদি কেউ গোঁফ রাখে সে অবশ্যই আমাদের দলভুক্ত নয়। (নাসায়ী, হা/১৩ ১ম খণ্ড ৭ম পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত।)

২৬. ঘুম
SLEEP

একথা অতি বাস্তব যে, ঘুমায় না এমন প্রাণী পৃথিবীতে বিরল, প্রাণীর জন্য যেমন আহারের প্রয়োজন, তেমনি দরকার নিদ্রারও, না ঘুমিয়ে কারো পক্ষে বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীদের মতে, একজন বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন সাত হতে আট ঘণ্টা করে ঘুমানো দরকার। শিশুদের প্রয়োজন আরও বেশি। পনেরো বছর বয়স্ক প্রতিটি ছেলে/মেয়েকে কমপক্ষে দশ ঘণ্টা করে ঘুমানো উচিত। এখন প্রশ্ন এই ঘুম বলতে আসলে কি বুঝায়? প্রাণীরা কেন ঘুমায় আসলে এটা একটি রহস্যময় ব্যাপার।

বিজ্ঞানীদের ধারণা মানুষসহ অন্য প্রাণীদের দেহের রক্তে যে ক্যালসিয়াম আয়রণ নামে রাসায়নিক চূন জাতীয় পদার্থ আছে এই বস্তুটিই মাথার ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করে, যখন মস্তিষ্কের কোষে প্রয়োজন মতো ক্যালসিয়াম আয়রণ প্রবেশ করে তখনি আমাদের শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে আসে এবং আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। (দৈনিক ইত্তেফাক ৫-৩-৯৮ ইং)

আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী বলেছেন যে, বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন ঠিক তেমনি বেঁচে থাকার সমান আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অত্যাবশ্যক, আর তা হলো 'ঘুম' এবং 'ঘুম'। ঘুম কম হলে ক্ষুধা কমে যায়, শরীরে ক্লান্তির ছাপ পড়ে গ্যাসট্রিক আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হরমোন ঠিকমত ক্ষরণ হয় না, ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় ইত্যাদি। কিন্তু আপনি জানেন কি? ঘুম কম হলে আপনি অকালে বৃদ্ধ হয়ে যেতে পারেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে ঘুমায় এমন কয়েকজন যুবককে তারা চার ঘণ্টা কমায়ে অর্থাৎ নিয়মিত চার ঘণ্টা করে ঘুমাতে দেন। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে দেখা গেল যে, তাদের দেহ স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থি হতে হরমোনের নিঃসরণ ঠিকমত হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা ঐসব যুবকের দেহে বুড়ো হয়ে যাবার এবং ডায়াবেটিসের লক্ষণ আবিষ্কার করেন। এ অবস্থায় আবার যখন তারা পূর্বের ন্যায় ৮ ঘণ্টা করে ঘুমাতে শুরু করেন তখন

তাদের দেহ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। এই গবেষণা হতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পর্যাপ্ত ঘুম না হলে, অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে যেতে পারে। আর পর্যাপ্ত ঘুম বলতে তারা দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ঘুমকেই বুঝিয়েছেন। তাই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল মানুষকে বলেন যে, আসুন আমরা সবাই নিয়মিত পরিমাণ মতো ঘুমের অভ্যাস করি।

ঘুম নিয়ে বিজ্ঞানীরা এতদিন অনেক গবেষণা করেছেন। এসব গবেষণায় ঘুমের ধরণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঠিক কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক গবেষণার ফলাফলেই দেখা গেছে, ঘুমের স্থায়িত্ব, ঘুমাতে যাওয়ার অভ্যাস এবং ঘুমের প্রকৃতি মানুষের দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা বিকাশে অসীম ভূমিকা পালন করে। এই কিছু দিন আগে জার্মানির লুইবেক ইউনির্ভার্সিটির কয়েজন গবেষক জানান, নিয়মিত এবং নির্ঝঞ্ঝাট ঘুমে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তার মস্তিষ্ক জটিল সব সমস্যার চমৎকার সমাধান দেয়। লুইবেক ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ঘুমের ধরণ মানুষের বুদ্ধি বিকাশে ঠিক কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করে তা জানার জন্য ১০৬ জন শিক্ষার্থীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষকরা ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষার আয়োজন করেন। এ পরীক্ষায় তাদের কিছু জটিল ধাঁধার সমাধান খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তখন তারা দেখতে পান যে, রাতে যার যত বেশি ভালো ঘুম হয়েছে সে তত বেশি এবং দ্রুত ধাঁধার উত্তর খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা সারারাত ঘুমায়নি তাদের ধাঁধার সমাধান খুঁজে বের করার সম্ভাবনা যাদের ভালো ঘুম হয়েছে তাদের তুলনায় বহুলাংশে কম। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন তার মস্তিষ্কের কোষগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে। মস্তিষ্ক এ সময় আগের দিনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোকে পুনরায় স্মরণ করার চেষ্টা চালায়। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সকল মানুষেরই ঘুমানো উচিত। (যুগান্তর ১২-২-০৪ ইং)

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই পবিত্র কুরআন ও তার হাদীসের আলোকে এই পৃথিবীর সকল মানুষকে ঘুমের নির্দেশ ও ঘুমের সময় নির্ধারণ ও ঘুমের সুফল ব্যাখ্যা করে গেছেন। যেমন :

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔

অর্থ : তোমাদের ঘুমকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী আর রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়। (সূরা নাবা : আয়াত-৯-১১)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই প্রত্যেক মানুষকে দৈনিক ৮ ঘণ্টার সমপরিমাণ ঘুমের ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রসংগে দু'টি হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِي بُرْزَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ كَانَ يَكْرُهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا ـ (جامع البخارى جلد اول صفه كتاب الصلوة)

অর্থ : আবু বার্জা (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) এশার নামায পড়ার পূর্বে ঘুমাতে এবং এরপর গল্প গুজব করতে অপছন্দ করতেন।

(বুখারী হা/৫৬৮, ১ম খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা কিতাবুস সালাত।)

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةُ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, ফজরের এক রাকাআত নামাযের মূল্য (আল্লাহ পাকের নিকট) দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও বেশি। (মুসলিম হা/১৭২১)

উপরোক্ত দু'টি নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সেখানে ৮ ঘণ্টা সময় রয়েছে। তাই মহানবী (সা) তার জাতিকে ৮ ঘণ্টা ঘুমে এবং ফজরের সময় জেগে উঠার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষ যদি এশার নামাযের পর হতে ফজরের নামাযের সময় পর্যন্ত ঘুমায়। তবে সে ঘুম হবে উক্ত মানুষের স্বাভাবিক ঘুম এবং এই ঘুমে মানব দেহের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষা হবে এবং মানবদেহ সতেজ ও আরামদায়ক হবে। সে ব্যবস্থা মহানবী (সা) বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই দিয়ে গেছেন।

এছাড়াও মহানবী (সা) ঘুমের উপকারিতা সম্পর্কে আরও একটি হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ عُبْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُبَيِّ بْنَ اُمِّ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ ﷺ اَلْقِبْلَتَيْنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا

وَالسُّنُوْتِ فَاِنَّ فِيْهَا شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ ۔ (ابن ماجه جلد الثانى صفه ابواب الطب)

অর্থ : ইব্রাহীম বিন আবি উবলা (রা) বলেন যে, আমি আবু উবাইয়্যা বিন উম্মে হারাম (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি একবার মহানবী (সা)-এর সাথে দুই কিবলার মসজিদে নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি বলেন যে, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, ঘুমের মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সমস্ত রোগের চিকিৎসা রয়েছে।

(ইবনে মাজা হা/৩৪৫৭, ২য় খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা চিকিৎসা অধ্যায়।)

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা ঘুমের মাধ্যমে এই পৃথিবীর মানুষদেরকে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখায়েছেন, তা মহানবী (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই দেখায়ে দিয়ে হাদীস বলে গেছেন।

২৭. চুম্বন

KISS

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যৌন কর্মের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে 'চুম্বন'। যখন কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের মুখে অথবা ঠোঁটে চুম্বন দিবে, তখন তাদের দেহের যৌন ক্রিয়ার বস্তুগুলো তাদের দেহের গোপন স্থানে গিয়ে জমা হয়। ফলে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন কোনো লোক তার স্ত্রীর নিকট গমন করতে ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন যেন তার পূর্বে অবশ্যই তার স্ত্রীর মুখে ও ঠোঁটে চুম্বন করেন। এতে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে। এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা গাঢ় হবে, ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে এক সুন্দর মধুময় পরিবেশ স্থাপিত হবে এবং যা আল্লাহ্ পাকের নিকট অতি পছন্দনীয়।

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরো বলেন যে, যখন কোনো মানুষ তার স্ত্রীর নিকট গমন করার পূর্বে যদি সে তাকে চুম্বন না করে, তবে তার স্ত্রীর দেহে যৌন ক্রিয়াসমূহ তার সারা দেহেই ছড়ায়ে ছিটিয়ে অবস্থান করে, ফলে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় কিন্তু স্ত্রী স্বামীর প্রতি তেমন আসক্ত হয় না। এদিকে স্বামী কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু স্ত্রী তখন সবলই থাকে। ফলে স্ত্রীর মধ্যে অসন্তুষ্টির প্রভাব বিস্তার করে। এতে তাদের পরস্পর মনঃক্ষুণ্নতা সৃষ্টি

হয়ে যায় এবং সেখানে তখন এক অশান্তিময় দুঃখজনক পরিবেশ বিরাজ করে। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, স্ত্রীর নিকট গমন করার পূর্বে সেখানে একটি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য স্বামীর জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা আবশ্যক।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই তার প্রিয় সাহাবীদেরকে বলে গেছেন যে, হে আমার সাহাবীগণ!। তোমরা শুনো, যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ কর তখন তোমরা তার পূর্বে স্ত্রীর নিকট দূত পাঠাবে, তখন এক সাহাবী বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! দূত কি? তখন মহানবী (সা) বলেন যে, দূত হচ্ছে চুম্বন, অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীর নিকট গমন করতে যাও তার পূর্বে অবশ্যই তাকে চুম্বন দিবে। (এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ২য় খণ্ড ৪২৩ পৃষ্ঠা, বিবাহ অনুচ্ছেদ।)

২৮. জ্বর
FEVER

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন তোমাদের কারও দেহে স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে অধিক তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন তার একমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে তার মাথায় বেশি বেশি করে ঠাণ্ডা পানি দেয়া এবং ন্যাকড়া কাপড় ঠাণ্ডা পানিতে ভিজায়ে তার সারা শরীর মুছে দেয়া। এছাড়া তখন তার জন্য এর বিকল্প আর কিছু নেই।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) ও উক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই, মানব দেহে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বেড়ে গেলে, তখন মাথায় ঠাণ্ডা পানি দেয়ার নির্দেশ দিয়ে হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ـ (جامع البخاری جلد اول صفه ترجمه بدء الخلق)

অর্থ : রাফি বিন খাদিজ (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, দেহের অস্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে জাহান্নামের ভেঁপসা তাপের বিকল্প অতঃপর তোমরা তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

(বুখারী হা/৩২৬৩, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা, বাদইল খালক)

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা যা বলছেন, তা মহানবী (সা) তাদের বহু পূর্বেই বলে গেছেন।

২৯. জুতা

SLIPPER

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, স্যান্ডেল জাতীয় জুতা ব্যতীত অন্য কোনো জুতা দাঁড়িয়ে পায়ে দিলে দেহের সমস্ত ভর তখন এক পায়ের উপর পড়ে তখন এতে দেহ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক হয়ে যায়। যার দ্বারা দেহের হৃদযন্ত্রে চাপ পড়ে এবং হৃদযন্ত্রে এই চাপ পড়ার সাথে সাথে দেহের রক্তচাপ বেড়ে যায়, এতে সারা দেহে তখন অস্থিরতা বিরাজ করে এবং পরবর্তীকালে এ সকল অস্থিরতা হতে দেহে নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দেহের উক্ত অস্থিরতা হতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্যান্ডেল জাতীয় জুতা ব্যতীত সমস্ত জুতা দাঁড়িয়ে পায়ে না দিয়ে বরং বসে পায়ে দেয়া।

এছাড়াও লক্ষ করে দেখা গেছে যে, স্যান্ডেল জাতীয় জুতা ব্যতীত অন্যান্য জুতা দাঁড়িয়ে পায়ে দেয়া খুব কষ্টকর বরং বসে পায়ে দেয়াই সহজ ও নিরাপদ। তাই বিজ্ঞানীরা সবাইকে বলেন যে, কেউ যেন কখনও স্যান্ডেল জাতীয় জুতা ব্যতীত অন্যান্য জুতা দাঁড়িয়ে পায়ে না দেয়।

৩০. টাখনু

HEEL

পায়ের গোড়ালীর নিকট দু'পাশের গোলাকার হাড়কে টাখনু বলে। এবং এই টাখনু নিয়েই কাপড় পরিধান সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বে দু'রকমের আলোচনা বিরাজমান। যেমন– ১. মুসলিম বিশ্ব, ২. অমুসলিম বিশ্ব।

লক্ষ্য করলে দৃষ্টিগোচর হয় যে, মুসলিম বিশ্বের ছেলেরা তাদের পরিধানের কাপড় টাখনুর উপর ঝুলিয়ে দিয়ে কাপড় পরিধান করে এবং মেয়েরা তাদের পরিধানের কাপড় টাখনুর নিচে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে কাপড় পরিধান করে। কিন্তু লক্ষ্য করলে এটাও অবলোকিত হয় যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু ছেলে-মেয়েরা অমুসলিম বিশ্বকে অনুসরণ করে তাদের কাপড় পরিধান করছেন, কারণ তাদের দৃষ্টিতে অমুসলিম বিশ্ব আরো উন্নত ও সভ্য। অমুসলিম বিশ্বের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাদের ছেলেরা পরিধানের কাপড় টাখনুর নিচে প্রায় পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে পরিধান করেন এবং মেয়েরা তাদের পরিধানের

কাপড় টাখনু ও হাঁটুর উপরে রেখে পরিধান করেন এবং তা অমুসলিম পরিবেশে গেলে অবশ্যই দেখা যাবে।

উপরোক্ত দু'টি পরিবেশের প্রতি পরিবেশ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, কুরআন ও হাদীস যেসব কাজ-কর্মকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে শনাক্ত করেছেন, সেসব কাজকর্ম অমুসলিম বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এবং তার কিছু কিছু মুসলিম বিশ্বের ঐ মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়, যারা অমুসলিমদেরকে অনুসরণ করেন। এছাড়াও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কুরআন হাদীসের নির্বাচিত অপরাধগুলো তুলনামূলকভাবে অমুসলিম বিশ্বের চেয়ে মুসলিম বিশ্বে অনেক কম। এবং কুরআন হাদীসের নির্বাচিত অপরাধগুলো মানুষ বর্জন করলে মৃত্যুর আগে পরে, উভয় জগতে ভয়াবহ দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাবে।

তাই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সমাজের মধ্যে যারা টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে পরিধান করেন এবং যে মহিলারা টাখনুর ও হাঁটুর উপরে কাপড় রেখে পরিধান করেন, তাদের দ্বারা সমাজে অহংকার, লজ্জাহীনতা, অসভ্য আচরণ ও জঘন্য কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে মানব সমাজের পরিবেশ নোংরা হয়ে যায়।

এছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বিশেষ করে ছেলেরা তাদের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করলে তাদের হাঁটার মধ্যে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করে এবং তা গিয়ে তার হৃদযন্ত্রে ও মস্তিষ্কে আঘাত হানে এবং এটাই একদিন তিল তিল করে তার হৃদযন্ত্রে ও মস্তিষ্কে এক বিরাট রোগের সৃষ্টি করে ফেলে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা এটাও লক্ষ করেছেন যে, মেয়েরা টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের কাপড় পরিধান করলে তাদের মধ্যে নম্র ও মার্জিত স্বভাব প্রকাশ পায়, যা তার স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। এবং পরিবেশ সুন্দর করণেও সাহায্য করে।

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই মানব সমাজের অহংকার, লজ্জাহীনতা, অসভ্য আচরণ ও জঘন্য কার্যকলাপ দূর করে দিয়ে মানুষের সমাজকে আল্লাহপাকের মনোনীত পরিবেশে রূপান্তর করার জন্য এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়াবহ দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের পরিবেশের ব্যাপারে ছেলেদেরকে টাখনুর উপরে এবং মেয়েদেরকে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের কাপড়

পরিধানের জন্য যেসকল হাদীস বলে গেছেন তার কয়েকটি হাদীস নিম্নে প্রদান করা হলো :

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ ـ(بخارى كتاب اللباس)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যার পরিধানের কাপড় যে পরিমাণ টাখনুর নিচে যাবে সেই পরিমাণ স্থান জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (বুখারী হা/৫৭৮৭ কিতাবুল লিবাস)

اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا ـ(بخارى كتاب اللباس)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারবশে ইযার বা লুঙ্গি (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে দিয়ে পরে।

(বুখারী হা/৫৭৮৮ কিতাবুল লিবাস)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّىْ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَتَوَضَّا فَذَهَبَ وَتَوَضَّا ـ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَّتَوَضَّا قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُّسْبِلٍ اِزَارَهُ ـ(رواه ابو داؤد)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি তার লুঙ্গি বেশি পরিমাণে ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়তেছিল, (তা দেখে) রাসূল (সা) তাকে বললেন, যাও এবং অজু কর। সে গিয়ে অজু করলো। এক ব্যক্তি তখন জিজ্ঞেস করলো, হে রাসূল (সা) তাকে অজু করতে বললেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, সে তার তহবন্দ (টাখনুর নীচে) ঝুলায়ে দিয়ে নামায পড়তেছিল। (এবং তিনি বললেন) যে ব্যক্তি আপন তহবন্দ (টাখনুর নীচে)

ঝুলায়ে দিয়ে নামায পড়ে, তার নামায কখনও আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না। (আবু দাউদ হা/৬৩৮ আবুওয়াবুল লিবাস)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ۔(رواہ ابو داؤد)

অর্থ : আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, পূর্ণ বয়স্ক মহিলার নামায ওড়না ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না।

(আবু দাউদ হা/৬৪১)

অর্থ : উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) স্ত্রীলোক কি শুধু কোর্তা ও উড়নিতে নামায পড়তে পারে তহবন্দ ব্যতীত? তিনি বললেন হ্যাঁ! যদি কোর্তা বড় হয় এবং তা পায়ের পাতা ঢেকে দেয় তবে হবে। (আবু দাউদ)

সুতরাং মহানবী (সা) এই পৃথিবীতে আগমন করার পূর্বে মানব সভ্যতার পরিবেশে যে সকল সংস্কৃতি বিরাজ করছিল তাঁর কোনোটিই মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত ছিল না। তাই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে তার মনোনীত সংস্কৃতিসমূহ দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠায়েছিলেন। তাই তিনি ঠিকমত তা পৃথিবীর মানব সমাজে স্থাপন করে গেছেন। অর্থাৎ টাখনুর উপরে কাপড় পরিধান করা হচ্ছে আল্লাহ পাকের মনোনীত একটি সংস্কৃতি। এছাড়াও মহানবী (সা)-এর মূল আদর্শ হচ্ছে অমুসলিমদের সংস্কৃতি গ্রহণ না করা। অর্থাৎ ছেলেরা টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে পরিধান করলে, সে ছেলেদের মধ্যে অহংকার ও লজ্জাহীনতা বিরাজ করে। যা একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবেশের বিপরীত। অপরদিকে মেয়েরা টাখনুর উপরে অথবা হাঁটুর উপরে কাপড় রেখে পরিধান করলে, সে মেয়েদের মধ্যে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা দেখা যায় যা একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবেশের জন্য বিপরীত। তাই মহানবী মুহাম্মদ (সা) মহান আল্লাহ পাকের মনোনীত একটি সুন্দর পরিবেশ মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বেই এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছেলেদেরকে টাখনুর উপরে এবং মেয়েদেরকে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে পরিধান করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

৩১. ডান দিক

RIGHT SIDE

জ্যোতিবিদগণ বলেন যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ঝোঁক ডান দিকে। অর্থাৎ পৃথিবী তার আপন অক্ষের চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে বা ডান দিকে ঘুরছে। তাই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে তাদের প্রতিটি কাজ কর্ম ডান দিক হতে করা বাম দিক অপেক্ষা সহজ। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কোনো কাজ ডান দিক হতে শুরু করলে তা পৃথিবীর গতির অনুকূলে থাকে, তাই প্রতিটি কাজ ডান দিক হতে শুরু করলে এত সহজ হয়। অপর দিকে কোনো কাজ বাম দিক হতে শুরু করলে তখন তা পৃথিবীর গতিবেগের প্রতিকূলে থাকে, তাই কোনো কাজ বাম দিক হতে শুরু করলে ডান দিক অপেক্ষা একটু কষ্টকর হয়। অর্থাৎ কোনো কাজ ডান দিক হতে শুরু করলে পৃথিবীর গতিবেগ তাকে সাহায্য করে এবং কোনো কাজ বাম দিক হতে শুরু করলে পৃথিবীর গতিবেগ তাকে বাঁধা প্রদান করে। তাই কোনো কাজ করা বাম দিক অপেক্ষা ডান দিকে অতি সহজ। তাই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে তাদের প্রতিটি কাজকর্ম ডান দিক হতে শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের প্রায় দেড় হাজার বৎছর পূর্বে এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে তাদের প্রতিটি কাজকর্ম তাদের ডান দিক হতে শুরু করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বহু হাদীস বলে গেছেন, এবং তিনিও তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ কর্ম ডান দিক হতেই শুরু করেছেন, কারণ তিনি বর্তমান বিজ্ঞানীদের ডান দিক সম্পর্কে আবিষ্কারের রহস্য জানতেন। নিম্নে ডান দিক সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস প্রদান করা হলো :

حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ الْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَانَ رَسُوْلُ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ نَامُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ۔(جامع البخاری جلد الثانی صفه كتاب الدعوات)

অর্থ : বারা বিন আজিব (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (সা)-এর স্বভাব ছিল যে, যখন তিনি তাঁর স্বীয় বিছানায় আসতেন, তখন তিনি ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। (বুখারী হা/৬৩১৫, ২য় খণ্ড ৯৩৪ পৃষ্ঠা, কিতাবুদ দাওয়াত।)

লক্ষ্য করা গেছে যে, রাতে শোয়ার সময়, ডান কাতে ঘুমালে, বাম কাত অপেক্ষা একটু আরামদায়ক হয়, এর মূল কারণ হচ্ছে ডান কাতে ঘুমালে দেহ পৃথিবীর গতিবেগের অনুকূলে থাকে। তাই শরীর এত আরামদায়ক হয় এবং বাম কাতে ঘুমালে দেহ পৃথিবীর গতিবেগের প্রতিকূলে থাকে। তাই বাম কাতে ঘুমালে পৃথিবীর গতিবেগ তাকে বাঁধা প্রদান করে, তাই কিছুটা হলেও তা দেহের জন্য অস্বস্তিকর হয়।

এছাড়াও আরো লক্ষ্য করা গেছে যে, রাসূল (সা) ডান দিকে কাত হয়ে কেবলামুখী শয়ন করতেন। উসওয়ায়ে রাসূল (সা) বাম দিকে হৃদপিণ্ড থাকে, কাজেই বাম দিকে কাত হয়ে ঘুমালে পাকস্থলী এবং হৃদপিণ্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে রক্ত চলাচল এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘুম সম্পর্কে বোম্বে হাসপাতালের (বোম্বাই অডিটরিয়াম) ডাক্তার কৃষ্ণ লাল মার্মা গবেষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, যেসব রোগীকে ডান দিকে কাত করে শয়ন করানো হয়েছে তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যেসব রোগীকে বাম কাতে শয়ন করানো হয়েছে তারা অস্থিরতার সম্মুখীন হয়েছে।

আধুনিক গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে, ডান দিকে ফিরে শয়ন করা হলে হৃদরোগ প্রসঙ্গে লিখেছেন, বাম দিকে যেহেতু হৃদপিণ্ড থাকে, এ কারণে বাম দিকে কাত হয়ে ঘুমালে ঘুম অত্যন্ত গভীর হয়। মানুষ সহজে ঘুম হতে জাগ্রত হতে পারে না। পক্ষান্তরে ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমালে ঘুম অতোটা গভীর হয় না। খুব সহজে মানুষ ঘুম হতে জাগ্রত হতে পারে। ফজরের নামাযের সময়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। রাসূল (সা) সফরকালীন সময়ে ডান দিকে কাত হয়ে ডান হাত খাড়া করে বাহুর ওপর মাথা রেখে ঘুমাতেন। এতে ঘুম গভীর হতো না, ফজরের নামায কাযা হতো না। এভাবেই রাসূল (সা) জীবনযাপন করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, পৃথিবী যে, তার আপন অক্ষের চার দিকে ডান দিক হতে বাম দিকে চলতেছে বা ঘুরতেছে। তার দিব্যদর্শন এই যে, আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর যে অংশে বাস করছি সেই অংশ হতে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত হতে দেখি। এরপর আমাদের অংশ সূর্যের দিকে বা ডান দিক হতে বামে সূর্যের দিকে যাচ্ছে বলে আমরা প্রত্যেকেই সকাল ১০টা, দুপুর ১২টা, বিকাল ৩টা ও সন্ধা ৬টা ইত্যাদি দেখি। এতে

প্রমাণ করে যে, পৃথিবী তার আপন অক্ষের চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে বা ডান হতে বামে চলছে বা ঘুরছে, এবং পৃথিবীর আপন অক্ষের চারদিকের গতিবেগ যখন সূর্যের দিকে থাকে তখন, আমরা সূর্যকে উদিত হতে দেখি, আর যখন অতিক্রম করতে দেখি তখন আমরা সূর্যকে অস্ত যেতে দেখি।

পৃথিবী তার আপন অক্ষের চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে বা ডান দিক হতে বাম দিকে ঘুরছে। তার আরো একটি বাস্তব প্রমাণ এই যে, সন্ধ্যার দিকে যখন পশ্চিম আকাশে নবচাঁদ উদিত হয়, তখন আমরা কিছুক্ষণ পর আমাদের পৃথিবীর অবস্থান হতে উক্ত নবচাঁদকে আর দেখি না, এর রহস্য এই যে, তখন চাঁদকে রেখে আমাদের পৃথিবীর বসবাসের অংশ পূর্বদিকে চলে আসে, তাই সন্ধার পর উক্ত চাঁদ আমাদের কাছে হারিয়ে যায়।

পৃথিবী যে তার আপন অক্ষের চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে অর্থাৎ ডান দিক হতে বামে ঘুরছে বা চলতেছে তার আরো একটি বাস্তব প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কাজকর্মই বাম হাত অপেক্ষা ডান হাত দিয়ে করা সহজ। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের প্রত্যেকের ডান হাতের কাজকর্ম পৃথিবীর গতিবেগের অনুকূলে, তাই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর উম্মতের প্রতিটি মানুষকে তাদের সকল কাজকর্ম ডান দিক হতে করার জন্য আদেশ দিয়ে গেছেন।

পৃথিবী তার আপন অক্ষের চারদিকে ডান দিক হতে বামে চলছে তার আরো একটি বাস্তব প্রমাণ এই যে, আমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বিদ্যুত্যের পাখা বাম দিক হতে ডান দিকে ঘুরছে, অর্থাৎ বিদ্যুতের পাখাটি পৃথিবীর গতিবেগের বিপরীত দিকে ঘুরছে, তাই আমরা এর দ্বারা বাতাস পাই, তাই এর দ্বারা বিদ্যুতও খরচ হচ্ছে, যদি এই বিদ্যুতের পাখাটিকে ডান দিক হতে বাম দিকে বা পৃথিবীর গতিবেগের অনুকূলে ঘুরানো বা চালানো হয় তা হলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, এর দ্বারা বাতাস কম হয়েছে এবং বিদ্যুৎ খচরও কম হয়েছে। এতেও প্রমাণ করে যে, পৃথিবী ডান দিক হতে বামে চলছে বা ঘুরছে।

৩২. ত্বক

SKIN

ব্রিটেনের (Health Education Authority) স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ নগ্ন-সূর্যস্নান বন্ধের দাবিতে অভিযানে নেমেছে। তারা প্রচার করেছে যে, ত্বকের ক্যান্সার হতে মুক্ত থাকতে হলে নগ্ন-সূর্যস্নান বন্ধ করতে হবে। অভিযানের অংশ হিসেবে কর্তৃপক্ষ সতর্কতার সাথে স্লোগান দিয়েছে যে, বেশিক্ষণ সূর্যের আলোতে থাকলে ত্বকে ক্যান্সার এমন কি মৃত্যুও হতে পারে।

অধ্যাপক জন হাওক লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালের একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, নগ্ন-সূর্যস্নান নিষিদ্ধ হোক। কারণ ব্রিটেনে প্রতিদিন ত্রিশ লাখ লোক নগ্ন দেহে সূর্যস্নান করে। স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে সিংহভাগই হচ্ছে যুবক-যুবতী। ষোল হতে চল্লিশের মধ্যে তাদের বয়স। এই ত্রিশ লাখের পনেরো শতাংশ জীবনে একবার হলেও শরীরের ওই উত্তেজক স্পর্শ অংশ (Sexy Tan) সূর্য রশ্মিতে মেলে ধরে। ফলে শরীরের ওই স্পর্শকাতর কোমল ত্বকের ভেতর এবং বাহির জ্বলে পুড়ে যায়।

প্রফেসর হাওক বলেন, বিশ বৎছর আগে প্রথম যখন নগ্ন-সূর্যস্নান প্রচলিত হয়, তখন কেউ কেউ মনে করত সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মিতে থাকা 'এ' এবং 'বি' রশ্মি ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মতে, অতি-বেগুনী রশ্মি মানেই তকের ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এই রশ্মি বেশিক্ষণ ত্বকে লাগালে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয় ত্বকের ভেতর এবং বাহির। সূর্য রশ্মির মেলানিন অনেক ক্ষেত্রে বিষে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ ডাক্তারদের মতে, সূর্যস্নানে আরও যেসব ক্ষতি হয় তার মধ্যে চামড়া শুকিয়ে যাওয়া, কুঁচকে যাওয়া, চুলকানি হওয়া। আর এসব কারণেই বেশি সূর্যস্নান করলে গায়ে গুটিগুটি ফুসকুড়ি পড়ে। যাকে আমরা খোঁচা লাগা গুটি বলে জানি। (জনকণ্ঠ ১৮-২-২০০০ ইং)

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বে নগ্ন সূর্যস্নান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাদীসে বলে গেছেন। যেমন :

عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ لَا تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُوْرَثُ الْبَرَصَ۔

অর্থ : ওমর বিন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা কখনও নগ্ন সূর্য রশ্মির পানি দ্বারা গোসল বা স্নান করো না। কেননা তা শ্বেত কুষ্ঠ বা ত্বক কুষ্ঠ রোগের পূর্বশ্বরী।

(দারেকুতনী হা/৯১, মেশকাত ১ম খণ্ড আহকামুল মিয়াহ অধ্যায় হাদীসটি যয়ীফ)

৩৩. তাহাজ্জুদ

MIDNIGHT PRAYER

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামায পড়ে সে কখনও হতাশাজনিত রোগে আক্রান্ত হয় না। কারণ তাহাজ্জুদ নামায অশান্তি ও অনিদ্রার মহৌষধ। এছাড়াও তাহাজ্জুদ নামায মানসিক রোগের জন্য অব্যর্থ ঔষধ। শিরার টানাপোড়ার জন্য তা পরম উপকারী।

অথচ মহানবী (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বে তাঁর উম্মতের সবাইকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য বিপুল উৎসাহ প্রদান করে বহু মূল্যবান হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ﷺ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ شَاصَّ فَاهُ بِالسِّوَاكِ۔

অর্থ : হুজায়ফা (রা) বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠতেন এবং তার পূর্বে তিনি মেসওয়াক করতেন এবং খুব ভালো করে মুখ পরিষ্কার করে কুলি করতেন। (মুস্তাতরফ– মেসওয়াকের অধ্যায়।) মুস্তাদরাকে পাইনি। তবে এ হাদীসটি (মুসলিম- ৬১৬)

হাদীস শরীফে আছে যে,

وَقِيْلَ لِلْحَسَنِ مَا بَالَ الْمُتَهَجِّدِيْنَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ وُجُوْهًا فَقَالَ لِاَنَّهُمْ خَلُوْا بِالرَّحْمٰنِ فَاَلْبَسَهُمْ نُوْرًا مِّنْ نُوْرِهٖ۔

অর্থ : হাসান বসরী (র)-কে বলা হয়েছিল যে, বর্তমান যুগে তাহাজ্জুদ নামাযের অবস্থা কেমন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, যে সকল মানুষের মুখমণ্ডল দেখতে সুন্দর দেখা যাবে, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রহমতের নূরের

চিহ্ন যাদের মুখে দেখা যাবে, তারাই তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। তখন হাসান বসরী (রা) বলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে খুব বিনয়ের সাথে, তাকে আল্লাহ পাক তাঁর রহমতের নূর হতে নূরের পোশাক পরায়ে দিবেন।

(মুস্তাতরফ নামাযের ফযীলত অধ্যায়) (আল মুজালাসাতু ওয়াল জাওয়াহিরুল ইলম হা/১৩৩)

তাহাজ্জুদের সময়

অভিজ্ঞজনদের অনেক বিশ্লেষণ-এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপকারিতা অর্জনের বিষয় প্রমাণিত :

১. তাহাজ্জুদের সময়ে নামায আদায় করা অস্বস্তি ও নিদ্রাহীনতার চিকিৎসা।
২. তাহাজ্জুদ নামায হার্টের রোগের বড় ধরনের ওষুধ।
৩. তাহাজ্জুদের সময় নামায আদায় করা স্নায়ুর সংকোচন ও বন্ধনের জন্য উপকারী।
৪. মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ করে পাগল হওয়ার মতো মারাত্মক সমস্যার জন্য শেষ চিকিৎসা হলো তাহাজ্জুদ।
৫. তাহাজ্জুদের সময় নামায আদায় করা দৃষ্টির রোগগুলোর পরিপূর্ণ চিকিৎসা। তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে ঐসব লোকের জন্য নিরাময় যারা প্রত্যেক জিনিস দুটি দুটি দেখে।
৬. তাহাজ্জুদের নামায মানবদেহে বুদ্ধি, আনন্দ এবং আসাধরণ শক্তি সৃষ্টি করে যা নামাযীকে সারাদিন উৎফুল্ল রাখে।

এছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তায়ালার সাথে একান্ত নৈকট্য হাসিল করে। রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর পরে এটা বুঝতে হবে যে, মধ্যরাতের পর হতে সুবহে সাদিকের আগে আগে তাহাজ্জুদের নামাযের সময়। নামাযী যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ঘুম হতে জেগে উঠে তখন ঐ সময় তার মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হয় যে, তার অনুভূতি অদৃশ্য নড়াচড়া এবং অদৃশ্য রশ্মিগুলো সহজে গ্রহণ করে নেয়। এজন্য সুফিয়া কেরাম (র) বলেন, যে আল্লাহর ওলী যা কিছু অর্জন করেছেন তা তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। তাহাজ্জুদ গোযারের সাথে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাস দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল ও মারেফাত অর্জনের সর্বশেষ সিঁড়ি হলো তাহাজ্জুদের নামায।

তাহাজ্জুদের নামাযের উপকারিতা

মুলতানের নিশতার মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাক্তার নূর আহমদ তাহাজ্জুদ নামাযের উপকারিতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, হতাশ এবং অবসাদ বিষয়ে পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিশারদ ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খাইবার মেডিকেল কলেজের মনস্তত্ত্ববিদরা আমাকে জানিয়েছেন। তাদের মতে, যেসব মুসলমান তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ে জাগ্রত হয় তারা কখনো হতাশা এবং অবসাদে আক্রান্ত হন না। তাদের মতে হতাশা এবং অবসাদের চিকিৎসাই হচ্ছে তাহাজ্জুদের সময়ে জাগ্রত হওয়া।

মনস্তত্ত্ববিদরা হতাশার রোগীদের নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। গবেষণার পর তারা হতাশা এবং অবসাদের রোগীদের তাহাজ্জুদের সময়ে জাগাতে শুরু করেন। এসব রোগী ঘুম হতে জেগে কিছু পাঠ করতেন তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। কয়েক মাস এ নিয়ম পালন করার ফলে তারা অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওষুধ ছাড়াই তাদের রোগ ভালো হয়ে যায়। ফলে পশ্চিমা ডাক্তাররা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মধ্যরাতের পর জাগ্রত হওয়াটা হচ্ছে হতাশা এবং অবসাদগ্রস্ত রোগীদের একমাত্র প্রতিষেধক।

অভিজ্ঞতা এবং গবেষণায় একথা দিবালোকের মতো সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, রুগ্ন, অসুস্থ, অর্ধমৃত এবং অনিদ্রার রোগীদের নানা রকমের চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কল্যাণকর একটি চিকিৎসাও রয়েছে। এ চিকিৎসা হচ্ছে নামায। যাদের দেহের ভেতর নানাবিধ আভ্যন্তরীণ রোগ রয়েছে তারা যদি রাতের শেষদিকে জেগে কাটায় তবে তাদের দেহ অবশ্যই এর সুফল লাভ করে। মনস্তত্ত্বের চিকিৎসক এবং মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞরা এ সম্পর্কে প্রমাণিত কিছু গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, রমযানে মুসলমানদের মধ্যে ডিপ্রেশন বা অবসাদ রোগ কম দেখা যায়। রমযান মাসে চিকিৎসকের কাছে অবসাদের রোগী খুব কম আসে। এর কারণ স্বরূপ তারা উল্লেখ করেন, রমযান মাসে মুসলমানরা রাত্রি শেষে সেহরী খায়, তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, ফলে তাদের মধ্যে ক্লান্তি এবং অবসাদ দেখা দেয় না। এ কারণেই চিকিৎসকরা এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শেষ রাতে জেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত উপকারী।

১৯৮৫ ইং সনের জানুয়ারি হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাহোরের আল্লামা ইকবাল মেডিকেল কলেজের মনস্তত্ত্ব ও মস্তিষ্ক বিজ্ঞান বিভাগ অবসাদ সংক্রান্ত এক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচিতে অবসাদ বা ডিপ্রেশনের রোগীদের একত্রে রাখা হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ৬৪ জন রোগী মনোনীত করা হয়। এদেরকে ৩২ জন করে দুই ভাগে ভাগ করে প্রথম দলের ২১ জনের জন্যে তাহাজ্জুদ নামায বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় দলের ৩২ জনকে শেষ রাতে কিছু সময় জেগে থেকে যারা তাহাজ্জুদ আদায় করবে তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়। এ সকল রোগী দীর্ঘদিন যাবৎ অবসাদে ভুগছিলেন এবং নানা রকমের চিকিৎসাও তারা গ্রহণ করেছেন। উল্লেখিত চিকিৎসার সময়ে অন্য সকল প্রকার ঔষধ তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়।

উভয় দলের জন্যে রাত ২টা হতে রাত ৪টা পর্যন্ত জেগে থাকা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। প্রথম দলকে বলা হয়, তারা আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবে। এ সময়ে কুরআনের এ দুটি আয়াত কয়েকশ বার পাঠ করতে বলা হয়।

১. আলাবিযিকরিল্লাহি তাৎমাইননুল কুলুব। (সূরা রা'আদ : আয়াত-২৮)

২. ওয়া ইযা মারিদতু ফাহুয়া ইয়াশফিন। (সূরা আশশু'আরা : আয়াত-৮০)

রোগীদের বলা হয়, তারা যেন যিকিরের সময়ে মন নরম রাখে এবং নিজেদের মহান আল্লাহর নিকটবর্তী মনে করে। এ দলের নামকরণ করা হয় রিসার্চ গ্রুপ। দ্বিতীয় দলকে নাম দেয়া হয়েছিলো কন্ট্রোল গ্রুপ। তাদের বলা হয়। তারা যে দুই ঘণ্টা জেগে থাকবে সে দুই ঘণ্টা তারা ছোটখাটো কাজ কর্ম করবে অথবা বই পড়বে। সপ্তাহে দুবার এ রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হতো। চার সপ্তাহ পর রোগীদের হেমিলটন ডিপ্রেশন স্কেল দিয়ে নিরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, যারা ছোট খাটো কর্ম করেছে এবং বই পড়েছে, অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপ তাদের তুলনায় যারা নামায, কুরআন তেলাওয়াত এবং যিকির করেছে তাদের রোগ অনেক কমে গেছে।

তাহাজ্জুদ নামায রোগীদের সরল সঠিক পথ নির্দেশ করে। এ নামায যদি গভীর মনোযোগের সাথে আদায় করা যায়, এ নামাযে যদি ভালোবাসার

প্রকাশ ঘটানো যায় তবে সুফল অবধারিত। এর ফলে রোগের প্রকোপ কমে যাবে এবং জীবন সুন্দর সুখময় হয়ে ওঠবে। কারণ যারা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে তারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

তাহাজ্জুদ নামায হচ্ছে একটি মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। এ নামায আদায়ের শিক্ষা কুরআন হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। সফলতার দিক হতে পাশ্চাত্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা এ চিকিৎসার ধারে কাছেও আসতে পারে না। একজন মুসলমান মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস করে, সে আল্লাহ পাকের একজন ক্ষুদ্র দাস। একথাও বিশ্বাস করে যে, তার জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে রয়েছে। জীবনের নানারকমের সমস্যা ও জটিলতায় আল্লাহ পাকই মুক্তি দিয়ে থাকেন, একথাও একজন মুসলমান পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে।

৩৪. দাড়ি

BEARD

চক্ষু বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ঘনঘন দাড়ি কামালে চোখের দৃষ্টি শক্তির এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তাই চক্ষু বিজ্ঞানীরা ঘন ঘন দাড়ি কামানোর পক্ষপাতি নয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দাড়ি হচ্ছে দেহের সৌন্দর্য প্রকাশের এক প্রতীক চিহ্ন এবং এর দ্বারা মানুষের ধৈর্য ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়। রণকৌশল বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দাড়ি হচ্ছে একজন মানুষের সাহসিকতা, বাহাদুরী ও দূরদর্শিতা সৃষ্টির একটি মাধ্যম মাত্র। এবং রণ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, একজন দাড়ি বিশিষ্ট যুবকের মধ্যে যে পরিমাণ সাহসিকতা ও দূরদর্শিতা দেখা যায়, সেই পরিমাণ সাহসকিতা ও দূরদর্শিতা দেখা যায় না একজন দাঁড়ি ব্যতীত যুবকের মধ্যে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দাড়ি হচ্ছে একজন সাবালক মানুষের প্রতীক চিহ্ন। অর্থাৎ যখন একজন মানুষের দাড়ি গজায় তখনি বুঝতে হবে যে, সে এখন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ।

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, দাঁড়ি আল্লাহ পাকের প্রতি মানুষকে দৃঢ় বিশ্বাসে ঈমানের প্রতি ধাবিত করে। এবং ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের প্রতি এক প্রকার শক্তি আর আল্লাহ পাক নিজেই হচ্ছেন এক বিশাল শক্তিধর মহান সত্তা। এবং দাড়িবিশিষ্ট ঈমানী শক্তি যে

মানুষের আছে অবশ্যই তাকে দেখে ভীতি প্রকাশ করেন ঐ লোক, যে মানুষের মুখে দাঁড়ি নেই। তা লক্ষ্য করলে, অবশ্যই অবলোকিত হয়।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই তিনি নিজে দাড়ি রেখে, তা তিনি তাঁর নিজের আদর্শের প্রতীক ঘোষণা করে, তা তিনি তাঁর সকল উম্মতগণকে উক্ত দাড়ি রেখে পালন করার জন্য হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا يَحِيٌّ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوْا الشَّارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَىَ۔

অর্থ : ওমর (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা গোঁফকে খাট করে রাখ এবং দাঁড়িকে লম্বা করে রাখ।

(নাসায়ী হা/৯২৯১ ১ম খণ্ড ৭ম পৃষ্ঠা, কিতাবুত তাহারাত।)

৩৫. দাঁড়িয়ে পেশাব

URINE IN STAND UP

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেটের উপর কোনো চাপ পড়ে না। তাই দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেটের দূষিত বায়ু পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হতে না পারায় তখন তা উর্ধ্ব দিকে ধাবিত হয়। তখন দেহে অস্থিরতা বাড়তে থাকে, রক্ত চাপ বাড়ে, এর ফলে হৃদযন্ত্রে চাপ পড়ে, তাতে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন উঠানামা করতে থাকে এবং খাদ্যনালী দিয়ে বার বার হিক্কা আসতে থাকে। আর যদি মানুষ বসে পেশাব করে তাতে পেশাব করার সাথে সাথে পেটে দূষিত গ্যাস থাকলে ইহা পেশাবের সাথে সাথে পায়খানার রাস্তা দিয়েও বের হয়ে যায়। ফলে দেহে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হতে পারে না। এবং সহজে বড় কোনো রোগও হয় না।

এছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরো বলেন যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করার সময় পেশাবের থলী সরু লম্বা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, এতে পেশাবের মধ্যকার দূষিত পদার্থগুলো পেশাবের থলীর নিম্নগামী থাকে ফলে পেশাব করার সময় পেশাব বেরিয়ে যায় কিন্তু এর দূষিত পদার্থগুলো উক্ত থলীর তলদেশে গিয়ে জমা হতে থাকে। কিন্তু যখন কোনো মানুষ বসে পেশাব করে তখন পেটের চাপে পেশাবের থলীটি সম্প্রসারিত হয় যার ফলে সম্পূর্ণ পেশাব সহজেই উক্ত থলী হতে বের হয়ে আসে। এতে কখনও

পেশাবের থলীতে কোনো জটিল রোগের সৃষ্টি হয় না। এছাড়াও অনেক চিকিৎসকরা বলেন যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করলে কিডনীতে অতি সহজে পাথরের সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেশাবের বেগ কমতে থাকে, অথচ যদি একজন মানুষ সারাজীবন বসে পেশাব করে তবুও তার পেশাবের বেগ কমে না। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, যারা নিয়মিতভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন, তাদের অবশ্যই শেষ জীবনে ডায়াবেটিস, জন্ডিস, কিডনী রোগ হবেই। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরো বলেন যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পুরুষের যৌবন শক্তি কমতে থাকে এবং পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র ও নরম তেনা তেনা হয়ে যায় এবং সহজে সোজা ও শক্ত হতে চায় না যদিও কোনো উত্তেজনায় সোজা ও শক্ত হয় তাও খুব অল্প সময়ের জন্য এবং কিছু বের না হয়েই আবার ছোট ও নরম হয়ে যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পরিবেশ দূষিত হয়। যেমন– বায়ু দূষিত হয় এবং সেই বায়ু আমাদের শ্বাস কাজে আমাদের দেহে প্রবেশ করে দেহে নানা জটিল জটিল রোগ সৃষ্টি করে এবং পেশাব ছিটকে এসে আমাদের দেহে লাগে, কাপড়ে লাগে, এতে আমাদের দেহ ও কাপড় অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় হয়ে ব্যক্তিগত পরিবেশকেও নষ্ট ও দূষিত করে দেয়। তাই স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের উপরোক্ত দৈহিক সমস্যার মধ্য হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসে পেশাবের বিকল্প কোনো পথ নেই। অর্থাৎ উপরোক্ত রোগবালাই হতে রক্ষা পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সকলকে বসে পেশাব করতে হবে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই এই পৃথিবীর মানুষদেরকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এবং বসে পেশাব করতে হুকুম দিয়ে গেছেন। যেমন– নিম্নে তাঁর দু'টি হাদীস উপস্থাপন করা হলো:

اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا ـ فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلَّا قَاعِدًا ـ

অর্থ : আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি তোমাদেরকে হাদীস শোনায়ে বলেন যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন। তখন তোমরা তাকে কোনোভাবেই সত্য মনে করো না। কারণ মহানবী (সা) কখনও বসা ব্যতীত দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন না।

(তিরমিযী হা/১২, ১ম খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা আবওয়াবুত তাহারাত।)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ ﷺ اَبُوْلُ قَائِمًا. فَقَالَ يَا عُمَرُ لَاتَبُلْ قَائِمًا. فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ.

অর্থ : ওমর (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) আমাকে কোনো এক সময় দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলেন। তখন মহানবী (সা) আমাকে বললেন, হে ওমর! তুমি কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করো না! এরপর ওমর (রা) বলেন যে, তারপর আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

(তিরমীযি হা/১২, ১ম খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা, আবুওয়াবুত তাহারাত।)

৩৬. দাঁড়িয়ে পান করা

DRINK IN STAND UP

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন তার দেহ বসে থাকার চেয়ে কিছুটা অস্বাভাবিক থাকে। এছাড়াও তখন খাদ্যথলী বাতাসে পরিপূর্ণ থাকে, তাই তখন কোনো পানীয় কিছু পান করলে পেটের উক্ত বাতাস খাদ্য নালী দিয়ে সাথে সাথে বের হয়ে আসতে পারে না, ফলে উক্ত বাতাস খাদ্য থলীর ভিতরেই বলের মতো চারদিকে চাপ প্রয়োগ করে এবং সেই চাপ গিয়ে হৃদযন্ত্রে ও ফুসফুসে পতিত হয়। তখন দেহে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং এর ফলে হৃদযন্ত্রের কম্পন বেড়ে যায়। ফলে দেহে তখন অস্বস্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন কোনো মানুষ কোনো পানীয় দ্রব্য বসে পান করে তখন তার দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং খাদ্য থলী প্রসারিত ও স্বাভাবিক থাকে, যার ফলে তখন কোনো পানীয় দ্রব্য পান করলে, ইহা দেহের ভেতর প্রবেশ করার সাথে সাথে উক্ত খাদ্যথলীর বাতাস সহজেই খাদ্যনালী দিয়ে বের হয়ে আসে। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোনো পানীয় দ্রব্য বসে পান করলে উপরে আলোচ্য কোনো সমস্যাই দেহে সৃষ্টি

হবে না। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা প্রত্যেক মানুষকে পরামর্শ দেন যে, কেউই যেন কোনো পানীয় দ্রব্য কখনও দাঁড়িয়ে পান না করে। এছাড়াও তারা আরও বলেন যে, দাঁড়িয়ে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করলে মতিভ্রম ঘটে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উপরোক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই কোনো পানীয় দ্রব্য দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করে গেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ওযু করার পর তার অবশিষ্ট পানি ও যমযম কূপের পানি ব্যতীত আর যত পানীয় দ্রব্য আছে তা যদি কখনও কেউ দাঁড়িয়ে পান করে সে হচ্ছে শয়তানের বন্ধু। এতে প্রমাণ করে যে, দাঁড়িয়ে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করা সম্পর্কে মহানবী (সা) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, দাঁড়িয়ে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করলে দেহের জন্য খুব ক্ষতিকর একথা মহানবী (সা) জানতেন। তাই তিনি তাঁর সকল উম্মতগণকে দাঁড়িয়ে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করতে নিষেধ করে গেছেন। যেমন– এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস :

عَنِ الْجَارُوْدِ بْنِ الْعَلَاءِ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا۔

অর্থ : জারুদ বিন আলা (রা) হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) তাঁর উম্মতগণকে দাঁড়িয়ে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করতে নিষেধ করে গেছেন। (তিরমিযী হা/১৮৮০ ২য় খণ্ড-১০ম পৃষ্ঠা, আবুওয়াবুল আশরাবা।)

৩৭. দীর্ঘ জীবন

LONG LIFE

আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বৎছর পূর্বে মহানবী মুহাম্মদ (সা) পবিত্র কুরআনের আলোকে বলে গেছেন যে, নূহ (আ) এই পৃথিবীতে ১৪০০ বৎছর জীবিত ছিলেন এবং তার উক্ত দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি এই পৃথিবীর মানুষকে ৯৫০ বৎছর দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, যেমন– এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا۔

অর্থ : এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট পাঠালাম, অতঃপর সে তাদের মধ্যে নয় শত পঞ্চাশ বৎছর অবস্থান করেছিলেন।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-১৪)

বিজ্ঞানীরা নূহ (আ)-এর দীর্ঘদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তথ্য জেনে, তাদের মনে নানা গবেষণার উদ্রেক হয় এবং বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কিভাবে এই পৃথিবীতে নূহ (আ) এত দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং এর উপর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানব দেহের ক্রমোজোমগুলোকে কোনোমতে ঠেকিয়ে দিতে পারলেই, নিশ্চিন্তে অনেকদিন এ ধরায় বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখা যাবে।

টেলোমরিস ধরে রাখবে যৌবন, তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের গড় আয়ু। আর তা সম্ভব হচ্ছে রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের মরণপণ যুদ্ধের কারণে। রোগ যতই শক্ত হোক এর তাণ্ডব বেশিদিন স্থায়ী হচ্ছে না পৃথিবীতে। ফলে বেশিদিন বেঁচে থাকার গ্যারান্টি পাচ্ছে মানুষ। তবে জরা বার্ধক্যকে একেবারে কব্জা করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এতে বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলছে অনবরত। বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন, মানুষের বুড়িয়ে যাওয়ার মূল কারণ কতগুলো জিনে। যা মানুষের জরা-বার্ধক্যের জন্য দায়ী। কাজেই সে জিনগুলোকে চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে পারলেই থামিয়ে দেয়া যাবে বার্ধক্য। আবার বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন, আমরা যতটা খাই তার পরিমাণ কমালে দেহে শক্তি কমে যাবে। শরীরের কোষগুলো কম ব্যয় হবে। তবে বেশ কবছর বেশি বাঁচা যাবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, একজন

পূর্ণ বয়স্ক মানুষ প্রতিদিন ৩০০০ ক্যালরি খায়। এ সংখ্যাকে কমিয়ে ১৮০০ ক্যালরিতে নিয়ে এলে মানুষ অনায়াসে আরও বিশ ত্রিশ বছর বেশি বাঁচতে পারবে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের বার্ধক্যে পড়ার আরেকটি কারণ আমাদের দেহ কোষগুলোর বাড়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো ঝিমিয়ে পড়ে। কোষগুলোর বৃদ্ধি কমে যায়। কিন্তু এ কোষগুলোর বৃদ্ধি ধরে রাখতে পারলেই মানুষের অসাধ্য সাধন হবে। জরা-বার্ধক্য চলে আসবে হাতের মুঠোয়। কিন্তু কিভাবে কোষগুলোর বৃদ্ধি রাখা যায়? এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করে জেনেছেন যে, মানুষের দেহে একমাত্র ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষ বাড়তে থাকে। এর কারণ একটি জিন টেলোমারিস নামে একটা এনজাইম তৈরি করে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা থাকে নিষ্ক্রিয়। ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে কোষগুলোর মধ্যে তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে এ জিন। যথেষ্ট মাত্রায় উৎপন্ন হয় টেলোমারিস। ফলে তরতর করে বাড়তে থাকে ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলো।

এখন এ জিনগুলোকে চিহ্নিত করে কোনোও কায়দায় এদের উস্কে দিতে পারলে আর ঠেকায় কে? দেদারসে তৈরি হবে টেলোমারিস এনজাইম। কোষগুলো বাড়তে থাকবে। থামবে না কোনোও দিন। কাছে ঘেঁষতে পারবে না জরা-বার্ধক্য। মানুষ লাভ করবে অনন্ত যৌবন। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ২০১৫ সালের মধ্যে আবিষ্কৃত হবে এমন একটি ওষুধ যা টেলোমারিস এনজাইমের প্রচুর পরিমাণ নিঃসরণ করবে এবং অব্যাহত রাখবে।

নেনোটেকনোলজি নামে এক ধরনের প্রযুক্তির কথা এখন বেশ জোরে শোরে শোনা যাচ্ছে। এর বদৌলতে আগামী শতকে হয়ত পুঁচকে কোনোও যন্ত্র তৈরি সম্ভব হবে। যা শরীরে প্রবেশ মাত্র সব রোগের কোষ ভাঙ্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তখন মানুষ কব্জা করতে পারবে দীর্ঘ জীবনের অমরতাকে। (দৈনিক ইত্তেফাক ৩-৪-১৯৯৮ ইং)

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরও দাবি করেছেন, তারা এমন তিনটি বিষয় আবিষ্কার করেছেন যাতে একজন মানুষ কতদিন বাঁচবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে। ইন্টারনেট বিজ্ঞানীদের এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তারা বলেছেন, এক ব্যক্তির আয়ুষ্কাল তার দেহের তাপমাত্রা এবং রক্তে প্রবাহিত দুটি রাসায়নিক মাত্রার উপর নির্ভর

করে। যুক্তরাষ্ট্রের কান্টিমোর শহরে এক গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে। (যুগান্তর ৩-৮-২০০২ ইং)

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই মহানবী (সা) পবিত্র কুরআনের আলোকে বলে গেছেন যে, 'নূহ' (আ) এই পৃথিবীতে ৯৫০ বছর এই পৃথিবীর মানুষদেরকে শুধু সৎপথে ডেকে ছিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা মানুষকে দীর্ঘদিন বাঁচায়ে রাখার জন্য নানা গবেষণা ও নানা ঔষধ আবিষ্কারের গবেষণা ও উৎস পেয়েছে ইত্যাদি।

৪৮. জাহান্নাম

HELL

জাহান্নামের পরিচয় সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন, যখন আল্লাহ পাক তাঁর সাতটি জাহান্নামের মধ্য হতে সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে জাহান্নামটি, সেই জাহান্নামকে যখন তিনি উপস্থাপন করবেন, সে জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেকটি লাগামে বিশাল বিশাল বিকট আকৃতির সত্তর হাজার করে ফেরেশতা থাকবে, তারাই জাহান্নামকে পরিচালনা করবেন। যেমন– এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনা করা হলো :

حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا ـ (ترمذى جلد الثانى صفه ٨١ صفت الجهنم)

অর্থ : আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন জাহান্নামকে উপস্থাপন করবেন, সে জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেকটি লাগামে সত্তর হাজার করে ফেরেশতা থাকবে, তারাই জাহান্নামকে পরিচালনা করবেন।

(তিরমিযী হা/২৫৭৩ ২য় খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা ছিফাতুল জাহান্নাম।)

দোযখে আল্লাহপাক জাহান্নামবাসীদেরকে শাস্তি দিবেন, বিশেষ করে আগুন দ্বারা, সেই আগুন সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন, যেমন–

اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هُمَامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ تُوْقَدُوْنَ جُزْءٌ وَّاحِدٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِّنْ حُرِّ جَهَنَّمَ۔(ترمذى جلد الثانى صفه صفة الجهنم)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা আগুনের যে অংশকে জ্বলতে দেখছ, এই আগুন জাহান্নামের আগুনের তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি গরম।

(তিরমিযী হা/২৫৮৯ ২য় খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা, ছিফাতুল জাহান্নাম।)

এছাড়াও হাদীসের আলোকে কথিত আছে যে, জাহান্নাম হচ্ছে চির ভয়াবহ শাস্তির আবাসস্থল, তাই সেখানে সময় স্থির, সেখানে সময়ের কোনো হিসাব নেই, সেখানে জাহান্নামবাসীরা ভয়াবহ তীব্র তাপের তেজী আগুনে জ্বলবে, তখন তাদের নিকট উক্ত জাহান্নামের এক এক মিনিট পৃথিবীর হাজার হাজার বৎছরের চেয়ে বিশাল মনে হবে। জাহান্নামবাসীদের কোনো ইচ্ছা এবং কোনো আশাই পূরণ করা হবে না, বরং সেখানে যা কিছু করা হবে তার সবই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হবে। এতে তাদের সেখানে এতোই ভয়াবহ তীব্র ক্ষুধা ও পানি পিপাসা লাগবে, মনে হবে যে, দুনিয়ার সমস্ত খাবার ও পানি যদি শুধু তাদের একজনকে দেয়া হয়, তবুও তার ক্ষুধা ও পানি পিপাসা দূর হবে না। সেখানে তাদেরকে ভয়াবহ তীব্র দুর্গন্ধ জাতীয় অনেকটা ঘাঁ-পাঁচড়ার পুঁজের মতো বিষাক্ত খাবার ও পানিও দ্রব্য দেয়া হবে, যা দেখে তারা তীব্র ঘৃণা বোধ করবে, তবুও তারা কোনো উপায় না পেয়ে খাবে এবং পান করবে, খাওয়ার পর সেখানে তাদের শাস্তি র মাত্রা আরো তীব্র হতে তীব্র হয়ে যাবে। সেখানে তাদের কখনো মরণ হবে না, তাদের দেহের কখনো কোনো পরিবর্তন হবে না, তবে শরীরের চামড়া কুঁচকে ও কালো হয়ে যাবে, তখন উক্ত জাহান্নামের ফেরেশতারা তা পরিবর্তন করে শরীরে আবার নতুন চামড়া পরায়ে দিবেন। এবং সে চঁমড়াটিও হবে তীব্র গরম আগুনের। এছাড়া সদা একই অবস্থায় থাকবে।

উপরোক্ত জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যেক পাপীগণ, তাদের মৃত্যুর পর হতেই পেতে থাকবে। যেমন, মহান আল্লাহপাক বলেছেন- "প্রত্যেক পাপীই তার মরণের পর হতে "সিজ্জিনে" বসবাস করবে"। 'সিজ্জিন' হচ্ছে হাশর-নশরের হিসাব-নিকাশের পূর্বে পাপীদের বাসস্থান, যা মহান আল্লাহ্ পাকের জাহান্নামেরই একটি বিকল্প ব্যবস্থা।

মহানবী (সা)-এর উল্লেখিত হাদীসগুলোর সত্যতা প্রমাণ করার পক্ষে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন যে, যখন তুমি আনন্দে থাক তখন তোমার নিকট এক ঘণ্টা এক মিনিট মনে হয়, আর যখন তুমি জেলখানায় বাস কর, তখন তোমার নিকট এক মিনিট এক ঘণ্টা মনে হয়, এটাই হচ্ছে আমার রিলিটিভিটি মতবাদ বা আপেক্ষিক তত্ত্ব। আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিক তত্ত্বই প্রমাণ করে যে, জাহান্নামের ভয়াবহ তীব্র শাস্তির এক মিনিট পৃথিবীর হাজার হাজার বৎছরের চেয়েও বিশাল।

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আমাদের এই পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস নামে দুটি জীবণু পদার্থ আছে, যাদের দ্বারা পৃথিবীর সকল পদার্থ, প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের সবাই সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, পুরাতন হচ্ছে, রূপান্তর ও নষ্ট হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যদি এই পৃথিবীতে ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস জীবাণু দ্বয় না থাকতো, তবে পৃথিবীতে কখনো কারো সৃষ্টি-ধ্বংস, পুরাতন-রূপান্তর ও নষ্ট হতো না। মহান আল্লাহপাক যাকে যেভাবে সৃষ্টি করতেন সে সদা একই অবস্থায় বিরাজ করতো। এতে প্রমাণ করে যে, দোযখে মিকাঈল (আ) ও আজরাঈল (আ) ফেরেশতাদ্বয়ের কোনো সৃষ্টি-ধ্বংস ক্রিয়া নেই। মহান আল্লাহপাক দোযখে যাকে যে অবস্থায় রাখবেন, সে সদা একই অবস্থায় থাকবে।

তা-হলে জাহান্নাম কোথায়, এবং জাহান্নাম কত বড়? এর উত্তর হচ্ছে মহান আল্লাহপাক সাত আকাশ ও সাত জমিনের অসংখ্য কোটি কোটি ফেরেস্তা বর্ষ মাইল গভীরে হচ্ছে আল্লাহপাকের সাতটি জাহান্নামের অবস্থান এবং এক জাহান্নাম হতে অন্য এক জাহান্নামের দূরত্ব কোটি কোটি ফেরেশতা বর্ষ মাইল। এবং ফেরেস্তারা তাদের নিজস্ব গতিবেগে এক বৎছরে যে দূরত্ব পথ অতিক্রম করে তাকে এক ফেরেস্তাবর্ষ দূরত্ব পথ বলে। তবে ফেরেস্তাদের গতি বেগে প্রতি সেকেন্ডে কত তা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কেও জানে না। তবে প্রতি সেকেন্ডে ফেরেস্তাদের

গতিবেগের ব্যাপারে বিখ্যা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E=MC^2$ এর সাহায্যে একটি সম্ভাব্য আলোচনা নিম্নে করা হলো। যেমন–

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখান যে, পদার্থ ও শক্তি প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। M ভর বিশিষ্ট কোনো বস্তুকে বা, কোনো পদার্থকে কোনো উপায়ে ধ্বংস করতে পারলে ইহা হতে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এবং এই শক্তির পরিমাণ হলো, $E=MC^2$। এখানে "C" হলো আলোকের বেগ। ইহা এক বিস্ময়কর সূত্র। উপরের সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করলে দেখা যায় যে, এক গ্রাম ভরের কোনো পদার্থ হতে প্রাপ্ত শক্তি $1\times (3 \times 10^{10})^2 = 9 \times 10^{20}$ আর্গ। অর্থাৎ এক কেজি ওজনের কোনো পদার্থকে কোনো উপায়ে ধ্বংস করলে ইহা হতে 9×10^{20} কেজির সমপরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

$E=MC^2$ এই সূত্রের দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায় যে, আলোর স্বাভাবিক গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে 186000 হাজার মাইল। তা হলে এই আলোর ভর ধ্বংস করে এর দ্বারা মহান আল্লাহ্ পাক যে ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, তার গতিবেগ আলোর চেয়ে প্রতি সেকেন্ডে হবে $9 \times 10^{20} \times 186000 = 1674 \times 10^{23}$ মাইল। অর্থাৎ ফেরেশতাদের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 167400, 0000000, 0000000, 0000000 মাইল। অর্থাৎ এক লক্ষ সাতষট্টি হাজার চারশত কোটি × কোটি × কোটি মাইল।

তাহলে ফেরেশতারা প্রতি সেকেন্ডে যায় 1674×10^{23} মাইল, তা হলে ফেরেশতারা এক বৎছরে যায় $9 \times 10^{20} \times 6 \times 10^{12} = 54 \times 10^{32}$ মাইল। অর্থাৎ ফেরেশতাদের গতিবেগ এক বৎসরে 540000, 0000000, 0000000, 0000000, 0000000 কোটি মাইল। অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার, কোটি × কোটি × কোটি × কোটি মাইল।

অর্থাৎ জাহান্নাম-এর অবস্থান হচ্ছে সাত আকাশ ও সাত জমিনের নিচে অসংখ্য কোটি কোটি ফেরেশতাবর্ষ মাইল গভীরে। এর চারদিকেই ছড়ায়ে ছিটিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর সাতটি জাহান্নামকে ভাসায়ে অবস্থান করে রেখেছেন। এবং তাঁর উক্ত সাতটি জাহান্নাম সেখানে তিনি একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের ভেতর আবদ্ধ করে রেখেছেন। এবং এক জাহান্নাম হতে অন্য এক জাহান্নাম পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে কোটি কোটি ফেরেশতাবর্ষ মাইল। এরূপ সমান দূরত্বের ব্যবধানে উক্ত সাতটি জাহান্নাম সেখানে অবস্থান করছে।

উক্ত সাতটি জাহান্নামের এক একটির আয়তনে কত বিশাল তা একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে উক্ত সাতটি জাহান্নামের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে জাহান্নামটি শুধু বুঝানোর জন্য হাদীসের আলোকে তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা হলো : সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে জাহান্নামটি তার মধ্যে অসংখ্য কোটি কোটি আগুনের গর্ত রয়েছে। এক একটি গর্ত হতে অন্য একটি গর্তের দূরত্ব কোটি কোটি ফেরেশতাবর্ষ মাইল এবং দোযাখের এক একটি আগুনের গর্ত যে কি বিশাল? তা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে শুধু নমুনা স্বরূপ বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে যদি একটি বিশাল কোনো গর্তে একটি সরিষা দানা নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে উক্ত বিশাল গর্তের তুলনায় সরিষা যেরূপ হবে, ঠিক তার চেয়েও আরো ক্ষুদ্র হবে জাহান্নামের একটি বিশাল গর্তে সূর্যের মতো একটি বিশাল পাথরকে নিক্ষেপ করলে। অর্থাৎ জাহান্নামের এক একটি গর্তে সূর্যের মতো বিশাল পাথরও উক্ত গর্তের বিশালতায় সরিষার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র এবং এক একটি গর্ত এতোই বিশাল যে, তার যে কোনো একটি গর্তে সূর্যের মতো বিশাল কোনো পাথরকে যদি খুব বেগে নিক্ষেপ করা হয়, তবে ইহা এর তলদেশে গিয়ে পড়তে সত্তর বৎছর সময় লেগে যাবে। যেমন– এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর একটি বিখ্যাত হাদীস, যেমন :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيُّ الْجَعْفِي عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا مِنْبَرُ الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَتَهْوٰى فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا۔(ترمذى جلد الثانى صفه صفة الجهنم)

অর্থ : উৎবা বিন গাজোয়ান (রা) বলেন যে, আমরা একটি সভার উচ্চ আসনে অবস্থানরত ছিলাম, যে উচ্চ আসনটি এই বস্‌রা শহরের একটি উচ্চ আসন, সেখানে অবস্থান করে মহানবী (সা) বলেছেন যে, নিশ্চয় জাহান্নামের গর্তগুলো এতোই বিশাল যে, যদি তার মধ্যে একটি বিশাল পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তবে ইহা, ইহার তলদেশে গিয়ে পড়তে সত্তর বৎছর সময় লেগে যাবে। (তিরমিযী হা/২৫৭৫, ২য় খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা ছিফাতুল জাহান্নাম।)

উপরোক্ত হাদীসটির সত্যতা প্রমাণের পক্ষে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সূর্য হচ্ছে একটি বিশাল অগ্নিপিণ্ড ইহার দিকে লক্ষ্য করলে অনেক কালো কালো দাগ দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সূর্যের মধ্যে ইহা কোনো দাগ নয়, বরং এরা হচ্ছে সূর্যের মধ্যে অনেক বিশাল বিশাল আগুনের গর্ত, যার একটি আগুনের গর্তে আমাদের এই পৃথিবীর মতো চারশত পৃথিবী একত্র করে বল বানায়ে নিক্ষেপ করা যাবে। এতে সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নামের অসংখ্য গর্তের মধ্যে কোনো একটি আগুনের গর্তে তো সূর্যের মতো কোনো বস্তুকে নিক্ষেপ করা যাবেই। কারণ মহান আল্লাহ পাকের সাতটি জাহান্নামের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে জাহান্নাম, সেটাও সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বিশাল। সূর্য তার উক্ত আগুনের গর্ত হতে প্রতি সেকেন্ডে চল্লিশ কোটি টন করে হাইড্রোজেন গ্যাস অনেকটা বমি করে দেয়ার গুলটার মতো করে মহা আকাশে খুব বেগে নিক্ষেপ করছেন। তেমনি মহানবী (সা) তার বিশেষ হাদীসে বলেছেন, জাহান্নামও প্রতি পলকে পলকে তার আগুনের গর্তগুলো হতে সূর্যের মতো বিশাল বিশাল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অনেকটা বমি করে দেয়ার গুলটার মতো করে খুব বেগে নিক্ষেপ করছে যা সত্তর হাজার ফেরেশতাবর্ষ মাইল দূর হতে দেখা যাবে। জাহান্নামের প্রতিটি গর্তের আগুন গরম হতে হতে এমনি গরম হয়ে একেবারেই কালো হয়ে গেছে এবং সেই কালো আগুনের শিখার তেজ খুব বেগে সত্তর হাজার ফেরেশতাবর্ষ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠে গেছে, যাকে সত্তর হাজার ফেরেশতাবর্ষ মাইল দূর হতে দেখা যাবে এবং এর শব্দ শোনা যাবে।

এমনি বিশাল জাহান্নামকে পাটের ফেওয়ার মতো খাবার দিলে চলবে না বরং জাহান্নামকে তার উপযোগী শক্ত খাবার দিতে হবে, তাই মহান আল্লাহ পাক জাহান্নামবাসী কাফিরদের দেহকে বিশাল ও শক্ত করে, জাহান্নামকে খাবার দিবেন। তাই এ সম্পর্কে মহানবী (সা) একটি বিশেষ হাদীস বলেছেন। যেমন–

حَدَّثَنَا مَصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ
هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلَ اُحُدٍ ـ(ترمذى جلد الثانى صفه صفة الجهنم)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, জাহান্নামের এক একজন কাফিরের দাঁত হবে, এক একটি উহুদ পর্বতের মতো।

(তিরমিযী হা/২৫৭৯, ২য় খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা, ছিফাতুল জাহান্নাম।)

তাহলে ভেবে দেখা যায় যে, একজন জাহান্নামবাসী কাফিরের মুখের বত্রিশটি দাঁতের মধ্যে এক একটি দাঁত যদি উহুদ পর্বতের মতো হয়, তবে তার মুখ ও দেহ কত বড় ও কত শক্ত। তা হলে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্ পাক যেমন খেঁকো (জাহান্নাম) সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার খাবার (কাফির) সৃষ্টি করেছেন। আমরা এক লুকমায় যতটি চাউল (ভাত) খাই, অনেকটা তেমনি করে মহান আল্লাহ্ পাক, ততটি কাফির একত্র করে এক লুকমা হিসাবে জাহান্নামের এক এক আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করে দোযখে শাস্তি দিবেন। যেমন– এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔

অর্থ : কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।

(সূরা যুমার : আয়াত-৭১)

অর্থাৎ কাফিরদেরকে ভাতের লুকমার মতো একত্র করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এবং এভাবেই তাদের সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করতে হবে, যার ক্ষণকাল তাদের নিকট কোটি কোটি বৎছর মনে হবে। এ ধারা তাদের অনন্তকাল অব্যাহত থাকবে ইহা জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির কারণেই অনুভব হবে।

উপরে বলা হয়েছে যে, এক জাহান্নাম হতে অন্য এক জাহান্নামের দূরত্ব সত্তর হাজার ফেরেশতাবর্ষ মাইল, তাহলে একজন ফেরেশতার পক্ষে এক জাহান্নাম হতে অন্য দোযখে যেতে সত্তর হাজার বৎছর লাগার কথা। কিন্তু দেখা যায় যে, একজন ফেরেশতা প্রতি পলকে পলকে এক জাহান্নাম হতে অন্য দোযখে যাতায়াত করতেছে, এটা কিভাবে সম্ভব, এটাই এখন জানার বিষয়, এর সঠিক উত্তর বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিখ্যাত বিস্ময়কর সূত্র $E=MC^2$ এর মাধ্যমে দেয়া যায়, যেমন– তিনি তার এই সূত্রের সাহায্যে বলেছেন যে, কোনো বস্তুকে আলোকের গতিবেগে ছুটালে, বস্তুটি তখন প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তর হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, ফেরেশতাদের স্বাভাবিক গতি প্রতি সেকেন্ডে 1674×10^{23}

মাইল। যখন ফেরেশতারা প্রতি সেকেন্ডে এই গতিবেগে ছুটে, তখন উক্ত সূত্র অনুযায়ী ফেরেশতাদের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 1674×10^{23} এর স্থলে $(1674 \times 10^{23} \times 9 \times 10^{20}) = 15066 \times 10^{43}$ হয়ে যায়, যা ফেরেশতাদের প্রতি সেকেন্ডে অস্বাভাবিক গতি নামে পরিচিত। অর্থাৎ ফেরেশতাদের অস্বাভাবিক গতি প্রতি সেকেন্ডে 15066×10^{43} মাইল। অর্থাৎ ফেরেশতাদের অস্বাভাবিক গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 150660, 0000000, 0000000, 0000000, 0000000, 0000000, 0000000, মাইল অর্থাৎ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত ষাট কোটি × কোটি × কোটি × কোটি × কোটি × কোটি মাইল। তাই ফেরেশতারা প্রতি পলকে পলকে এক জাহান্নাম হতে অন্য দোযখে যাওয়া আসা করতে পারে।

সম্ভব্য প্রতি সেকেণ্ডে ফেরেশতাদের এই অস্বাভাবিক গতি দেখেই মহানবী (সা.) তাঁর মেরাজ ভ্রমণ করেছিলেন বলে তাই তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের দিদার লাভ, আরশ-কুরছি, লাওহে-কলম, বেহেশত-জাহান্নাম পরিদর্শন ছাড়াও আল্লাহ্ পাকের আরো অসংখ্য বিশাল বিশাল লীলাভূমি তার পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে দর্শন করা সম্ভব হয়েছিল।

পবিত্র কুরআন তার বাস্তব প্রমাণ। যেমন– لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى
অর্থাৎ এটা (মে'রাজ) এজন্যে যে, আমি আমার নিদর্শনবলির কিছু তোমাকে দেখাই। (সূরা ত্বোয়া-হা : আয়াত-২৩)

যত সব অসম্ভব, আল্লাহ্ পাকের কাছে সম্ভব। আল্লাহ্ পাকের কাছে অসম্ভব বলতে কিছু নেই।

৩৯. ধ্যান

MEDITATION

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোনো মানুষ যদি তার মনকে চিন্তামুক্ত রেখে জোড়াসনে বসে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন কিছু কিছু সময় করে তার মন মতো কোনো উপকরণকে স্থির করে মনের মধ্যে তার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করে, তবে তার রক্তচাপজনিত রোগ ও হার্ড এটাক বা হৃদরোগ সেরে যাবে। যদি তার উক্ত দু'টি রোগ না থাকে তবে তার এই ধ্যান করার কারণে উক্ত দু'টি রোগ তার জীবনে কখনও হবে না। (জনকণ্ঠ ৮-১০-০২ ইং বিদেশী পত্রিকা হতে)

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই তাঁর উম্মতগণকে নামাযী নিয়মে মনের মধ্য হতে সকল শয়তানী চিন্তা দূর করে, মনের মধ্যে আল্লাহ পাকের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে আল্লাহ পাকের প্রতি ধ্যান বা ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এতে আল্লাহ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আল্লাহ পাক খুশী হলে তার উপর হতে সকল শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের রহমতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেলে তার দেহের রক্তচাপ ও হৃদরোগ অবশ্যই সেরে যাবে। অর্থাৎ নামাযের বিকল্পই হচ্ছে বর্তমান বিজ্ঞানীদের জোড়াসনে চোখ বন্ধ করে ধ্যান।

এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ ـ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ـ (متفق عليه)

অর্থ : উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, একদা আমরা (কয়েকজন সাহাবী) মহানবী (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমনি মুহূর্তে এক আগন্তুক এসে উপস্থিত হলেন। এবং বললেন, হে মহানবী (সা)! আমাকে ইহসান সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন মহানবী (সা) বললেন, ইহসান হচ্ছে আল্লাহ পাকের এমন এক ইবাদত এবং সেই ইবাদত এমনভাবে করবেন যে, যেন আপনি আল্লাহ পাককে দেখতেছেন। আর

যদি আপনি উক্ত ইবাদত বা ধ্যান করার সময় আল্লাহ পাককে দেখতে না পান, তবে আপনি ধারণা করবেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে দেখতেছেন। (বুখারী হা/৪৭৭৭, মুসলিম/১০২)

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলছেন, তার মন মতো কোনো প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে চোখ বন্ধ করে, ধ্যান করলে রক্তচাপ ও হার্ডএটাক রোগ সেরে যাবে এবং মহানবী (সা) তাদের বহু পূর্বে বলে গেছেন যে, আল্লাহ পাকের প্রতিচ্ছবি মনে নিয়ে নামায পড়লে বা ধ্যান করলে তার যাবতীয় রোগ সেরে যাবে।

সুন্নতে রাসূল (সা) ও আধুনিক ধ্যান বিজ্ঞান

ধ্যান হচ্ছে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা এবং চিন্তা শক্তিকে এক জায়গায় সমন্বিত করা। রাসূল (সা) নবুওয়াত পাওয়ার আগে হেরা গুহায় পর্যায়ক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত ধ্যান করতেন। সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রচার প্রসারের মূলে রয়েছে এই ধ্যান।

এক ঘণ্টা মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা ষাট (৬০) অথবা সত্তর (৭০) বছর নিরহংকার বন্দেগীর চেয়ে উত্তম।

(নুবাহাতুল মাজালিস)

ইব্রাহীম (আ) মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। এর ফলে মহান আল্লাহ তাঁর জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেন। মহান আল্লাহর কুদরত এবং বিচিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সুফীগণ মনের শান্তি অর্জনের জন্য ধ্যানকে যতোটা ব্যবহার করেছেন অন্য কিছুকে এতোটা ব্যবহার করা হয়নি।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজগত শান্তির সন্ধান করছে। নানা রকম ওষুধ এবং বিলাস সামগ্রী ব্যবহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক শান্তি লাভ করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, বিশ্বজগত যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এসব কিছুর মধ্যে শান্তি রাখেননি বরং তিনি তাঁর স্মরণের মধ্যেই শান্তি রেখেছেন। যারা মহান আল্লাহর স্মরণে নিজেদের নিবেদিত করেছে এবং আউলিয়ায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করে ধ্যানের আশ্রয় নিয়েছে তারা শান্তি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও শান্তি পাবে।

মোরাবাকা হাউস

ইউরোপ বস্তুগত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উন্নতি অগ্রগতি লাভ করার পর বর্তমানে আত্মার শান্তির সন্ধান করছে। ইউরোপের সকল বড় বড় শহরে মোরাবাকা হাউস স্থাপন করা হয়েছে। যেসব ধ্যান হাউসে ডলার পাউন্ডের বিনিময়ে মানুষ শান্তির সন্ধানে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলে কিছুক্ষণ উহ্! আহ্! করে। নানা রকম শব্দ উচ্চারণ করা হয় এবং চোখ বন্ধ করে রাখার অনুশীলন করানো হয়। নিজের দেহকে শিথিল করে বসতে বলা হয়। যেসব শব্দ শিক্ষা দেয়া হয় বিশ্বের যাবতীয় চিন্তা মন হতে মুছে ফেলে সেসব শব্দ উচ্চারণ করতে বলা হয়।

নামায কি ধ্যান নয়? নামাযের খুশু খুজু কি ধ্যান নয়? মহান আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধ্যান করা কি ধ্যান নয়? ইসলামের সকল ব্যবস্থাই হচ্ছে ধ্যানের আরেক নাম।

ইউরোপের মানুষ বস্তুগত ক্ষেত্রে চূড়ান্ত উন্নতি অগ্রগতি সাধনের পর অশান্তির তিক্ততা অনুভব করেছে। বর্তমানে শান্তির আশায় তারা পুনরায় ইসলামের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

ধ্যানের মাধ্যমে চিকিৎসা

ধ্যানকে এক কথায় একাগ্রতা নামে অভিহিত করা যায়। ধ্যান শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষ ধর্মীয় নেতাদের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু বর্তমানে ধ্যান একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দে পরিণত হয়েছে। উন্নত বিশ্বে মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য ধ্যানের মাধ্যমে চিকিৎসা করে ব্যাপক উপকার পাওয়া গেছে। ধ্যানকে আপনি মস্তিষ্ক এবং দেহের সংযোগ বলতে পারেন। উচ্চ রক্তচাপের রোগীগণ ধ্যান করে উপকার পেয়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমেরিকায় রোগীদেরকে ওষুধ খাওয়ানোর আগে ধ্যানের পরামর্শ দেয়া হয়। ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে মানসিক রোগের এবং শারীরিক রোগের ওষুধের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণেও অনেকে ধ্যানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে ধ্যানের মাধ্যমে চিকিৎসার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে সে তুলনায় ধ্যানের মাধ্যমে চিকিৎসার প্রচলন আশানুরূপ নয়।

ধ্যানের মাধ্যমে আত্মসচেতনা বৃদ্ধি পায়। ধ্যানে যেসব নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে বিশেষ কোনো জিনিসের প্রতি কমপক্ষে আধঘণ্টা মনযোগ নিবদ্ধ রাখা, কিংবা কোনো শব্দ বা কথা বারবার উচ্চারণ করা। এতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার শরীর শিথিল হয়ে যাবে, উচ্চরক্তচাপ কমে যাবে, আপনি নিজেকে প্রফুল্ল এবং ভারমুক্ত মনে করবেন। একই সাথে আপনার মনে গভীর শান্তি অনুভূত হবে। আপনার মনে হবে যে, আপনি শান্তিপূর্ণভাবে সময় অতিবাহিত করছেন।

ধ্যানের উপকারিতা

ধ্যান মানুষের মধ্যে সজীবতা, প্রাণবন্ত অবস্থার অনুভূতি সৃষ্টি করে। অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধ্যানের শরণাপন্ন হতে হবে। যারা ধ্যান সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তারা এর বিস্ময়কর উপকারিতা লক্ষ্য করেছেন। তারা দেখেছেন যারা ধ্যান অনুশীলন করে তাদের জীবনে আসে শৃঙ্খলা, দেহে আসে শক্তি সামর্থ, পানাহারে আসে রুচি এবং নিয়মতান্ত্রিকতা, পেশাবের ইনফেকশন দূর হয়, কোলস্টরেল ঘাটতি দেখা যায় না, নেশার অভ্যাস থাকে না, মানসিক চাপ হতে তারা মুক্ত থাকে, ক্যান্সারের মতো রোগের আক্রমণ হতে তারা থাকে নিরাপদ।

আমেরিকার হাসপাতালে গবেষণা

আমেরিকার একটি বৃহৎ হাসপাতালে ৯ হাজার রোগীকে ধ্যান করানো হয়েছে। এ সকল রোগীদের মধ্যে এইডস এর রোগী এবং সন্তান না হওয়া মহিলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধ্যানের অনুশীলন সেশন শেষ হওয়ার পর দেখা গেছে ৩৬ শতাংশ মহিলা গর্ভবতী হয়েছে এবং অন্য সকল রোগীদের সবাই শারীরিক মানসিক শান্তি অনুভব করেছে।

যারা বছরের পর বছর ধ্যান করে তাদের দেহে ডিএইচ ই এ হরমোন সাধারণ লোকদের চেয়ে বেশি থাকে। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব দেহে এই হরমোনের ঘাটতি দেখা দেয়। এই শ্রেণীর লোক খুব কমই অসুস্থ হয় এবং হৃদরোগ হতে মুক্ত থাকে।

মানসিক রোগের চিকিৎসা

উন্নত বিশ্বে বহু চিকিৎসক তাদের রোগীদেরকে ধ্যানের প্রতি আকৃষ্ট করছেন। এতে রোগীগণ খুব কম সময়ের মধ্যে ব্যথা বেদনা হতে মুক্তি লাভ করে। জখম হওয়া রোগীগণ ধ্যানের মাধ্যমে খুব কম সময়ে সুস্থ হয়ে উঠে।

শারীরিক সুস্থতার জন্য দেহে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকা অপরিহার্য। স্বাভাবিক রক্ত চলাচল দেহে অক্সিজেনের অভাব পূরণ করে এবং রোগের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। অসুস্থতা, জখম, ভয়, অস্থিরতা, মানসিক চাপ, ক্রোধ ইত্যাদির কারণে দেহে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয়। দেহের হাড় স্বাভাবিক পুষ্টি পায় না। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক না হলে রোগীর মনে এ ভয় ঢুকে যায় যে, আমি কখনো সুস্থ হবো না। ধ্যান রোগীর মন হতে এসব অমূলক আশঙ্কা দূর করে এবং রোগীর দেহমনে শান্তি এনে দেয়। তার দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। মানসিক রোগের রোগীগণও ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির অনুভূতি লাভ করে এবং সুস্থ বোধ করতে থাকে।

ধ্যান মানুষের কাজের ইচ্ছা এবং আগ্রহ বৃদ্ধি করে। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে বছরে ১০ দিন ধ্যান করুন। অচিরেই আপনি এর সুফল অনুভব করতে সক্ষম হবেন। এই ১০ দিনের ধ্যানে একঘণ্টা নিশ্চল নির্জীব হয়ে বসে থাকতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা

মানসিক চাপের রোগীদের উপর ধ্যানের অনুশীলন করা হয়েছে। এই শ্রেণীর রোগীগণ নেতিবাচক চিন্তার কারণে মানসিক চাপ বাড়াতে থাকে। কেউ যদি নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করে এবং বিশেষ কোনো বিষয়ে মনযোগকে কেন্দ্রীভূত করে তাহলে সে মানসিক শান্তি লাভে সক্ষম হবে। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

বিশেষজ্ঞগণের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কেউ যদি ধ্যান করে তাহলে অস্থিরতা, ভয়-ভীতির অনুভূতি কমে যায়। ধ্যানের শক্তি মানসিক চাপের রোগীদের সুস্থ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ শক্তি বৈজ্ঞানিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপনি যদি আকস্মিক দুর্ঘটনা বা আকস্মিক কোনো কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তখন আপনার

মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে এডরেনাল গ্লান্ডকে হরমোন সরবরাহ করার জন্য ইঙ্গিত দেয়। এতে আপনার মন ভারী হয়ে যায়, রক্ত চলাচল বেড়ে যায়, নিঃশ্বাস বড় হয়ে যায়, নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়, দেহের হাড়ে খিঁচুনি দেখা দেয়, রক্ত চলাচল কমে যায়, আপনি ঘেমে একাকার হয়ে যান। মস্তিষ্ক যখন শান্ত থাকে তখন দেহও থাকে শান্ত। মস্তিষ্ক শান্ত থাকলে মনের ভেতরের যুদ্ধ থেমে যায়। আপনি যদি ধ্যানে অভ্যস্ত হন তাহলে উপরোক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে খুব শীঘ্র নিজের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ কাজ খুব সহজ

ধ্যান কোনো অলৌকিক অপার্থিব বিষয় নয় এবং চিকিৎসার বিকল্প নয়। ধ্যানের মাধ্যমে যৌনরোগ ভালো করা যায় না, শারীরিক রোগের নিরাময়ও ধ্যানের মাধ্যমে সম্ভব নয়। ধ্যানের মাধ্যমে তারাই উপকার পেতে পারে যারা উপকার পেতে চায়। ধ্যানের দ্বারা কারো ক্ষতি হয় না এবং ধ্যানের আমল খুব সহজ। এতে কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। ধ্যানের কোনো সুদূর প্রসারী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। প্রতিষ্ঠিত মানুষ ধ্যান করতে পারে।

প্রতিদিন আপনি বিশ মিনিট করে ধ্যান করুন। এটা আপনার জন্য খুব সহজ হবে। এতে আপনার চিন্তা কেন্দ্রীভূত থাকবে। সমস্যা সমাধানে আপনি শক্তি পাবেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আপনি শান্তিতে থাকবেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে কোনো মানুষ যদি মানসিক চাপের মধ্যে থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম না হয় তাহলে ধ্যানের মাধ্যমে এ দুই সমস্যার সমাধান পাবে। ধ্যান আপনার মনে আনন্দ সঞ্চার করবে। আনন্দের অনুভূতি আপনার মনে জাগিয়ে তুলবে। আনন্দিত হওয়ার মতো কারণ থাকলেই মানুষ আনন্দিত হয়। যেমন ভালো চাকরি পাওয়া ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো জিনিস কিনতে পারা। অকারণ খুশী বা অকারণ আনন্দকে আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন।

আত্মিক পথনির্দেশ

স্বভাব যা প্রকৃতির কাছাকাছি যখন আপনি থাকবেন তখন আপনি আনন্দ অনুভব করবেন এতে আপনি আত্মিক তৃপ্তিও পাবেন। একই সঙ্গে আত্মিক পথনির্দেশ লাভে সমর্থ হবেন।

ধ্যান বা মেডিটেশনের নিয়ম

ধ্যান বা মেডিটেশনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে।

১. সচেতন মনোযোগ

এই ধ্যান আপনাকে শিক্ষা দেবে যে, নানা প্রকার মানসিক চাপের মধ্যে আপনার মস্তিষ্ক এবং দেহ কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। আপনাকে বিছানার উপর বা চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসতে হবে তারপর শ্বাসগ্রহণ বর্জনের প্রতি মনযোগী হউন। দেহ এবং মস্তিষ্কের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। দেখবেন ভয়ের চিন্তা এবং অসন্তুষ্টির চিন্তা আপনাকে কেমন নাখোশ করে সেটা দেখুন। এ পর্যালোচনায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসবে। সচেতনতার বোধ জাগ্রত হবে। আপনি প্রতিটি মুহূর্তকে এসময় উপলব্ধি করুন। দেখবেন আপনি কম হাসবেন এবং কম কথা বলবেন। যৌনতায় অধিক মনযোগী হবেন। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এই ধ্যানে মানুষের মন থাকে শান্ত এবং তারা ঝগড়া বিবাদ হতে নিজেকে দূরে রাখে। হঠাৎ করে ক্ষেপে যাওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

২. পায়চারির মাধ্যমে ধ্যান

ধীরে ধীরে হাঁটুন এবং সোজা পথে পায়চারি করুন। পথের সীমানা নির্ধারণ করবেন প্রায় ২০ ফুট। নিশ্বাস গ্রহণ এবং অনুভূতির প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করুন। ধীরে ধীরে পা তুলুন এবং মাটিতে রাখুন। চুপচাপ থাকুন। এতে আপনার উচ্চ রক্তচাপ এবং অস্থিরতা কমে যাবে।

৩. সর্বোত্তম ধ্যান

সারাদিন কাজের ক্লান্তি এবং মানসিক চাপ কমানোর জন্য আল্লাহ্ যিকির হিসেবে আল্লাহু আকবর, ইয়া কাইউমু অথবা হে আল্লাহ! দয়া করো-এর যে কোনো একটি কথা নীরবে বা উচ্চস্বরে পনের হতে বিশবার লাগাতার পাঠ করুন। দিনে কয়েকবার এই আমল করুন। এতে আপনার দেহের সকল তৎপরতা শান্ত হয়ে যাবে এবং আপনি সারাদিন ভালো মুডে থাকবেন।

৪. চিন্তার একাগ্রতা

শারীরিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে আপনার মস্তিষ্ককে সঙ্গতিপূর্ণ করুন। আপনার দৈহিক ওজন কমান। এতে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহ স্থবির হয়ে যাবে। আপনি চিন্তা করতে থাকুন যে একটি সাদা আলো আপনার

মাথা হতে পায়ের দিকে আসছে। আরো চিন্তা করুন সেই সাদা আলো আপনার দেহের প্রতিটি জিনিসকে বিগলিত করে দিচ্ছে। এ সময় মানসিক চাপকে আপনি মনে করুন নিষিদ্ধ বস্তু সেই বস্তু আপনার আঙ্গুল দিয়ে এবং মাথার চুল দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এ সময় নিঃশ্বাসের প্রতি আপনি মনযোগী হউন। আপনি চিন্তা করবেন যে প্রতিটি নিঃশ্বাস আপনাকে সুস্থতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি যে কোনো রকম ধ্যানের অনুশীলন করতে পারেন। অনেককে দেখা যায়, কিছু দিন ধ্যান করার পর ধ্যান ত্যাগ করে। এতে প্রত্যাশিত উপকার পাওয়া সম্ভব হয় না। আপনি আপনার চিন্তাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করুন, দেখবেন ওতে পরিবর্তন আসছে। আপনার মস্তিষ্ক আপনার চিন্তাকে একদিক হতে অন্যদিকে নিয়ে যাবে। মস্তিষ্ককে একটি নির্দিষ্ট চিন্তায় কেন্দ্রীভূত রাখার জন্য অনেক মানুষকে বছরের পর বছর ধ্যান করতে হয়। ধ্যান জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে। ভালোভাবে শিখতে হবে। নামায হচ্ছে ধ্যানের উৎকৃষ্ট প্রাথমিক পদ্ধতি।

৫. কিভাবে ধ্যান করবেন

১. আপনি মেঝেতে বসুন অথবা চেয়ারে বসে পা মেঝেতে রাখুন। এ সময় কোমর সোজা রাখবেন। ঘুমে চোখ জড়িয়ে না এলে ঘুমাতে যাবেন না। ঢিলে ঢালা পোশাক পরিধান করুন।

২. চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস নিন। মনকে বোঝাবেন যে, এ সময়টুকু একান্তই আপনার এবং বিশ মিনিট আপনার নিজস্ব সময়।

৩. দেহকে আরামদায়ক পজিশনে রাখুন। মনে মনে সারা দেহ সার্ভে করুন। বিশেষ করে বুক, ঘাড় এবং চেহারার হাড়ের প্রতি মনযোগী হউন। প্রতিবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় চিন্তা করুন যে আপনার হাড়ের জড়তা কেটে যাচ্ছে। তারপর নিজের দেহের প্রতি মনযোগী হয়ে বলুন, হে হাড়সমূহ! তোমার নিজের অবস্থানে ফিরে আসো।

৪. আপনার কথা এবং চেয়ারের সঙ্গে দেহ সংযুক্ত থাকার অনুভূতির প্রতি কয়েক মুহূর্তের জন্য পূর্ণ মনযোগী থাকুন। আপনার ত্বক যে আপনার পরিহিত পোশাকের স্পর্শ পাচ্ছে সে কথা চিন্তা করুন।

৫. আপনি আপনার মস্তিষ্ককে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করুন। ধ্যানের জন্য ২ বা ৩ সংখ্যাটি স্মরণ করুন। নিঃশ্বাস নেয়ার সময় মনে মনে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত গণনা করুন। একবার শেষ করে আবার শুরু করুন।

৬. চুপচাপ বসুন এবং দেহের কোনো অঙ্গকে নড়াচড়া করাবেন না। দেহের কোনো অঙ্গ স্পন্দিত করার প্রয়োজন দেখা দিলে আপনার শারীরিক অবস্থা উপলব্ধি করুন এবং অপেক্ষা করতে থাকুন। যদি এ সময় মনে হয় যে আপনার বিশেষ কোনো অঙ্গ নাড়াচাড়া না করলে আপনার মৃত্যু হতে পারে, তাহলে আস্তে আস্তে সেই অঙ্গ নাড়াচাড়া করুন। এ সময় আপনার মনযোগ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত রাখবেন এবং মনে অন্য কোনো চিন্তাকে জায়গা দেবেন না। উপরোক্ত ১ এবং ১ নম্বর ধ্যানের অনুসরণে এ ধ্যান আমল করা যায়।

৭. ঘুম পরিহার করুন। কোমর সোজা রাখুন। এ সময় কোনো কিছুতে হেলান বা ভর দেবেন না। কোমর বাঁকা করবেন না। কিছুতেই ঘুমের কথা চিন্তা করবেন না।

৮. ঘড়ির প্রতি চোখ রাখুন এতে আপনি সময় সম্পর্কে ধারণা পাবেন। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে কিনা বুঝতে পারবেন।

৯. নিজের দেহ ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করুন। প্রথমে পা এবং বাহু নাড়াবেন তারপর ধীর ক্রমে হাত পা প্রসারিত করবেন।

ধ্যানের জন্য কিছু নির্দেশনা

১. খালি পেটে ধ্যান করবেন।

২. সকাল বেলা ধ্যানের উত্তম সময়।

৩. ঘুম ঘুম বা তন্দ্রা পরিহার করার জন্য ধ্যান শুরুর আগে হাত পা এবং মুখমণ্ডল ধুয়ে নিন।

৪. জবরদস্তিপূর্ণভাবে এবং বাধ্যতামূলক মনে করে নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব নিয়ে সন্তুষ্টির সঙ্গে ধ্যান করুন।

৫. সঙ্গীতের হালকা সুরের পরিবেশে মোমের আলোর মধ্যে সুরভিত পরিবেশে ধ্যান করা হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

৬. বেশি অস্থিরতা অনুভব করলে এমন ধ্যান করুন যাতে শারীরিক কস্‌রত করতে হয়। যেমন যোগ ব্যায়াম বা কোনো প্রকার খেলা।

৭. ধ্যান শেষ করার ইচ্ছাকে রেখে দিন। পনের বিশ মিনিট যদি অধিক মনে হয় তবে পাঁচ মিনিট দিয়ে শুরু করুন।

ধ্যান চালিয়ে যাবেন। কখনোই বন্ধ করবেন না। সফলতার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি যাচাই করে অনুশীলন করবেন। যদি কোনো শিক্ষাগুরু পেয়ে যান তবে তার শেখানো পদ্ধতি দ্বারা উপকৃত হউন। (বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, ডক্টর খালেদ মাহমুদ)

রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবকালীন সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

রাসূল (সা)-এর জন্মগ্রহণের কিছুকাল আগে হতে মক্কার কিছু লোক মানুষদের চিন্তায় ও কর্মে সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। তারা মানুষদের সৎপথে চলার জন্য উপদেশ দেন, অসৎ পথ হতে, অসৎ কাজ হতে বিরত থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের কথা শোনা পছন্দ করতো না। উপদেশ দানকারীদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতো। এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর মাধ্যমে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হতো, লজ্জা দেয়া হতো। মানুষের কল্যাণকামী একজন লোক সমাজের এরকম বিরুদ্ধ মনোভাব দেখে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ঘাস পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তার এ সাধনার ফলে মহান আল্লাহ তাকে কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেন। তিনি পাখিদের প্রতি তাকালে পাখি মাটিতে পড়ে যেতো। পাথরের প্রতি তাকালে পাথর ঝরে মাটিতে পড়তো। যে কোনো জিনিসের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকালে সে জিনিস ঘায়েল হয়ে যেতো। তার এসব বৈশিষ্ট্যের সুখ্যাতি চারদিকে জানাজানি হয়ে গেল। মক্কার লোকেরা তার নিকট আসতে শুরু করলো। এ সময় মক্কায় রাসূল (সা) নবুওয়াতের কথা ঘোষণা করলেন। কাফেরগণ তাকে কষ্ট দিতে লাগলো এবং এক পর্যায়ে তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করলো। তারা কুরআনের বাণীকে জাদু বলে অভিহিত করতো। মক্কার কুরাইশ নেতাগণ জঙ্গলে নির্বাসিত জীবন যাপনকারী এই লোকটির প্রতি মনযোগী হলো এবং তাকে বুঝিয়ে মক্কায় নেয়ার চিন্তা করলো। তারা কয়েকজন প্রতিনিধি জঙ্গলে পাঠালো।

জঙ্গলে অবস্থানকারী সেই সাধু পুরুষ কুরাইশ নেতাদের প্রতিনিধিদের বললেন ইসলাম প্রচারক যে বাণী প্রচার করেন সে বাণীর কিছু অংশ তোমরা মুখস্থ করে আসবে। আমি ধ্যানে বসবো সে সময় তোমরা সে বাণী বারবার পড়তে থাকবে। আমি ধ্যানের মধ্য হতে যা বলবো সেটাই হবে আমার জবাব। মক্কার প্রতিনিধিদল সূরা কাওছার মুখস্থ করে গেল। তারা পাঠ করে শোনালো 'ইন্না আতাইনা কাল কাওছার ফাছাল্লি

লিরাব্বিকা অনহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার।' এতটুকু পাঠ করার পর সেই সাধক আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'লাইছা হাজা কালামিল বাশার'। অর্থাৎ এ বাণী কোনো মানব রচিত বাণী নয়। মক্কার প্রতিনিধিদল হতাশ হয়ে মক্কায় ফিরে গেল। সেই সাধক পুরুষ বললেন, আমি জানতাম না এক অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানোর জন্য কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। মক্কায় কুরাইশ নেতাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। সেই সাধক পুরুষ নিজের মধ্যে যে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন সেটা ধ্যানের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছিল। (আহওয়ালে ইসলা, কিউজ জ্যাকশন থার্ড)

দ্বীন কি আকলের নাম নাকি নকলের নাম : আধুনিক বিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা

মানুষের আকল বা বিবেক ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু দ্বীনে মোহাম্মদী পূর্ণতাপ্রাপ্ত। মানুষ খুবই দুর্বল জীব। সকল প্রকার জীবন ব্যবস্থা মানুষের পক্ষে জানা এবং বোঝা সম্ভব নয়। তারা একটি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হলেও অন্য বিষয়ে বুঝতে পারে না। তবে কোনো বিষয়ে বোঝার জন্য সচেষ্ট হলে বুঝতে পারে।

মানুষের ইতিহাস পাঠে জানা যায় বহু মানুষ দ্বীনকে বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ বিবেক তাদেরকে সহায়তা করেনি। ফলে তারা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ রোকন অস্বীকার করেছে। অনেকে দ্বীনের বাহ্যিক অবস্থা দেখে দ্বীনকে বোঝার জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু এতে তারা সমর্থ হয়নি। কারণ দ্বীন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণের অন্য নাম। আমি বুঝতে পারি বা না পারি মানুষ যা কিছুই বলুক প্রকৃতপক্ষে কুরআনের এ বক্তব্য মেনে নিতে হবে। (امنا واطعنا)আমান্না ওয়া আ'তানা। আমি বিশ্বাস করেছি এবং মেনে নিয়েছি। বিজ্ঞান ইসলাম সম্পর্কে যে গবেষণা করেছে, গবেষণার যে দ্বার খুলে দিয়েছে এতে পথভ্রষ্ট মানুষদের পুনরায় ইসলামের পথেই ফিরে আসতে হবে। মানুষের প্রথমবারের দেখা ভুল হতে পারে। দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে। যদি আমরা সবকিছু দ্বীনের দৃষ্টিতে দেখতে থাকি তবে যা কিছু দেখা যাবে সবই হবে সত্য।

৪০. ধূমপান

SMOKING

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ধূমপান করলে তামাক পাতার 'নিকোটিন' নামক এক প্রকার বিষ শরীরে প্রবেশ করে। সামান্য পরিমাণ নিকোটিনও যদি নাক ও গলার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে তাহলে এ বিষক্রিয়া আমাদের দেহে পরিলক্ষিত হয়। নিকোটিন ছাড়াও এর মধ্যে মনোক্সাইড ও পাইরিডাইন থাকে। প্রথমটি রক্তের লোহিতকণা নষ্ট করে দেয় ও দ্বিতীয়টি দাঁত কালো করে। এটা আমাদের ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির অশেষ ক্ষতি করে এবং প্রত্যেকটি তন্ত্রের কার্যক্ষমতা খর্ব করে। ফলে দৃষ্টিহীনতা, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, ক্যান্সার প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত তন্ত্রের কার্যক্ষমতা খর্ব করে। ফলে দৃষ্টিহীনতা, কাশি ব্রঙ্কাইটিস, ক্যান্সার প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধূমপান অনেক সময় বমি বমি ভাবের সৃষ্টি করে।

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই যাবতীয় নেশা ও ধূমপান সম্পর্কে নিষেধ করে গেছেন। যেমন–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔

অর্থ : ইবনে ওমর (রা) বলেন যে, আমি মহানবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই হারাম বা নিষিদ্ধ।

(তিরমিযী হা/১৮৬৪, ২য় খণ্ড ৮ম পৃষ্ঠা, কিতাবুল আতআমা।)

৪১. নখ

NAIL

মানুষ তার বিশেষ প্রয়োজনে নানা নাপাক স্থানে তার বাম হাত ব্যবহার করে। এতে তার বাম হাতের নখের চিপায় নানা নাপাক ও নানা রোগের জীবাণু জমা হয়ে থাকে, যা সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুইলেও ইহা নখের চিপা হতে দূর হয় না। যা পরবর্তীকালে আরো নানা জটিল রোগজীবাণুতে পরিণত হয়। যখন মানুষ তার উক্ত নখের দ্বারা নিজের দেহে কিংবা অন্যের দেহে চুলকায়, তখন সেখানে খতের সৃষ্টি হলে, সেখান দিয়ে উক্ত নখের নানা রোগজীবাণু দেহের রক্তে প্রবেশ করে এবং উক্ত রক্তের মধ্যে যতগুলো রোগজীবাণু প্রবেশ করে ঠিক ততগুলো রোগের সৃষ্টি হয় উক্ত মানব দেহে। এছাড়াও মানুষ তাদের খাদ্য সামগ্রী তৈরির সময় উভয় হাত ব্যবহার করে থাকে। এতে তার উক্ত নখের রোগজীবাণু খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশে যায় এবং সেই খাদ্য খেলে সে খাদ্যের মধ্যে যত প্রকার রোগজীবাণু মিশে ঠিক তত প্রকার রোগ দেহে সৃষ্টি হয়। যদিও রান্না করা খাবারে কিছু কিছু রোগজীবাণু রান্নার কারণে ধ্বংস হয়। কিন্তু এমন অনেক রোগজীবাণু আছে যা কখনো আগুনের জ্বালেও ধ্বংস হয় না। যেমন– ক্যান্সারের জীবাণু।

তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা চুলকানোর জন্য হাতের নখের পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেন এবং কোনো খাদ্য দ্রব্য ধরা বা তৈরি করার পূর্বে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোঁয়ার পরামর্শ দেন।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) বর্তমান বিশ্বের সকল স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের প্রায় দেড় হাজার বৎছর পূর্বে পৃথিবীর সকল মানুষদেরকে বলেছেন যে, প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার উভয় হাতের 'নখ' কাটা ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত বা আদর্শ এবং সেই আদর্শই আমি আমার উম্মতের জন্য আমার সুন্নাত বা আদর্শ হিসেবে রেখে গেলাম, যে আমার সুন্নাত বা আদর্শকে ভালোবাসবে বা পালন করবে, কাল হাশরে সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে। যেমন– এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করা হলো :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلْاِخْتِتَانُ ـ وَالْاِسْتِحْدَادُ ـ وَقَصُّ الشَّارِبِ ـ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ ـ وَنَتْفُ الْاِبِطِ ـ (نسائى صفحة جلد اول كتاب الطهارة صفه)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, ফিৎরাতে ইব্রাহীম (আ) অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ)-এর আদর্শ হচ্ছে পাঁচটি ১. খাতনা, ২. মেয়েদের নাক, কান ছিদ্র করা ৩. গোঁফ কাটা ৪. হাত-পায়ের আঙ্গুলের নখ কাটা ৫. বগল তলের পশম তুলে ফেলা ।

(নাসায়ী হা/৯, ১ম খণ্ড, কিতাবুত তাহারাত পৃষ্ঠা নং ৭)

৪২. নিঃশ্বাস

BREATHING

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকারক, যদি ইহা কোনোভাবে মানব দেহে প্রবেশ করে, তাহলে মানব দেহে নানা রোগের সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে । তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যতদূর সম্ভব উক্ত বিষাক্ত গ্যাস হতে দূরে থাকার চেষ্টা করা । অর্থাৎ কোনোভাবেই যেন ইহা আর দেহে প্রবেশ না করতে পারে । সে দিকে প্রত্যেকেরই সজাগ থাকা উচিত ।

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বে উক্ত বিষাক্ত গ্যাস হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্ক করে হাদীস বলে গেছেন । যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ ـ(بخارى شريف كتاب الاشرب)

অর্থ : কাতাদাহ (রা) তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তরল জাতীয় কিছু পান করবে, তখন অবশ্যই তোমরা সতর্ক থাকবে যে, উক্ত পানকৃত পাত্রের মধ্যে যেন কোনোভাবেই তোমাদের নাকের নিঃশ্বাস না পড়ে ।

(বুখারী হা/১৫৩, কিতাবুল আশরাবা)

৪৩. নাকে পানি

WATER IN NOSE

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আমাদের চার পাশের শহরে বন্দরের রাস্তা ঘাট ও নর্দমার ময়লা আবর্জনার যত গলিজ পদার্থের রোগজীবাণু আছে, তার সবগুলোই আমাদের চারপাশের গাছপালা ও বায়ুমণ্ডলের পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো আবার আমাদের চারপাশের রাস্তা ঘাটের সকল চলমান যানবাহনের কাল ধোঁয়া ও ধুলি বালির সাথে মিশে আমাদের নাকের ছিদ্র পথের টিউব দিয়ে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে মস্তিষ্কে ও দেহে প্রবেশ করে। ইহাদের কিছু কিছু সেখানে ধ্বংস হয়। আর কিছু কিছু দেহের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাথে মিশে আমাদের প্রশ্বাসের সাথে বের হয়ে আসে এবং উক্ত জীবাণুসমূহ এইভাবে শ্বাস প্রশ্বাসে আসা যাওয়ার ফলে আমাদের নাকের ছিদ্রপথের টিউবটির ভেতরের চার পাশে উক্ত জীবাণুসমূহ দ্বারা আঠালো আবরণ পড়তে থাকে, এইভাবে কিছুদিন পড়লে নাকের উক্ত ছিদ্র পথের টিউবটি সংকোচিত হয়ে যায়, ফলে আমাদের শ্বাস কার্যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এতে বুকে ও ফুসফুসে চাপের সৃষ্টি হয় এবং দেহের অস্থিরতা বেড়ে যায়, এতে মস্তিষ্কে যে সকল রোগ জীবাণুগুলো ধ্বংস না হয়ে সেখানে অবস্থান করছে সেগুলো আবার সেখানে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, ফলে মাথা ব্যাথা, মাথা ধরা, মাথা জ্বালা, মাথা গরম ও মাথা ভনভন রোগের সৃষ্টি হতে থাকে। এভাবে দীর্ঘদিন হতে থাকলে অবশেষে ব্রেইন স্ট্রোক অথবা ব্রেইনে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

এছাড়াও নাকের ছিদ্রপথের টিউবের ভেতরের চারপাশের উক্ত দেহের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সাথে মিশ্রিত উক্ত রোগ জীবাণুর যাবতীয় আঠালো আবরণের দ্বারা উক্ত নাকের ছিদ্রপথের টিউবটি নষ্ট হতে থাকে, যার ফলে মুখে, মাথায় ও গলায় টিউমারের সৃষ্টি হতে থাকে এবং এর দ্বারা নাকে ছিদ্রপথের টিউবে ও ইহার দ্বারা সৃষ্ট টিউমারে ক্যান্সার পর্যন্ত হয়ে যায়।

তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, উপরোক্ত রোগ জীবাণু হতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাঝে মাঝে চিকিৎসক দ্বারা নাকের ছিদ্র পথের টিউবটি পরিষ্কার করে রাখা অথবা প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মুখ ধৌত করার সময় হাতের আঙ্গুল সম্ভাব্য পরিমাণ নাকের ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে দিয়ে

ভালো করে পানি দ্বারা ইহার যাবতীয় ময়লা পরিষ্কার করা এবং নাকের মধ্যে পানি দিয়ে সেই পানি নাকের নিঃশ্বাসে টেনে মস্তিষ্কে উঠায়ে আবার ইহাকে নিঃশ্বাসের বেগে বের করে ফেলে দেয়া, এতে নাকের ছিদ্রপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং মস্তিষ্ক হতে যাবতীয় রোগজীবাণুগুলো বের হয়ে আসে যার ফলে নাকের শ্বাস কার্যে কোনো সমস্যা হয় না এবং মাথার মধ্যেও কোনো রোগের সৃষ্টি হয় না। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, নাকের শ্বাস কার্যে পানি টেনে মস্তিষ্কে উঠায়ে আবার ইহা জোরে ছেড়ে বের করে ফেলে দিলে, এতে নাকের ছিদ্রপথ কখনও সংকুচিত হয় না। অর্থাৎ এর দ্বারা নাকের ছিদ্রপথ স্বাভাবিক ও সতেজ এবং কর্মক্ষম থাকে। এবং এর দ্বারা হৃদযন্ত্রও স্বাভাবিক থাকে। অর্থাৎ নাকের সাহায্যে পানি টেনে উঠায়ে আবার ইহা জোরে ফেলে দেয়ার সময় হৃদযন্ত্রে যে ঝাঁকি লাগে ইহা হৃদযন্ত্রকে স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে তাদের প্রত্যেক গোসলে নাকে পানি দিয়ে সম্ভাব্য পরিমাণ আঙ্গুল নাকের ছিদ্র পথে ঢুকিয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করাকে ফরয বা অত্যাবশ্যক করার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং তিনি নাকে পানি দিয়ে সেই পানিকে নাকের নিঃশ্বাসের সাথে টেনে এনে মস্তিষ্কে উঠায়ে আবার বেগে প্রশ্বাসে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং এছাড়াও তিনি মানুষের প্রত্যেক অজুতে নাকে পানি দিয়ে সম্ভাব্য পরিমাণ নাকের ছিদ্র পথে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য সুন্নাত বা তাঁর আদর্শ বলে ঘোষণা করে গেছেন। এবং অজুর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে এর নিঃশ্বাসের সাথে উক্ত পানি মস্তিষ্কে টেনে উঠানোকেও তাঁর সুন্নাত বা আদর্শ বলে ঘোষণা করে গেছেন। যেমন উক্ত আলোচনা সম্পর্কে নিম্নে তার কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হলো :

اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مُعِنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاءَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ۔

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে মহানবী (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ অজু করতে শুরু করবে, তখন অবশ্যই নাকে পানি দিবে, তারপর অবশ্যই নাক ভাল করে পরিষ্কার করবে।

(নাসায়ী হা/৮৬, ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত।)

اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ ابْنِ صُبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ.

অর্থ : লাকিত ইবনে ছুবরা (রা) তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, আমি একদিন মহানবী (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে অজু সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দেন। তখন মহানবী (সা) বললেন, পরিপূর্ণ অজু হচ্ছে, অজু করার সময় নাক ভালো করে পরিষ্কার করার পর নাকে পানি দিয়ে সেই পানি নাকের সাহায্যে টান দিয়ে মস্তিষ্কে উঠায়ে আবার সেই পানি জোরে ছেড়ে ফেলে দেয়া।

(নাসায়ী হা/৮৭, ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত)

উপরোক্ত দু'টি হাদীসের আলোকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রতিদিন একজন মানুষ যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অজুর সময় ভালো করে পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করে তারপর নাকে পানি দিয়ে সেই পানি নাকের নিঃশ্বাসের সাহায্যে মস্তিষ্কে উঠায় আবার উক্ত পানি ছেড়ে দেয়, তবে তার কখনও মাথায় কোনো রোগ বা সমস্যার সৃষ্টি হবে না। কারণ এর দ্বারা মস্তিষ্কে জমাকৃত সকল রোগ জীবাণু বের হয়ে আসে। ফলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে যার ফলে মস্তিষ্ক সতেজ ও সক্রিয় থাকে সেজন্যই মাথায় কোনো সমস্যা হয় না। এবং মাথা স্বাভাবিক থাকে। এছাড়াও মহানবী (সা) প্রত্যেক গোসলে নাকে পানি দিয়ে নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য এবং নাকে পানি দিয়ে সেই পানি নিঃশ্বাসে টেনে মস্তিষ্কে উঠায়ে আবার একে জোরে ছেড়ে ফেলে দেয়াকে ফরয বা অত্যাবশ্যক করে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমন তাঁর একটি হাদীস :

عَنْ اِبْنِ اَبِيْ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهٖ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْكَفَ ثَلٰثًا وَالْاِسْتِنْشَاقَ عِنْدَ الْغُسْلِ.

ইবনে আবি আওস (রা) তার দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, আমি রাসূল (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি গোসলের সময় অবশ্যই নাকে হাত দিয়ে তিন বার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করতেন এবং সেই পানি নিঃশ্বাসে টেনে মস্তিষ্কে উঠায়ে আবার ইহাকে জোরে ছেড়ে বের করে দিতেন। (নাসায়ী হা/৮৩. ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত।)

৪৪. নগ্ন
NAKEL

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যারা উলঙ্গ হয়ে গোসল করে এবং রাত্রিকালে উলঙ্গ হয়ে বিছানায় ঘুমায় এবং স্বামী-স্ত্রী একত্র হয়। তাদের অবশ্যই মৃত্যুকালে কষ্ট হবে এবং বহুদিন বিছানায় শুয়ে ভুগে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল মানুষদেরকে বলেন যে, তারা যেন কখনও শুধু পায়খানা পেশাবের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ছাড়া তাদের জীবনের সমস্ত কাজকর্ম করার সময় যেন কখনও উলঙ্গ না হয়।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই শুধু পায়খানা পেশাবের প্রয়োজনীয় অংশ ছাড়া পৃথিবীর সকল মানুষদেরকে উলঙ্গ হতে কড়া নিষেধ করে গেছেন। এবং তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ফরয করে গেছেন। এবং তিনি এ ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষদেরকে সতর্ক করে বলে গেছেন যে, তোমরা কখনও তোমাদের কোনো কাজে পরস্পর উলঙ্গ হবে না। যদি তোমরা পরস্পর উলঙ্গ হও তবে তোমাদের মধ্য হতে আল্লাহ পাকের রহমতের ফেরেশতা চলে যাবে এবং তখন তোমাদের উপর আল্লাহপাকের গজব পতিত হবে।

মহানবী (সা) তাঁর জীবনে কখনও উলঙ্গ হননি, তাঁর জীবনের কোনো এক সময় হঠাৎ তাঁর লুঙ্গির কাপড় তাঁর হাঁটুর উপর উঠে যায়, তখন এতেই তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আল্লাহপাকের দরবারে বহুবার দোয়া-এস্তেগফার পাঠ করেন। এছাড়া যখন তিনি পায়খানায় যেতেন, তখন তিনি তাঁর লজ্জাস্থানের কাপড় ঐ সময় উঠাতেন, যখন তার লজ্জাস্থান

একেবারে মাটির অতি নিকটবর্তী হতো। এবং এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস নিম্নে প্রদান করা হলো :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوْ مِنَ الْاَرْضِ۔

অর্থ : আনাস (রা) বলেন যে, মহানবী (সা)-এর অভ্যাস ছিল যখন তিনি পায়খানা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি মাটির অতি নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাপড় উঠাতেন না।

(তিরমিযী হা/১৪, ১ম খণ্ড ৪র্থ পৃষ্ঠা আবুওয়াবুত তাহারাত।)

অতএব, প্রতীয়মান হয় বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা উলঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে যে সতর্ক করছেন, তা মহানবী (সা) তাদের বহুপূর্বেই মুখে বলে ও তাঁর কাজে দেখায়ে এই পৃথিবীর মানুষদেরকে সতর্ক করে গেছেন।

৪৫. নামায

PRAYER TO ALLAH

বিজ্ঞানী ডি. কে. ম্যাথিউস বলেছেন, শারীরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা। অতএব যে কোনো ধরনের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রসূত কাজ কর্মের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতাকেই শারীরিক শিক্ষা বলে। তবে সে সব কাজকর্ম অবশ্যই স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী এবং নির্মল আনন্দদায়ক হতে হবে।

অন্য এক শারীরিক বিষয়ের বিজ্ঞানী বলেছেন, শারীরিক শিক্ষার মূলমন্ত্রই হচ্ছে খেলাধুলা। কেননা খেলাধুলা দ্বারা সামাজিকতা, শৃংখলাবোধ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, দেহের সুষম বৃদ্ধি, উন্নতি ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনাদ্বয়ের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নামায হচ্ছে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য এক বিশেষ উন্নতমানের সরঞ্জামবিহীন শারীরিক শিক্ষা বা ব্যায়াম। যা মহানবী মুহাম্মদ (সা) পৃথিবীর সমস্ত শারীরিক বিষয়ের বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বে তার জাতির সামাজিকতা, শৃংখলাবোধ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, দেহের সুষম বৃদ্ধি, উন্নতি ও সংরক্ষণ ইত্যাদি

সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার উম্মতের উপর নামায নামক শারীরিক কার্যকলাপটি ফরয বা অত্যাবশ্যক করে গেছেন।

বিখ্যাত শারীরিক বিষয়ের বিজ্ঞানী ডি. কে ম্যাথিউস বলেছেন, শারীরিক কার্যকলাপের জন্য হতে হবে স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী ও নির্মল আনন্দ। মহানবী মুহাম্মদ (সা) এই বিজ্ঞানীর বহুপূর্বেই নামাযের জন্য স্থান কাল, বয়স ও সহীহ নিয়ত ইত্যাদির বিষয়ে অতি সুন্দরভাবে তাঁর উম্মতের সবাইকে বলে গেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, আমার নামাযই হচ্ছে আমার একমাত্র আনন্দ।

শারীরিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, নামাযের মধ্যে যে রুকূ' করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা শারীরিক শিক্ষার এক প্রকার পায়ের পাতার সন্ধিস্থল ধরে হাঁটার ব্যায়াম। এই ব্যায়ামে মানব দেহের শারীরিক শক্তি ও দৈহিক নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নামাযের রুকূ' করার দ্বারা মানবদেহের শারীরিক শক্তি ও দৈহিক নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং পৃথিবীতে একজন মানুষের সারা জীবনে যত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, বেদনা, রোগ-ভয় ইত্যাদি আছে তার সবগুলোর একমাত্র সমাধান বা মহৌষধ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি খুব ধ্যান খেয়ালে নামায আদায় করা এবং ইহা পরীক্ষিত। মহানবী (সা)-এর জীবনে তাঁর সাহাবীগণ যখন যেকোন মুসিবত বা রোগে আক্রান্ত হতেন তখনি তারা নামাযে দাঁড়ায়ে যেতেন। এবং তাঁরা তার ফলও সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছেন। আপনিও যদি কোনো মুসিবতে বা রোগে আক্রান্ত হয়ে নামায পড়তে থাকেন, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে তার ফল পাবেন। ইনশাআল্লাহ।

নামায এবং শারীরিক সুস্থতা

নামায হচ্ছে একটি উত্তম ব্যায়াম। দুর্বলতা, অলসতা এবং বেআমলের এ যুগে নামাযই এমন ব্যায়াম এবং ক্রীড়াশৈলী যার মাধ্যমে দুনিয়ার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হতে পারে। তবে সেই নামায সঠিকভাবে আদায় করতে হবে।

নামাযের ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য যেমন বজায় থাকে তেমনি হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনি, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, অন্ত্র, মেরুদণ্ড, ঘাড়, বুক এবং সকল প্রকার গ্লান্ড পুষ্টি ও সুস্থতা লাভ করে। নামায দেহকে সুডৌল এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।

নামায এমন একটি ব্যায়াম যার মাধ্যমে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে উঠে। নামাযের মাধ্যমে চেহারার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়।

খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের নানা রকম পদ্ধতি রয়েছে। বড়দের জন্যে এক রকম, ছোটদের জন্যে অন্যরকম, মহিলাদের জন্যে আবার আরেক রকম। কিন্তু নামায এমন একটি ব্যায়াম যা সকলের জন্যে এক সমান। যেকোনো বয়সের মানুষ নারী পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলের জন্যে নামায একই নিয়মে আদায় করতে হয়।

নামায : আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানব স্বাস্থ্য

যেভাবে রাসূল (সা) যাবতীয় আত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যেরও খুব কাছ হতে খুব খেয়াল রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন, এভাবে নামাযও আত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ভূমিকা রাখে।

নামাযের মধ্যে শেফা

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, একবার আমার পেটে ব্যথা হচ্ছিল তখন রাসূল (সা) আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে ইরশাদ করেন, তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন, দাঁড়াও এবং নামায আদায় কর। কেননা নামাযের মধ্যে শেফা (আরোগ্য) রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজা, চিকিৎসা অধ্যায়, খ-২, হাদীস নং ৩৪৫৮)

নবী করীম (সা)-এর বাণী এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, নামায কায়েম করা শারীরিক রোগের জন্যও আরোগ্য তবে শর্ত এই যে, পূর্ণ আদবের সাথে নবী করীম (সা)-এর সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করতে হবে।

নামাযের প্রভাব

নামায দেহ এবং মনের স্বাস্থ্যের রক্ষা ও হিফাযতের ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের প্রভাব রাখে এবং উভয়ের ক্ষতিকর বস্তু বের করে দেয়। দুনিয়াতে যত লোক আছে তার কোনো লোক যখন কোনো রোগ বিপদ ও সমস্যার শিকার হয় এর সঙ্গে নামায আদায়কারীর সংশ্লিষ্টতা কম হতে কম হয়ে থাকে এবং এর শেষ ফল সবদিক দিয়ে সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে।

রোগ হতে মুক্তি

ডাক্তার মুহাম্মদ আলমগীর খানের দৃষ্টিতে, নামায হতে যেমন আত্মিক আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ হয় ঐরূপ দৈনিক স্বাস্থ্যেরও বিষয়াদি মওজুদ আছে। নামাযের আরকান যদি উত্তমভাবে এবং নিয়মমতো আদায় করা যায়, তাহলে এর দ্বারা কয়েক প্রকারের শারীরিক রোগ হতেও মুক্তি অর্জন সম্ভব।

বড় ইহসান

আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের ওপর ফরয করে বড়ই ইহসান করেছেন, নামায যেখানে আমাদের আত্মিক উন্নতি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি দান করে এবং খারাপ হতে ফিরিয়ে পবিত্রতার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করায়, অনুরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও নামায সাহায্যকারী বটে। শরীরকে দুরস্ত রাখতে, শিরার কষ্ট ও জোড়াগুলোর রোগ হতে বাঁচতে এবং খাদ্য হজম করার ক্ষেত্রে নামায অনেক প্রভাবশীল জিনিস। মানব স্বাস্থ্যের জন্য নামাযের একটি উপকারিতা এও যে এটি আমাদের রক্তের কলেস্টরেল অর্থাৎ চর্বিকে কমানোর ক্ষেত্রে একটা সীমা পর্যন্ত কাজ করে।

নামায এবং দেহের বর্ধন ও উন্নতি

ডাক্তার ও হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পিএইচডি প্রধান চিকিৎসক ও আঘাত বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়) তাঁর লেখা ইসলামের স্বাস্থ্য বিধিতে লিখেন :

যদি মানুষ নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার শরীরের জন্য ব্যায়াম ও সংযম হিসেবে গণ্য হবে। যার দ্বারা মানুষের সকল অঙ্গের বৃদ্ধি উত্তম হবে এবং তার শক্তি বাড়বে। এছাড়াও জোড়াগুলো সচল ও সুস্থ থাকবে এবং জোড়াগুলো তাদের কাজগুলো সঠিক পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিতে থাকবে এবং জোড়াগুলো বিভিন্ন প্রকারের রোগ যেমন জোড়া শক্ত হওয়া ইত্যাদি হতে রক্ষা পায়। এছাড়াও শ্বাসক্রিয়ার নিয়ম, রক্ত পরিসঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং পচন প্রক্রিয়ার ওপরও উত্তম প্রভাব ফেলে থাকে এবং মানুষ জীবনভর বিভিন্ন প্রকারের রোগ ও শারীরিক বিপদাপদ হতে সুরক্ষিত থাকে আর মানুষ জীন্দেগীর কর্তব্যসমূহ সঠিক এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আদায় করতে থাকবে। (ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি পৃ. ৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)

নামায হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যায়াম

নামায একটি উত্তম ইসলামী ব্যায়াম, মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে বাড়তে দেয় না। অন্য সব ধর্মের মধ্যে এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নেই যা আদায়ের সময় মানুষের সকল অঙ্গ নড়াচড়া ও শক্তিশালী হয়। নামাযীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা একান্তই সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব মানবের সকল অঙ্গগুলোতে পড়ে এবং সামগ্রিক মানব অঙ্গগুলোতে নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি পৃ. ৩৬, প্রাগুক্ত)

মানুষ রাতভর ঘুমিয়ে থাকে, ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থবির হয়ে রক্ত জমে যায়। এমতাবস্থায় রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে ব্যায়ামের প্রয়োজন। এ কারণে তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাযের বিধান দেয়া হয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে এশরাক, তারপর চাশত নামাযের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর কর্মব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে যোহরের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যোহরের নামাযের পর আছর, তারপর মাগরিব, তারপর এশার নামায আদায় করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এশার নামাযে বেশি রাকাত রাখা হয়েছে, কারণ রাতে মানুষ বেশি পানাহার করে, বেশি রাকাত নামায আদায়ের মাধ্যমে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর যে খাবার হজম হয় না তা স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

নামায ও যোগব্যায়াম

যোগব্যায়ামের বিশেষজ্ঞরা নামাযকে নিঃশ্বাস প্রশিক্ষণের একটি সহজ পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে কিয়াম বা দাঁড়ানো, সিজদার জায়গায় দৃষ্টি দেয়া এবং কেন্দ্রীভূত রাখা। দ্বিতীয় হচ্ছে রুকূ', এ রুকূ'তে পায়ের জায়গায় দৃষ্টি রাখা। তৃতীয়ত সিজদা এবং সিজদায় নিশ্বাসের উঠানামা।

নামায দ্বারা আত্মহত্যার প্রবণতা কমে যায়

ফ্রান্সের কমফোর্ট সেন্টারের রোগীদের গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যাপ্রবণ রোগীদের নামাযের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যায়াম করানো হয়েছে। তাদের নামাযের মতোই খুশুখুযুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে রোগীরা আত্মহত্যাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ডাক্তার আলেকজান্ডার

বলেছেন, ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক কম লক্ষ্য করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, অজু, নামায, বিশেষত খুশুখুযু সম্পন্ন নামাযের মাধ্যমে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক কমে যায় এবং এক সময় এ প্রবণতা আর মোটেই অবশিষ্ট থাকে না।

নামাযের রহস্য

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী-এর ধারণা এই যে, যে কোনো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নামাযের রহস্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি রাখতে অক্ষম। তিনি লিখেন–

No science has power to unrave or outline the mysterise of prayer. In particular to view prayer merely as a physical exercise is as ridiculons as believing that there is nothing more to the universe than the air we breathe.

অর্থ : কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানই নামাযের রহস্য উপলব্ধি বা রহস্যের উন্মোচন করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে নামায দেখে একে শুধু ব্যায়াম মনে করা তেমনি হাস্যকর যেমন কেউ এরূপ বিশ্বাস করল যে, পৃথিবীতে আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

উত্তম ব্যবস্থাপত্র

ডাক্তার হুলুক নূর বাকী নামাযের আত্মিক দিকের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তিনি এর দৈহিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি দেননি। এভাবে তিনি লিখেছেন–

It today even materialits acknowledge that there can be no prescription other than prayer for the relief of joints.

অর্থ : আজ বস্তুবাদীরাও স্বীকার করে যে, জোড়ার ব্যথা হতে মুক্তির জন্য নামায ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই।

কেমিস্ট্রির ব্যবস্থাপত্র

নামাযের ব্যায়াম যেমন বাইরের অঙ্গ সুনিপুণ সৌন্দর্য ও বৃদ্ধির মাধ্যম, এটা তেমনি এরূপ ভেতরের অঙ্গগুলো যেমন– হৃদয়, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মগজ, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং দেহের সকল গ্লান্ড (Glands) ইত্যাদি সুদৃঢ় করে ও উন্নত করে এবং দেহের শিডিউল এবং সৌন্দর্য রক্ষা করে।

নামাযের প্রচলন যদি হতো তাহলে

কিছু রোগ এরূপও আছে যেগুলো হতে নামায চালু করার দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা নামায আদায়ের মাধ্যমে দেহে এসব রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ডাক্তার হাসান গজনবীর এ বাক্যগুলো চিন্তার খোরাক যোগায়। তিনি লিখেছেন–

In addition to saving us from the sins and elevating us to the heights of spirituality prayers are great help in maintaining our physical health. They keep our body active, help digestion and save us from nuscase and joint diseaes through regular balanced excs cise. They help the circulation of blood and also nitifate the bad effect of cholesterol. Prayers a vital role in acting as preventive measure against heart attack, Paralyses diabetes mellitus etc. Hearts patients should offer the five obligatory prayers regularly as they get the permission from their doctor to leave bad. (Islamic Medicine P. 68)

অর্থ : আমাদেরকে পাপ হতে রক্ষা করা এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করানোর সাথে নামায আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বড় ধরনের সাহায্য করে। এটি আমাদের দেহকে সক্রিয় রাখে, হজমে সাহায্য করে আমাদেরকে জড়তা ও জোড়ার রোগ হতে নিয়মিত সুষম ব্যায়ামের দ্বারা রক্ষা করে। এটি রক্ত পরিসঞ্চালনে এবং কলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সালাত হার্ট এ্যাটাক, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হার্টের রোগীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা উচিত, যেমনিভাবে তারা তাদের ডাক্তারদের নিকট খারাপ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য অনুমতি লাভ করে থাকেন। (প্রাগুক্ত)

পশ্চিমারা আজ হরেক রকমের ব্যায়াম করছেন যাতে তাদের দেহের কলেস্টেরল গড় মাত্রা সীমাতিক্রম না করে। এছাড়াও এদের দেহ সব প্রভাবশীল পন্থায় কাজ করে। তারা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, নামায যা কোনোরূপ ব্যায়াম নয় অথচ তা নানারূপ ব্যায়ামের রূপ পরিগ্রহ করে। তা স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। যেমন জার্মানের প্রসিদ্ধ পত্রিকা ডি হায়েফ-এ প্রসিদ্ধ জার্মান মান্যবর ও প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডি জুলদ এ সত্যকে

প্রকাশ করেছেন তার লেখনীতে। তিনি লিখেছেন : যদি ইউরোপে নামাযের প্রচলন হতো তা হলে আমাদের দৈহিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়াম ও নড়াচড়া আবিষ্কার করার প্রয়োজন হতো না।

(আল মাসালিহুল আমালিয়্যাহ লিল আহকামিশ শারইয়াহ পৃ. ৪০৬)

সর্বোত্তম পর্যায়ে চিকিৎসা

এক পাকিস্তানী ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ইউরোপে ফিজিও থেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য গিয়েছেন। যখন সেখানে সম্পূর্ণ নামাযের ব্যায়াম পড়ালেন এবং বুঝালেন তখন তিনি এ ব্যায়াম দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন যে, আমরা এতদিন পর্যন্ত নামাযকে এক ধর্মীয় আবশ্যক বলেই জানতাম এবং পড়তে থাকতাম, অথচ এখানে তো আশ্চর্য ও অজানা জিনিসের আবিষ্কার হয় যে, নামাযের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নিরাময় হয়ে যায়। ডাক্তার সাহেব তাকে একটি তালিকা প্রদান করেন যা নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে নিরাময় হয়–

১. মানসিক রোগ (Mental Diseases)

২. স্নায়বিক রোগ (Nerve Diseases)

৩. মনস্তত্ত্ব রোগ (Psychic Diseases)

৪. অস্থিরতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা রোগ (Restlessness Depression and Anxiety)

৫. হার্টের রোগ (Heart Diseases)

৬. জোড়ার রোগ (Arthritis)

৭. ইউরিক এসিড হতে সৃষ্ট রোগ (Diseases due to uric Acid)

৮. পাকস্থলীর আলসার (Stomach Ulcer)

৯. চিনি রোগ (Diabetes Mellitus)

১০. চোখ এবং গলা ইত্যাদির রোগ (Eye and E.N.T Diseases)

মনস্তাত্ত্বিক রোগ

নামাযের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রোগ যেমন– গুনাহ, ভয়, নীচুতা, হতাশা, অস্থিরতা, পেরেশানি ইত্যাদিরও চিকিৎসা রয়েছে। যার বর্ণনা পুস্তকের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে বাদ দিতে হচ্ছে। একই সঙ্গে নামায দ্বারা পূর্বোক্ত উপকারিতা ছাড়াও দৈহিক ও মেধাগত উপকারিতাও হয়। আজ ইসলামি

ইবাদতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলো সামনে আসছে। নামাযের প্রত্যেকটি রুকন কোনো না কোনো চিকিৎসাগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপকারের বাহক।

ব্যায়াম ও নামায

নামাযের রুকনগুলো এককভাবে ব্যাখ্যা করলে তার আলোকে দেখা যায়, নামাযের প্রত্যেক রুকন আদায়ের মধ্যেই বিশেষ অঙ্গ ও জোড়ার আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ অঙ্গগুলোর ব্যায়াম হয়। শরীরতত্ত্ববিদ্যার (Physiology) একটি মূলনীতি এই যে, যখন মানুষ নড়াচড়ার ইচ্ছে করে তখন সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কেন্দ্র হতে নড়াচড়া স্নায়ুর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঙ্গে পৌছায় এবং অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে উদ্দীষ্ট কাজ করে থাকে এবং যখন নামায আদায়ের সুরতে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন এ আকার একটি ব্যায়ামের প্রকৃতি গ্রহণ করে যার দ্বারা অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। এভাবে নামাযের সব রুকন আদায়ের মাধ্যমে মানবের সব অঙ্গের ব্যায়াম হয়ে যায়। যার দ্বারা মানব দেহের সতেজতা ও শক্তি বহাল থাকে এবং দৈহিক কার্যাবলি প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে।

সামগ্রিক ইবাদত

নামায একটি উত্তম ইসলামী ব্যায়াম, যা মানুষকে সর্বদা সতেজ রাখে। অলসতা ও অবসাদকে দেহের মধ্যে বাড়তে দেয় না। কিন্তু অন্য কোনো ধর্মে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নেই যা আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গে নড়াচড়া ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযের মধ্যেই রয়েছে যে এটা সমগ্র ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব সমগ্র মানব অঙ্গের ওপর সমভাবে পড়ে এবং দেহের সব অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষিত থাকে। (ইসলামী স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. ৩৬ মু. কামালুদ্দীন হামদানী)

কঠিন বস্তু সচল করা

নামায আত্মা ও দেহ উভয়ের জন্য ব্যায়াম, এ জন্য এর মধ্যে দাঁড়ানো, বসা, রুকূ', সিজদা এগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নড়াচড়া হয়ে থাকে এবং নামাযী এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে ও নামাযে দেহের অধিকাংশ জোড়া নড়াচড়া করতে থাকে এবং এর সাথে বেশির ভাগ অদৃশ্য অঙ্গগুলো

পাকস্থলী, অন্ত্র, শাস যন্ত্র এবং খাদ্যের অঙ্গগুলো এসবের গঠনে নড়াচড়া এবং পরিবর্তন আসে। অতঃপর এ অবস্থায় কোনো কথা নিষেধকারী যে এসব নড়াচড়ার দ্বারা কিছু অঙ্গ শক্তি অর্জন করবে এবং অপ্রয়োজনীয় আবশ্যিক জিনিসগুলো সচল না হবে?

(তিবেব নববী, পৃ. ৩৯৯ ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ)

নামাযের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

এখন ধারাবাহিকভাবে নামাযের কিছু আরকানের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বর্ণনা করা হলো :

তাকবীরে তাহরীমা

যখন আমরা হাতগুলোকে কান পর্যন্ত উঠাই তখন বাহু ঘাড়ের পিঠ এবং কানের পিঠের ব্যায়াম হয়ে যায়। হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম বহু উপকারী। যখন এই ব্যায়াম নামাযীর দ্বারা নামায পড়ার মাধ্যমে একাকী হয়ে যায় এবং এই ব্যায়াম প্যারালাইসিসের মারাত্মক সমস্যা হতে রক্ষা করে।

নিয়ত বাঁধার সময় কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং কাঁধের জোড়ার অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

মস্তিষ্কে কোটি কোটি সেল/কোষ কাজ করে এবং কোষগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বেড়ে যায়। এসব বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে ধারণা, অনুভূতি এবং অনুভূতির অধীনে যা কিছু আছে তা সচল থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যে কোটি কোটি কোষের মতো গর্তও হয়, মস্তিষ্কের একটি গর্ত এরূপ আছে যার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছবি নিতে থাকে এবং বিভক্ত করতে থাকে, এই ছবি খুবই কালো হয় এবং খুবই চমকদার হয়।

একটি গর্ত আছে যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় এবং এসব গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে ঐসব কথাও থাকে যেগুলোকে অনুভূতি, দৃষ্টি ও অনুমান করতে পারে এবং যাকে আমরা আধ্যাত্মিক সংশোধন নাম দিয়ে থাকি। নামাযী যখন হাত উঠিয়ে উভয় কানের লতির নিকট নেয় তখন এক বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রবাহ খুবই সূক্ষ্ম তাপ, নিজ কনডেন্সর (Condensor) বানিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে এই গর্তের সেল/কোষগুলোকে চার্জ করে দেয়। যাকে অনুভূতি, দেখতে ও আন্দাজ করতে পারে। এই কোষগুলো চার্জ হয়ে মস্তিষ্কে আলোর ঝলকানি হয়

এবং এ ঝলকানি দ্বারা সব স্নায়ু প্রভাবিত হয়ে এই গর্তের দিকে মনোযোগ দেয়, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক সংশোধন নিহিত রয়েছে। সাথে সাথে হাতের মধ্যে এক তেজী প্রবাহ মস্তিষ্ক হতে স্থানান্তর হয়।

কিয়াম বা দাঁড়ান

কিয়াম বা দাঁড়ানোর দ্বারা দেহ সম্পূর্ণরূপে অনড় ও শান্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও মানব দেহের ওপর বহু প্রকারের প্রভাব আচরিত হয়। তা এরূপ–

যখন নামাযী কিরআত শুরু করে এবং নবী করীম (সা)-এর নির্দেশনা মোতাবেক উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন, যে ব্যক্তি তা কানে শোনে, এসব কুরআনের আয়াতের আলোগুলো সারা দেহে প্রবাহিত হয়, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য এক বিরাট পরশ পাথর।

কিয়াম দ্বারা দেহের প্রশান্তির পদ্ধতি অনুভূত হয়। নামাযী যেহেতু কিয়ামের মধ্যে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করতে থাকে এ কারণে তার দেহ এক জ্যোতির বৃত্তের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লেপ্টে থাকে এবং সে যতক্ষণ এ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 'নূর' হতে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বলে এর বেষ্টনীর মধ্যে থাকে।

কিয়ামের মধ্যে নামাযী যে অবস্থায় থাকে যদি আমরা প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ (৪৫) মিনিট পর্যন্ত এ অবস্থায় দাড়িয়ে থাকি তাহলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে উন্নতমানের শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টি হয়। কিয়ামের দ্বারা পরবর্তী মস্তিষ্ক (pons) –যার কাজ হলো আচরণ, প্রচলন এবং মানব দেহের চলনকে নিয়ন্ত্রণ করা, –শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মানুষ এমন এক মারাত্মক রোগ হতে বেঁচে থাকে যে, যার দ্বারা মানুষ নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না।

হাত বাঁধা

হাত বাঁধার সময় কনুইর আগে পিছে থাকা পেশি এবং বগলের পিছের নড়ার পেশি অংশ নেয় এবং সেগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

নামাযে বাম হাত নিচে বাঁধা হয় এবং ডান হাত দ্বারা তাকে আঁকড়ে ধরে রাখা হয় মূলত মানব অঙ্গগুলোর ডান ও বাম দিকের কার্যকরণ পৃথক পৃথক। বাম অংশ হতে বিশেষভাবে ডান হাত হতে অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বের হয় যা ধণাত্মক (Positive) হয়ে থাকে। সর্বদাই ডান হাতের ধণাত্মক রশ্মি (Positive rays) বাম হাত হতে স্থানান্তর হয়ে শক্তি, সামর্থ্য

এবং নড়াচড়ার কারণ হয়ে যায়, যার কারণে মানবদেহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায় এবং মানুষ পেরেশান বা অস্থির হয় না।

নামাযে নারী ও পুরুষ একই স্থানে হাত বাঁধেন। এর দ্বারাও মানব দেহের অনেক উপকারিতা সাধিত হয়। পুরুষ যখন বুকের উপর হাত বাঁধে তখন উভয় হাত হতে তরঙ্গ বের হয় যা ধণাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) হয়ে থাকে।

কতিপয় উলামার মতে পুরুষ এবং মহিলার নামাজের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে তারা যে দলীল গুলো দিয়ে থাকেন তার প্রত্যেকটা ضَعِيْفٌ 'যঈফ' যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সঠিক কথা হলো :- পুরুষ ও মহিলার নামাজে কোন পার্থক্য নেই। যা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। তথা রাসূল (সা)-এর বাণী عام 'আম' ভাবে সকল মানুষের জন্য নারী পুরুষসহ যে, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ (বুখারী)

তাই মানব দেহের উপকার সাধন সহীহ্ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত আমল থেকেই করতে হবে।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার صفة الصلوة নামক কিতাবের শেসে তথা ১৮৯ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এখন এই তরঙ্গমালার মিশ্রণে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় যা নাভীর মাধ্যমে স্নায়ু পর্যন্ত পৌছে যায়, যার দ্বারা প্লীহা, বৃক্ক (Adrenal Glands) শক্তিশালী হয়, যার দ্বারা যৌন শক্তি বৃদ্ধি ও সচল হয়।

মহিলাগণ নিয়তের পর যখন বুকের ওপর হাত বাঁধে তখন তার হার্টে স্বাস্থ্যসম্মত উষ্ণতা প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি ও উন্নতি পায় যার ওপর বাচ্চাদের খাদ্য সীমিত হয়ে থাকে। নামায প্রতিষ্ঠাকারী মেয়েদের দুধে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, মহিলাগণ যখন বুকের ওপর হাত রেখে এক বিশেষ মুরাকাবা করে, যাতে দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কিছুর ওপর প্রশান্ত চিত্তে চিন্তা করে (যেমন নামাযে হয়) তাহলে এ অবস্থায় এক বিশেষ প্রকারের রশ্মি (Rays) সৃষ্টি হয়, যা ডাক্তারদের কথায় হালকা নীল অথবা সাদা রঙের হয়ে থাকে যা তার দেহে প্রবেশ করে ও বের হতে থাকে এবং তার দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ঐ দেহ কখনো কোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে না।

রুকূ'

হাঁটুর ওপর রেখে কোমরকে ঝুঁকানোর অবস্থাকে রুকূ' বলা হয়। এ নড়াচড়ায় দেহের সকল পেশির ব্যায়াম হয়ে যায়। এর মধ্যে নিতম্বের জোড়া ঝোঁকানো (Flexion) হয়, কনুইগুলোর সোজা টান (Extended) হয় এবং মাথাও সোজা হয়, এ সময় সব পেশি শক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু পেট কোমরের পেশি ঝোঁকে এবং সোজা হবার সময় কাজ করে। এভাবে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম রুকূ'র মধ্যে হয়ে যায়।

সম্মানিত ডাক্তারগণ রুকূ' এবং সিজদাকে টাখনু এবং কোমর ব্যাথার রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। রুকূ'র মধ্যে হারাম মগজ (Spinal Cord)-এর কাজ কারবার বৃদ্ধি পায় এবং ঐ রোগী যার অঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায় তিনি এ রোগ হতে খুব দ্রুত আরাম পেয়ে থাকেন। রুকূ' দ্বারা কোমর ব্যথার রোগী অথবা এমন রোগী যার হারাম মগজ ফুলে (Inflamation of spinal cord) গিয়েছে তিনি খুব দ্রুত সুস্থতা লাভ করেন। রুকূ'র দ্বারা মূত্রাশয়ের পাথর হওয়ার প্রক্রিয়া ধীর গতিতে হয় এবং এর দ্বারা পায়ের নলার অবসাদগ্রস্ত রোগী চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। রুকূর দ্বারা মস্তিষ্ক ও চোখের প্রান্তে রক্ত পরিসঞ্চালন (Circulation of Blood) এর কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সিজদা

সিজদার মধ্যে নিতম্ব, হাঁটু, টাখনু ও কনুই-এর ওপর ঝোঁকানো (Flexion) হয়ে থাকে। যখন নলা এবং রানের পিছনের পেশি এবং কোমর ও উদরের পেশি চেপে যায় এবং কাঁধের জোড়ার পেশিগুলো এর বাইরের দিক হতে টান লাগে। এর সাথে সাথে মাথার পিছনের অঙ্গগুলোও চেপে যায়।

সিজদার মধ্যে নারীদের জন্য রয়েছে অনেক উপকার। এটা গর্ভাশয়ের পিছনের (Retrorersions of uterus) এর উত্তম চিকিৎসা। সিজদার মধ্যে আরো অনেক শারীরিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। মস্তিষ্কের জন্য রক্তের খুব প্রয়োজন। কেননা মস্তক সব অঙ্গের মূল কিন্তু এর অবস্থান স্থল এরূপ যে, এ পর্যন্ত রক্ত পৌছানো কিছুটা মুশকিল, বিশেষত মস্তিষ্কের রক্তকে একত্র করার জন্য সিজদা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আমল।

মস্তিষ্ক সাধারণ অবস্থায় বেশির ভাগ সময় হার্ট হতে উঁচু থাকে এজন্য মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ যথেষ্ট হয় না। সিজদার দ্বারা মস্তিষ্কে হার্টের নিচে পড়ে এজন্য এসময় এর রক্ত সহজে পৌঁছায়।

সিজদা যত দীর্ঘ হবে ততই বেশি রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এভাবে নবী করীম (সা) দীর্ঘ সিজদার ফযীলত বর্ণনা করেন। এর ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তার জ্ঞান, বুঝ, স্মৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত সুস্থ থাকে। যে কোনো বয়সে মহান রবের দরবারে উপস্থিত হয়ে একনিষ্ঠ মনে কৃত লম্বা সিজদার দ্বারা আত্মিক, মস্তিষ্ক মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের জন্য সহযোগী হয়। জার্মান প্রাচ্যবিদ জাওয়াফীম ডী যুলফের মতে, সিজদায় উভয় হাত এবং সব অঙ্গের এক মোহের সাথে প্রসারিত করা এবং সংকুচিত করা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জিনিসকে দূর করে। (আল মানালিহুল আকলিয়াহ, লিল আহকামিন নকলিয়াহ পৃ. ৪০৬)

নামাযী ব্যক্তির চেহারার ওপর সতেজতা থাকে। কেননা নামায এবং সিজদার কারণে এর সব শিরার মধ্যে রক্ত পৌঁছায়। যে নামায পড়ে না তার চেহারার ওপর এক ধরনের কালচে রং ছড়িয়ে পড়ে।

কা'দা বা বৈঠক

দু অথবা চার রাকআত পর আমরা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসি, একে কা'দা বা বৈঠক বলে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন দেহ বসার অবস্থায় থাকে এবং হাঁটু ও নিতম্বের ওপর চাপ পড়ে, টাখনু ও পায়ের অংশগুলো পিছনে চাপ পড়া অবস্থায় থাকে, কোমর ও ঘাড়ের পেশিতে চাপ লাগে এজন্য এসব অঙ্গে হালকা পাতলা ব্যায়াম হয়ে যায়। ব্যায়ামের এ নিয়ম যে, কঠিন ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ চুপ থাকতে হবে এবং লম্বা শ্বাস নিতে হবে বা সংশ্লিষ্ট হালকা পাতলা ব্যায়াম করতে হবে। নামাযেও রুকূ এবং সিজদার পরে বৈঠকে বসা এ নিয়মগুলোর উত্তম প্রকাশ।

সালাম ফিরানো

অস্ত্রোপচার মেডিকেল কলেজ মূলতানের ডাক্তার কাজী আব্দুল ওয়াহেদ-এর মতানুযায়ী নামাযে সালাম ফিরানোর জন্য মাথা ডানে বামে ফিরানোর প্রয়োজন হয় এবং এক নামাযে এরূপ কয়েক বার (ফরয সুন্নাত মিলে) করার প্রয়োজন হয়। এরূপকারীর হার্টের রোগ (Heart Diseases) এবং

এর মধ্যকার জটিলতা হতে সর্বদা বেঁচে থাকে এবং খুব কমই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সালাম ফিরানোর সময় ঘাড়ের ডান-বাম দিকের পেশি সক্রিয় থাকে। এটা ঘাড়ের উত্তম ব্যায়াম যা নামায আদায়ের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে।

নামাযের সময় এবং আধুনিক বিজ্ঞান

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চলনশীল দেহ প্রদান করেছেন। এজন্য তার স্বাস্থ্য দেহের চলার (অর্থাৎ ব্যায়াম ইত্যাদি) ওপর টিকে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে সচল রাখে। থেমে থেমে নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন হয় জামায়াতে পড়ার জন্য। এটা এক উচ্চমানের ব্যায়াম হিসেবে মানা হয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত চলাচলের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যাওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যাতে থেমে থেমে বিভিন্ন সময়ে নামায আদায়ের জন্য নড়াচড়া করতে থাকে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের নিকট স্বীয় দাসত্ব এবং বন্দেগী পেশ করতে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এবং তদীয় রাসূল (সা) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং নামায জামায়াত সহকারে আদায় করা আবশ্যক করেছেন। এ সময়গুলো বিভিন্ন হওয়ার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা পাওয়া যায়। এক মুসলমান নামাযী পাঁচ সময়ে এ নামাযগুলো আদায় করেন এবং এ ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামায রাসূল (সা)-এর সুন্নাত। যার সময় ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে।

ফজরের সময়

যখন রাত শেষ হয়ে আসে, তখন সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায ফরয করা হয়েছে। যা হালকা এবং যখন প্রকৃতির ওপর চাপ নেই। সারারাত আরাম করার পর যখন পাকস্থলীও খালি হয়ে যায়। কঠিন শ্রম ও ব্যায়াম ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয় এবং এরূপ করায় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এজন্য এ সময় হালকা ও সংক্ষিপ্ত নামায নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। বরং কোনো নামাযী যেন এই চার রাকআত নামায পড়ে উপকারিতা গ্রহণ করতে পারে। ফজর নামায পড়ে লোকেরা নিজ অবসাদগ্রস্ত দেহকে পুনরায় সক্রিয় ও চলমান করে।

এরপর সারাদিন রিযিক ও জীবিকা অর্জন করার জন্য কাজ কর্মে মনোযোগ দেয় এবং মস্তিষ্ক পুনরায় চিন্তা-ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সকালে সতেজ প্রকৃতি এবং আলোতে মানুষ নামাযের জন্য বাইরে বের হয় এবং পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়, এতে সতেজ পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত পরিবেশ হতে সূক্ষ্ম অনুভূতি নেয় যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

ফজর নামাযের জন্য নামাযীকে নিজ দেহকে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। সে অজু করে নিজ দেহের অঙ্গগুলোকে ধোয়া, দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক করে যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। যদি এগুলো না করে তাহলে মুখ এবং দেহের ওপর জীবাণু লাগতে থাকে এবং বিভিন্ন রোগের কারণ মানুষ নিজের দখলে নিয়ে নেয়। এজন্য ফজরের নামায ফরয হওয়ার এক কারণ এই যে, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়মমাফিক হওয়া।

যোহরের সময়

দিন শুরুর সাথে সাথে মানুষ জীবিকা অর্জনের মধ্যে লেগে যায়। ধুলা-ময়লা তার গায়ে লাগে। কিছু কেমিক্যাল হাত পায়ে লাগার আশংকা রয়েছে। কেননা মানুষ জীবাণু বিযুক্ত বায়ুর মধ্যে থাকে। তখন তার দেহের ওপর জীবাণু আক্রমণ করে থাকে। এছাড়াও দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে করতে শ্রান্তি ও অনুভূত হতে থাকে। এ কারণে একজন নামাযী যোহর নামাযের জন্য অজু করে যাতে স্বীয় হাত, মুখ, পা ইত্যাদি ধৌত করে যাতে রোগের কোনো আশংকা না থাকে।

ক্লান্ত দেহ যোহরের নামায পড়ে আরাম ও প্রশান্তিও অনুভব করে এবং পুনরায় উজ্জীবিত হয়, যার দ্বারা শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। এসব উপকারিতা একজন নামাযীর যোহরের নামাযের সময় অর্জিত হয়।

দুপুর পর্যন্ত কঠিন গরম পড়ার কারণে সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যেতে শুরু করে। যদি এ ক্ষতিকর গ্যাস মানবদেহের ওপর প্রভাব ফেলে তাহলে সে বিভিন্ন ধরনের রোগের শিকার হয়ে যায়। তার মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয় এবং সে পাগলামিরও শিকার হয়ে থাকে। তাই সে দুপুরের সময় যোহর নামায পড়ার জন্য অজু করে নিজে দেহকে পুনরায় সতেজ ও প্রশান্তময় করে। অজুর দ্বারা সে বিষাক্ত গ্যাস হতে নিজ

দেহকে বাঁচিয়ে নেয় এবং কয়েক প্রকারের জীবাণুকে স্বীয় দেহ হতে বের করে। এজন্য স্বয়ং স্রষ্টা এ গ্যাস উঠার সময় অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় যোহরের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আসরের সময়

জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, পৃথিবী দুই ধরনের গতিতে চলে। যেমন : ১. লম্ব, ২. বৃত্তীয়।

যখন সূর্য ঢলতে থাকে, তখন পৃথিবীর ঘূর্ণন কমতে থাকে এমনকি আসরের সময় ঘূর্ণনের পরিমাণ একেবারেই কমে যায়। এ কারণে মানুষের ওপর দিনের অনুভূতির পর রাতের অনুভূতি প্রবল হতে থাকে, প্রকৃতির মধ্যে স্থবিরতা এবং অবসাদগ্রস্ততা প্রদর্শিত হতে থাকে। এতে আবার নামাযের সময় মানুষের সচেতন অনুভূতির ওপর অচেতন অনুভূতির প্রভাব শুরু হয়, যার দ্বারা মানুষ স্বীয় আরামের অনুভূতি করতে থাকে।

যে কোনো নামাযী আসর নামাযের জন্য অজু করে নিজে নিজে জাগতিক সমস্যার আক্রমণ হতে রক্ষা করে নিতে পারে এবং স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের ইবাদতে লেগে যেতে পারে, যার দ্বারা অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত হয় না এবং অচেতন অনুভূতির আক্রমণকে সহ্য করার যোগ্য হয়ে যায়।

নামাযে নূরানী রশ্মি নামাযীকে প্রশান্তি প্রদান করে। যার কারণে সে আত্মার নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং আসরের নামায আদায় করে আত্মিক নড়াচড়া গ্রহণ করতে থাকে।

মাগরিবের সময়

মানুষ সারাদিন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে কাটায় এবং নিজ ও পরিবারের জন্য রুজী কামাই করে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে এজন্য যে, সেই মহান সত্তা এগুলো অর্জন করার জন্য শক্তি প্রদান করেছেন। এটা আনন্দের মধ্যে হয়, যার দ্বারা অন্তর এক বিশেষ প্রকারের আনন্দ অনুভব করে। মাগরিবের সময় যে আল্লাহ তায়ালার নিকট হাজিরা দিয়ে নিজ দাসত্বকে প্রকাশ করে, আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে এবং নূরানী তরঙ্গমালা দ্বারা ভরে যায়, যা তার আত্মাকে প্রশান্তি প্রদান করে। এই আলোকিত অদৃশ্য তরঙ্গমালার প্রভাব এদের বাচ্চাদের উপরও পড়ে যাতে তারা শিষ্ট ও সৌভাগ্যবান হয়। যে মুসলমান মাগরিবের নামায বৈধ পন্থায়

নিয়মমাফিক আদায় করে তার সন্তানগণ স্বীয় পিতামাতাকে মান্য করে। এ ধরনের নামাযীদের বাচ্চাগণ সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে। এবং তাদের ঘরের চতুর্দিকে সুন্দর ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করে।

এশার সময়

মানুষ স্বভাবগতভাবে লোভী। যখন সে কাজকর্ম হতে ফিরে ঘরে আসে, খানা খায় এবং স্বাদ ও লোভের কারণে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে। যদি সে খাওয়ার পর পরই শুয়ে পড়ে তাহলে সে ধ্বংসকারী রোগের শিকার হয়। মানুষ যদি সারাদিন ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত খাওয়ার পরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে যায় তাহলে সে অস্থির হতে যাবে। শোয়ার আগে এবং অতিরিক্ত খানা খাওয়ার পরে কমবেশি ব্যায়াম করে নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। দিনের ক্লান্তি ঘাম এবং অতি খাবার খাওয়া লোভী মানুষের জন্য এশার নামায কোনো ব্যায়ামের চেয়ে কম নয়। এশার নামায দ্বারা শান্তি, আনন্দ সহজ হয় এবং সাথে সাথে নামাযের শৃংখলার মাধ্যমে খানা হজমের প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে।

এভাবে এশার নামাযের মতো দীর্ঘ নামায আদায় করে শোয়া ব্যক্তি যারা রাতে প্রশান্তি ও আরামের ঘুম ঘুমাবে এবং তার খানাও হজম হয়ে যাবে। বর্তমানে চিকিৎসায় অভিজ্ঞগণও শোয়ার পূর্বে হালকা-পাতলা ব্যায়ামের ওপর জোর দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে, এই ব্যায়াম কয়েক প্রকারের ক্ষতিকর রোগ হতে রক্ষা করে। হকপন্থিগণ এও বলেন যে, শোয়ার পূর্বে নামাযের চাইতে সুন্দর ব্যায়াম আর নেই।

নামাযে কেয়ামের মাধ্যমে গিটে বাত রোগের প্রতিকার

নামাযের মাধ্যমে গাঁট বা জোড়ার ব্যথা আরোগ্য লাভ করে। অজু করার পর যখন আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াই তখন দেহ ঢিলেঢালা থাকে, কিন্তু যখনই নিয়ত করার জন্যে দু'হাত ওপরে তুলি তখনই কুদরতীভাবে দেহ স্থির হয়ে যায়। সকল বৈষয়িক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মস্তিষ্ক হতে একটি আলো এসে মেরুদণ্ডের হাড় আলোকিত হয় এবং সেই আলো দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পৌছে যায়। একথা সবাই জানে, শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যে মেরুদণ্ডের একটি বিশেষ শক্তি রয়েছে। মেরুদণ্ডের সুস্থতা ও শক্তির ওপর ভালো স্বাস্থ্য নির্ভর করে। নামাযে কেয়াম করার মাধ্যমে হাত পায়ের জোড়া ও কোমর শক্তিশালী হয় এবং গিটেবাত দূর হয়। তবে শর্ত হচ্ছে, নামাযের সময়ে কেয়াম হতে হবে অত্যন্ত স্থির ও সঠিকভাবে।

রুকূর মাধ্যমে কিডনি রোগের প্রতিকার

ঝুঁকে রুকূ করার সময়ে হাঁটুর ওপর দুই হাত রাখার ফলে পিঠ সোজা হয়ে থাকে এতে পাকস্থলী শক্তিশালী হয়। ডাইজেস্ট বা হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্ত্র রোগ, পেটে ভাঁজ পড়া, পেটে ব্যথা ইত্যাদি রোগ আরোগ্য হয়। রুকূর মাধ্যমে কিডনি এবং হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী হয়। কোমরে এবং পেটে চর্বি জমতে পারে না। দেহে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। মাথা এবং হৃৎপিণ্ডের সাথে যেহেতু ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, এ কারণে হৃৎপিণ্ড হতে রক্ত মাথায় সঞ্চালিত হয়ে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। হৃৎপিণ্ডও শান্ত সুস্থ থাকে। হৃদযন্ত্র কার্যকর ও শক্তিশালী হয়। মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায় রুকূ করার সময়ে যেহেতু হাত নিচের দিকে যায়। এ কারণে কাঁধ হতে শুরু করে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো অংশের ব্যায়াম হয়ে যায়। ফলে বাহুমূল শক্তিশালী হয়। বার্ধক্যের কারণে দেহে যেসব বাড়তি উপাদান জমা হয়, সেসব উপাদান আপনা হতেই বেরিয়ে যায়।

সিজদা পেটের চর্বি কমানোর ব্যবস্থা

রুকূ করার পর নামাযী সোজা দাঁড়িয়ে তারপর আবার সিজদা করে। সিজদায় যাওয়ার আগে হাত জমিনে রাখা হয়। এটা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী করে। রুকুর পরে যদি সিজদায় যাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া না করে বরং ধীরেসুস্থে যায় তবে এ আমল দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতায় বিশেষ উপকার সাধন করে। সিজদার মাধ্যমে উরুর বাড়তি চর্বি কমে যায়। পেট হয় সুন্দর।

আমার এক বন্ধুর বিস্ময়কর ঘটনা

আমার এক বন্ধু ভূঁড়ি কমানোর উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বললেন, তুমি একজন মুসলমান, তোমার চিকিৎসা হচ্ছে নামায। নিয়মিত নামায আদায় করো এতে তোমার দেহ স্মার্ট হয়ে যাবে। এরপরও যদি কোনো ত্রুটি থাকে তবে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করো।

সিজদার মাধ্যমে আলসারের চিকিৎসা

যে সব লোকের পাকস্থলীতে যন্ত্রণা এবং ক্ষত দেখা দেয়, তাদের আলসার হয়েছে বুঝতে হবে। ভালোভাবে সিজদা করা হলে এ রোগ ভালো হয়ে যায়। সিজদার সময়ে কপাল মাটিতে রাখা হয়। এ আমলের মাধ্যমে মস্তিষ্কের রশ্মি মাটিতে থাকা বিদ্যুৎ স্পর্শ করে নিজে শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে মস্তিষ্কের শান্তি এবং নিশ্চিন্ততার পরিবেশ তৈরি হয়। শান্তিপূর্ণ মস্তিষ্ক পাকস্থলীর সতেজ গ্রাণ্ডকে আরও সতেজ করে।

মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ

খুশুখুযু অর্থাৎ বিনয় নম্রতার সাথে দীর্ঘ সময় সিজদা করার কারণেও মস্তিষ্কের রোগ নিরাময় হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত সঞ্চালিত হওয়ায় অপ্রয়োজনীয় উপাদান কিডনীর মাধ্যমে পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায়। সিজদা হতে উঠার সময়ে এ কথা মনে রাখতে হবে, মাথা নীচু করে রাখতে হবে, বাহু সোজা রাখতে হবে। সিজদা হতে ওঠার সময়ে উরুর ওপর হাতের তালু স্থাপন করতে হবে। চেষ্টা করে কোমর ওপরে ওঠাতে হবে এবং ধীরে ধীরে ওপরে উঠিয়ে পরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

চেহারার মেদ কমে যাওয়া

সিজদায় মাথা নীচু হওয়ার কারণে রক্তের প্রবাহ দেহের উপরিভাগে সঞ্চালিত হয়। এতে দাঁত, চোখ ও পুরো চেহারা প্লাবিত হয় এবং চেহারার মেদ ঝরে যায়। সহজে বার্ধক্য আসে না। একশ বছর বয়স হলেও মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে। সিজদা মানুষের মধ্যে এক রকমের বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি হয়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তিমান করে। সঠিক নিয়মে সিজদা করা হলে সর্দি, কাশি, কানের সমস্যা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

যৌন রোগের প্রতিকার

নামাযে উভয় সিজদার মাঝখানে বসার মাধ্যমে হাটু, কোমর মজবুত হয়। দুই উরুর সন্ধিস্থলে মানব বংশ বিস্তারের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে অঙ্গ দিয়েছেন সেই অঙ্গ শক্তিশালী হয়। পুরুষোচিত শক্তি বৃদ্ধি পায়, যৌন দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। ফলে মানুষের বংশ বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক দিক হতে সুস্থ হয়ে ওঠে।

বুকের ব্যথার নিরাময়

নামায শেষ হওয়ার পর আমরা দুই দিকে সালাম ফিরাই। দুই দিকে ঘাড় ফেরানোর ফলে ঘাড়ের ত্বক শক্তিশালী হয়। ত্বকের সাথে যেসব রোগের সম্পর্ক রয়েছে তা ভালো হয়ে যায়। মানুষ হাসিখুশি থাকে। বুকের ঢিলেপনা দূর হয়ে যায়। তবে মনে রাখতে হবে এ সকল উপকার তখনই পাওয়া যাবে যখন নামাযী ব্যক্তি মনোযোগ আন্তরিকতার সাথে এবং কোনোরকম তাড়াহুড়া না করে নামায আদায় করবে।

৪৪. পবিত্রতা

SANCTIFY

মহানবী (সা) বলেছেন যে, اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" (সুনানে তিরমিযী মূল-১৯০)

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ "অর্থ : পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।" (মুসলিম খ-১ পৃ.১১৮)

এ হতে স্পষ্ট হলো যে, এক মুসলমানের জন্য তার ঈমানের অংশ হলো সর্বদা পবিত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ সর্বদা পবিত্র থাকবে। ইসলাম প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পবিত্রতার শিক্ষা এমন পরিমাণ দিয়েছে যে, অমুসলিমদের পথিকৃৎগণও একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইসলাম যে পরিমাণ পবিত্রতার ওপর জোর দিয়েছে অন্য কোনো ধর্ম তা দেয়নি। অতএব ডা. রবার্ট স্মিথ বিখ্যাত সার্জন মসলামা, দক্ষ সার্জারি লিখেছেন "আমরা পবিত্রতার আমল ইসলাম হতে শিখেছি"।

সবচেয়ে বড় খারাপ ঐ জিনিস যা মানুষের দেহ হতে পায়খানা পেশাবের আকারে বের হয়। ইসলাম এগুলো বের হওয়ার পর উত্তমরূপে ইস্তিঞ্জা (পবিত্রতা) অর্জন করার নির্দেশ দেয়। যেহেতু নির্দেশ আছে যে, যদি মানুষের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয়, তাহলে সবার আগে এ প্রয়োজন সেরে পবিত্রতা অর্থাৎ ইস্তেঞ্জা করবে।

পরিষ্কার করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। পায়খানা পেশাব করার সময় কিবলার দিকে পিঠ অথবা মুখ করা যাবে না, চাই সেটা খোলা জায়গা হোক বা ঘর হোক। যদি ভুল করে এমন করে তাহলে মনে হওয়ার

সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে নিবে। পেশাব পায়খানা করার সময় বাতাসমুখী হয়ে বসা যাবে না।

পায়খানা ও পেশাবখানায় যাওয়ার সময় মুস্তাহাব হলো বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দোয়া পড়া।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ۔

অর্থ : আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি খবীস (দুষ্ট) জ্বিন পুরুষ এবং জ্বিন নারী হতে তোমার আশ্রয় চাই। (ফাতহুল বারী খ-১, আরবি পৃ. ২৪৪; সহীহ বুখারী হা/১৪২, খ-১, আরবি পৃ.৪৫; সহীহ মুসলিম হা/৮৫৭, খ-১ আরবি পৃ. ২৮৩)

আবার টয়লেটে পায়খানা করতে প্রথমে বাম পা ভেতরে রাখবে, যখন বসার নিকটবর্তী হবে তখন শরীর হতে কাপড় গুছিয়ে নিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেহ খুলবে না। পা ছড়িয়ে বাঁ-পায়ের ওপর জোর দিবে এবং চুপ হয়ে প্রয়োজন সারবে। যখন সমাধা হয়ে যাবে, তখন পুরুষ বাম হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গের গোড়া হতে আগার দিকে চাপ দিবে যাতে পেশাব যে ফোঁটা ভেতরে রয়েছে তা বের হয়ে যায়। অতঃপর পানি, অথবা মাটির ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ডান হাত দ্বারা পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা ধোবে। পানির পাত্র এমন উঁচুতে রাখবে না যাতে ছিটা গায়ে লাগার আশংকা থাকে। প্রথমে পেশাবের স্থান ধোবে পরে পায়খানার স্থান। পায়খানার স্থান ধোয়ার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের জোর কমিয়ে ঢিলে রাখবে এরপর উত্তমরূপে ধোবে, যাতে ধোয়ার পর হাতে কোনো গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর কোনো পবিত্র কাপড় দ্বারা মুছে নিবে। যদি কাপড় না থাকে তাহলে বারবার হাত দ্বারা মুছবে। একথা স্মরণ রাখবে যে, দাঁড়ানোর পূর্বে শরীর ঢেকে নিবে এবং বের হয়ে আসবে। বের হওয়ার সময় ডান পা আগে বের করবে এবং এ দুয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ مَا يُؤْذِيْنِيْ وَاَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِيْ۔

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর– যিনি আমার নিকট হতে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দিয়েছেন এবং উপকারী দ্রব্য নিকটবর্তী করেছেন।

প্রস্রাব-পায়খানা হতে বের হওয়ার পর আরো একটি দোয়া রাসূল (সা) হতে বর্ণিত রয়েছে। যখন রাসূল (সা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন তখন সে স্থান ত্যাগ করে পড়তেন غُفْرَانَكَ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থী। (যাদুল মায়াদ, খ-২, আরবি পৃষ্ঠা ৩৮, ইবনে মাজাহ হা/৩০১)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

পায়খানা পেশাব মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অন্যতম। নবী করীম (সা) প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে মানব কল্যাণ ও সহজতর পথ নির্দেশনা দিতেন। যদি নবী করীম (সা)-এর জীবন জিন্দেগী আলোচনাও বুঝা যায় তাহলে তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সহজতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যাবে। আজ পৃথিবী পুনরায় তাঁর তরীকার দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে, যে পন্থায় আমাদের নবী করীম (সা) জীবনযাপন করেছেন। ইস্তেঞ্জার ওপর রাসূল (সা)-এর সুন্নাতগুলোর বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতাগুলো নিম্নে পেশ করা হলো :

১. রাসূল (সা) টয়লেট বা পায়খানা পেশাবের জন্য অনেক দূর হেঁটে যেতেন। পায়খানা পেশাবের জন্য দূরে যাওয়া অনেক বেশি উপকারী। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার আলোকে কয়েকটি বাস্তব বিশ্লেষণের বর্ণনা দিচ্ছি।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান বেশি বেশি চলাফেলার ওপর জোর দিচ্ছে এমনকি আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালগুলোতে একথা লিখা রয়েছে পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে না বাহন।

একথা পরিষ্কার যে, পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। এই জ্ঞানগত বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে বেশি বেশি করে পায়ে চলার দিকে আহ্বান জানানো। বায়ো কেমিষ্ট্রির (প্রাণ রসায়ন) এক দক্ষ পণ্ডিত এক পয়েন্টে তিনি বলেন :

যখন হতে শহরের পত্তন ঘটতে থাকে, বসতি বাড়তে থাকে এবং চাষ ক্ষেত্র কমতে থাকে সে সময় হতে আজ পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে। কেননা যখন হতে দূরে পায়খানা পেশাব করা পরিত্যাগ করা শুরু হয়েছে সে সময় হতে আজ পর্যন্ত ধরা রোগ, গ্যাস, পেট ও পাকস্থলীর পীড়াগুলো বেড়ে চলছে। চলার দ্বারা অন্ত্রগুলোর নড়াচড়া বেড়ে যায়, যার দ্বারা পায়খানা পেশাব সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা পায়খানার মধ্যেই পেশাব করি এবং বাইরে চলে যাই না, এজন্য পায়খানা সহজ হয় না, যার কারণে পায়খানায় বেশি সময় থাকতে হয়।

২. রাসূল (সা) পায়খানা-পেশাবের জন্য কাঁচা এবং নরম জমিন বাছাই করতেন। এর মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। একটি বিশ্লেষণে দেখা যাক :

লিউভাল পল (Louval Poul) নিজের পুস্তক স্বাস্থ্য বিধিতে লিখেছেন : মানবতার স্থায়িত্ব মাটিতে এবং তার ধ্বংসও মাটিতে। যখন হতে আমরা মাটির ওপর পায়খানা-পেশাব করা ত্যাগ করে শক্ত জমিন (ফ্লাশ, কমোড এবং ডব্লিউ-সি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে শুরু করেছি। সে সময় হতে আজ পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যে জাতিগত দুর্বলতা এবং পাথরের প্রভাব বেড়ে গিয়েছে এবং এর প্রভাব পেশাবের গ্লান্ডস (Prostate Glands) এর ওপর পড়ে।

মূলতঃ যখন মানুষের দেহ হতে বর্জ্য বের হয় তখন মাটি এগুলোর জীবাণু এবং ক্ষতিকর প্রভাবগুলোকে লুফে নেয়। যেহেতু ফ্লাশ ইত্যাদিতে এ পদ্ধতি নেই। এজন্য ঐসব ক্ষতিকর জীবাণুর প্রভাব যা মাটি লুফে নিত, ফ্লাশে পেশাব করার কারণে এসব জীবাণুর প্রভাব দুবার আমাদের দেহের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং মানবদেহের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে রোগের দিকে ধাবিত হয়।

আরো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার লিখেন : নরম ও কর্ষিত জমিন সর্ব জিনিসকে শোষণ করে নেয়। যেহেতু পেশাব এবং পায়খানা জীবাণুযুক্ত বর্জ্য, এজন্য এমন জমিন দরকার যা এগুলোকে শোষণ করতে এবং একে ছিটার প্রতিবন্ধক হয়ে শরীর এবং দেহের ওপর পড়া হতে ফিরায়। যা ফ্লাশ টয়লেট দ্বারা হতে পারে না। সেখানেও ছিটার আশংকা রয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে বর্জ্যকে শোষণ করার কোনো গুণ নেই। ফ্লাশে পেশাব করার কারণে বর্জ্যের বাষ্প শোষণ হতে পারে না যার কারণে বর্জ্য হতে ভেসে আসা বাষ্প স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।

রাসূল (সা) পা ছড়িয়ে এবং বাম পায়ের ওপর জোর দিয়ে চুপ হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়খানা-পেশাব সারতেন। এ পদ্ধতির মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ফিজিওলজির একজন সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, আমি মারাকাশ ছিলাম। একজন ইহুদি ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। ডাক্তার যথেষ্ট বয়স্ক ছিলেন। যখন আমি আমার নাম লিখালাম তখন তিনি বলতে লাগলেন, আপনি কি মুসলমান? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। মুসলমান এবং পাকিস্তানিও।

ইহুদি ডাক্তার বলতে লাগলেন, তোমাদের পাকিস্তানে যদি স্বয়ং তোমাদের নবীর একটি পন্থা জীবিত হয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানিরা কয়েকটি রোগ হতে বাঁচতে পারবে। আমি কৌতুহলবশত ব্যাকুল হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম : ডাক্তার সাহেব সেটা কোনো পন্থা? ইহুদি ডাক্তার বললেন, পায়খানা পেশাবের পন্থা। যদি পায়খানা পেশাবের জন্য ইসলামী পদ্ধতিতে বসা হয় তাহলে এপেন্ডিসাইটিস, স্থায়ী ধরা রোগ পাইলস এবং গোর্দ্দার রোগ জন্ম নিবে না। যদি মুসলমান স্বয়ং নবী করিম (সা)-এর পদ্ধতিতে পায়খানা পেশাব সমাধা করে তাহলে এসব পীড়া হতে বাঁচতে পারে।

পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেন, আমি আমার নবী করিম (সা)-এর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। আমার আফসোস হলো যে, আমি দ্বীনি জ্ঞানার্জনের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করিনি যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় মাসয়ালাগুলো শিখে নিব। এ সময় আমার এ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ জন্মাল। আমি এ ইহুদি ডাক্তার-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম না। তবে মারাকেশে একজন দ্বীনি আলেম ছিলেন। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং রাসূল (সা)-এর পদ্ধতি জিজ্ঞেস করলাম যখন তিনি এ পদ্ধতি বর্ণনা করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন, তখনই আমি এরপর আমল শুরু করলাম। প্রথম প্রথম আমার সময় লাগল, কিন্তু এর উপকারিতা খুব শীঘ্রই আমার বুঝে আসল এবং এ সময় হতে আজ পর্যন্ত আমি পায়খানা পেশাবের জন্য ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করি। যে পদ্ধতিতে নবী করীম (সা) শিক্ষা দিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান নবী করীম (সা)-এর এই পায়খানা পেশাবের পদ্ধতির উপর ধারাবাহিক রিসার্চ (গবেষণা) করছে এবং বর্তমানে অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও এর উপকারিতা স্বীকার করছে।

স্বাস্থ্য এবং জীবন স্থায়িত্ব এবং সুন্দর ব্যবস্থার জন্য ইসলামের নবী করীম (সা)-এর প্রয়োজনীয় পদ্ধতির চেয়ে বড় কোনো পদ্ধতি নেই। ইসলামের নবী করীম (সা)-এর এ পদ্ধতির ওপর আমল করাতে গ্যাস, বদ হজম, ধরা রোগ এবং গোর্দ্দার বা কিডনী রোগগুলো বাস্তবেই কমে যায় এবং বিশেষ করে নবী করীম (সা)-এর পদ্ধতি আপনা-আপনি এসব পীড়াকে মূলোৎপাটন করেও দেয়।

রাসূল (সা) ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিল ব্যবহার করতেন এবং ঢিল বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করতেন। রাসূল (সা)-এর এ সুন্নাতের মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হলো :

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী মাটির মধ্যে উপকারী গ্যাসীয় মিশ্রণ এবং উন্নতমানের রোগ নিরাময়ের অংশ মওজুদ রয়েছে। যেহেতু পায়খানা ও পেশাব চরম প্রকারের বর্জ্য এবং এতে জীবাণু ভর্তি হয়ে থাকে এ কারণে এটা মানব চর্মে লাগা সবচেয়ে ক্ষতিকর। যদি এর কোনো অংশ চামড়ার ওপর লেপ্টে যায় অথবা হাতের ওপর রয়ে যায়, তাহলে অগণিত পীড়া হওয়ার আশংকা থাকে।

ডা. হালুক লিখেন : ঢিলের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দুনিয়াকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল কিন্তু বর্তমানে এ বাস্তবতা সামনে এসে গেছে যে, মাটির সকল অংশ জীবাণু ধ্বংসকারী। যখন ঢিলের ব্যবহার হবে তখন গোপন অঙ্গসমূহের ওপর মাটি লাগার কারণে এর উপর পর্যাপ্ত পরিমাণ লেগে থাকা সব জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। বরং গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাটির ব্যবহার লজ্জাস্থানের ক্যান্সার হতেও রক্ষা করে। আমি এমন কিছু রোগী দেখেছি যাদের লজ্জাস্থানে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন মাটির ঢেলা ব্যবহার করিয়েছি এবং তারা মাটির ঢেলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে বলেছেন তারা দ্রুত সুস্থতা লাভ করেছেন।

মোটকথা আমাদের সকল নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তারগণের এ সিদ্ধান্ত এই যে, এসব মাটির মানুষ পুনরায় মাটি হতে আরোগ্য লাভ করে। চাইলে পৃথিবীর সব ফর্মুলা ব্যবহার করুন, এদের মধ্যে শুধু ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পদ্ধতিগুলো দ্বারা রোগ হতে সুরক্ষা মিলবে।

আজকাল ইস্তিঞ্জা এবং পবিত্রতার জন্য টিস্যু পেপার অথবা টয়লেট পেপার ব্যবহৃত হয় এবং লোকেরা আগ্রহের সাথে এগুলোর ব্যবহার করে। সব লোকের ধারণা যে টয়লেট পেপারের চেয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার আর কিছুতে হয় না। অথচ টয়লেট পেপার দ্বারা কিছু না কিছু ময়লা শরীরের ওপর অবশিষ্ট থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যদি গোসলের প্রয়োজন হয় তাহলে লোকেরা এভাবে টয়লেট পেপার দ্বারা অবশিষ্ট ময়লার সঙ্গে পানিতে বসে যায়, যার দ্বারা শুধু ঐ রোগই বাড়ে না বরং পাত্রের সকল পানি ময়লা ও গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যা গোসলের জন্য ব্যবহার

করা যায় না। যদি এতদসত্ত্বেও মানুষ এর দ্বারা গোসল করে তাহলে তার সর্বশরীর নাপাক ও ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। এতো সেই পশ্চিমা সংস্কৃতি যার মধ্যে মানুষের ক্ষতি নিহিত। যা কোনো মুসলমানের পক্ষে কখনো অনুসরণীয় হতে পারে না। আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছিলেন–

'নতুন সংস্কৃতির ডিমগুলো পঁচা'।

টয়লেট পেপার প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরীর এক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট এক ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি এই সংশ্লিষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন : ভাই বলুন তো, এই নরম কোমল ও চিকন টয়লেট পেপার তৈরিতে কোনো মারাত্মক কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় কি? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলতে লাগলেন, ডাক্তার সাহেব! এগুলো তৈরিতে অগণিত কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়, কিছু কেমিক্যাল তো ক্ষতিকরের চূড়ান্ত, যার দ্বারা চর্ম রোগ, এক্সিমা এবং চর্মের রং পরিবর্তনের মতো রোগের জন্ম হয়ে থাকে।

এ সময়ে সব ইউরোপীয় টয়লেট পেপার ব্যবহার করছে। অতীত দিনের সংবাদে এ সংবাদ প্রচার করেছে যে, বর্তমানে ইউরোপে লজ্জাস্থানের রোগ বিশেষ করে লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এটা বন্ধের জন্য যখন গবেষণা বোর্ড বসল, তখন এ বোর্ডের রিপোর্ট মাত্র দুটি জিনিসের ওপর শামিল ছিল। বোর্ডের বক্তব্য হলো, এ ধ্বংসকারী পীড়াগুলো এবং লজ্জাস্থানের ক্যান্সার বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য টয়লেট পেপার ব্যবহার এবং পানি ব্যবহার না করার কারণে বেড়ে চলেছে। ইউরোপ আমাদেরকে কাগজের আকারে যে, তোহফা (উপহার) দিয়েছেন তা আমাদের জন্য লাভজনক না ক্ষতিকর তার ফায়সালা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর।

রাসূল (সা) ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিলা ব্যবহার করতেন, তারপর পানি ব্যবহার করতেন। শুধু পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করতেন, যেহেতু হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত। (সহীহ মুসলিম, ৬০৪ পৃ.)

রাসূল (সা) ইরশাদ করেন : পবিত্রতা অর্জনের জন্য পাত্র হতে পানি ডান হাত দ্বারা ঢেলো এবং পরিষ্কার করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করো। সাবধান! ইস্তিঞ্জা করার জন্য ডান হাত ব্যবহার করো না। যখন কোনো লোক পায়খানা পেশাবের জন্য যায়, তখন লজ্জাস্থান নিজ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না। (বুখারী খ-১ আরবী পৃষ্ঠা ২৭; সহীহ মুসলিম খ-১, আরবী, পৃষ্ঠা-১৩০)

৪৭. পরিবেশ

ENVIRONMENT

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আমাদের চারপাশের নোংরা আবর্জনা ও নানা প্রজাতির প্রাণীর মরদেহ যেখানে সেখানে ফেলে রাখার কারণে আমাদের চারপাশের বসবাসের পরিবেশ দূষিত ও মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার দূষিত আবর্জনা ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মরদেহ আগুনে জ্বালানীয় কালো ধোঁয়া মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে মানুষের দেহে মারাত্মক মারাত্মক রোগ বালাইয়ের সৃষ্ট করছে এবং এতে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে যে শুধু আমাদেরই মারাত্মক ক্ষতি করছে তাই নয় বরং এর দ্বারা আমাদের চার পাশের পরিবেশের আওতাভুক্ত সকল গাছপালা, পশু-পাখি ও উৎপাদিত শস্য ক্ষেতসমূহেরও মারাত্মক অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছে। তাই বিংশ শতাব্দীর কিংবদন্তির বিস্ময়কর বিখ্যাত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন যে, আমাদের পরিবেশ দূষণের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। তেল পুঁড়িয়ে গাড়ি চালানো এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে, পরমাণু শক্তির পরীক্ষা চালাতে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবীর উষ্ণতার মেরু ঝুঁকি। এ বিষয়টা নিয়ে বিশ্বব্যাপী হৈ চৈ চলছে, কিন্তু পৃথিবীকে শীতল রাখার উপযুক্ত কলাকৌশল এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আগামী একুশ শতকে বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন মানুষের শক্তি বাড়াবে ঠিক কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোনো প্রযুক্তি বের না হলে আমাদের বেঁচে থাকা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

তাই স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণকারী বিজ্ঞানীরা একাগ্রচিত্তে বলেন যে, আমাদের চারপাশের বসবাসযোগ্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর রাখার ইচ্ছা পোষণ করলে আমাদের পরিবেশের সকল সদস্যগণকে অবশ্যই তিনটি কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

১. আমাদের পরিবেশের চারপাশের যাবতীয় নোংরা, আবর্জনা ও নানা প্রজাতির প্রাণীর মরদেহ মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। কারণ মাটির মধ্যে নিশাধর নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, যা সর্বপ্রকার নোংরা, আবর্জনা ও সকল প্রজাতির প্রাণীর মরদেহের পঁচন কার্য ঘটায় এবং এদের সকল রোগ জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম।

২. যে সকল দূষিত নোংরা আবর্জনা মাটির নিচে পুঁতে রাখলেও ধ্বংস হয় না। যেমন– পলিথিন জাতীয় নানা আবর্জনা, সেগুলো অবশ্যই নিরাপদ স্থানে নিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩. সকল পায়খানা ও নর্দমার তরল ময়লা আবর্জনা অবশ্যই তার সবগুলোই মাটির নিচ দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যেন সেগুলো আমাদের চারপাশের পরিবেশের মুক্ত বায়ুকে স্পর্শ করতে না পারে, সেদিকে আমাদের সকলকেই তীব্র দৃষ্টি রাখতে হবে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত সব বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই আমাদের চারপাশের বসবাসযোগ্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তিনি পৃথিবীর সকল মানুষগণকে, তাদের চারপাশের যাবতীয় নোংরা, আবর্জনা ও সকল প্রকার প্রজাতির প্রাণীর মরদেহ মাটির নিচে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং তিনি এ ব্যাপারে অনেক পবিত্র কুরআনের বাণীও প্রদান করেছেন, তার কিছু বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো। যেমন–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۔

অর্থ : এবং আল্লাহ পাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকারীদেরকে পছন্দ করেন।
(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৩৪)

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ۔

অর্থ : যেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। এবং আল্লাহ পাকও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অর্জনাকারী লোকদেরকে ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন। (সূরা তওবা : আয়াত-১০৮)

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔ (سورة اليونس۔)

অর্থ : যারা (পৃথিবীতে) সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে

না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই জান্নাতবাসী, এমন সুন্দর পরিবেশে তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল। (সূরা ইউনুস : আয়াত-২৬)

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلنَّظَفَةُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ -

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ঈমানের একটি বিশেষ অংশ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا - (رواه مسلم)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মু'মিনদেরকে ঐ বিষয়ে আদেশ করেছেন যা তিনি রাসূলগণকে আদেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্যসমূহ হতে ভক্ষণ কর এবং ভালো কাজ কর। অর্থাৎ ভালো কাজ করে পৃথিবীতে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি কর। (সহীহহ মুসলিম হা/২৩৯৩)

সুতরাং ভালো কাজ বলতে বুঝিয়েছেন যে, পৃথিবীতে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪৮. পাগড়ি

TURBAN

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে,

১. মাথা ব্যথার জন্য পাগড়ী উপকারী।

২. নিয়মিত পাগড়ী ব্যবহার করলে স্থায়ী সর্দি কাশি হয় না। এবং তারা গবেষণা করে বলেন, পাগড়ির ঝুলন্ত প্রান্ত মেরুদণ্ড ফোলা রোগ হতে রক্ষা করে। পাগড়ির প্রান্ত দেহের নিম্নভাগের অর্ধাঙ্গ রোগ ও ধাতুর পরিবর্তনজনিত রোগ হতে রক্ষা করে।

৩. পাগড়ি পরিধানকারীদের প্রলাপ ও উন্মত্ততা রোগের আশংকা কম থাকে।

অথচ মহানবী (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই পাগড়ি ব্যবহারের কথা বলে গেছেন এবং তিনিও পাগড়ি ব্যবহার করতেন এবং তা ছিল তাঁর একটি সুন্নাত। তিনি তিন রঙের পাগড়ি ব্যবহার করতেন। যথা :

১. সাদা, ২. কালো এবং ৩. সবুজ

পাগড়ির ফযীলত ও উপকারিতা অনেক। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন যে, তোমরা পাগড়ি ব্যবহার কর। কেননা এর দ্বারা ধৈর্য্য ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও রণাঙ্গণে পাগড়ির দ্বারা সাহসিকতা ও বাহাদুরী বৃদ্ধি পায়, তাই মহানবী (সা) প্রায় সব যুদ্ধেই পাগড়ি ব্যবহার করতেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন তিনি মদিনা হতে কালো পাগড়ি পরিধান করে মক্কা অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। যেমন এ সম্পর্কে জাবির (রা) বলেন–

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ۔

অর্থ : জাবির (রা) বলেন যে, যে দিন মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথা মুবারকে কালো পাগড়ি পরিহিত ছিল। (তিরমিযী হা/১৭৩৫, কিতাবুল লিবাস)

নবী করীম (সা) আরো বলেছেন যে, পাগড়ী পরা আমার আদর্শ এবং যে ব্যক্তি পাগড়ী পরে এক রাকাত নামায পড়বে, সে পাগড়ী ছাড়া নামায পড়া ব্যক্তির চেয়ে সত্তরগুণ সওয়াব বেশি পাবে। (মিশকাত)

পাগড়ি

রাসূল (সা) তিন রং-এর পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সাদা, সবুজ, কালো। পাগড়ি হচ্ছে রাসূল (সা)-এর সুন্নত। পাগড়ি ব্যবহার করার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

১. পাগড়ী ব্যবহারকারীর মাথা রোদের প্রখর উত্তাপ হতে নিরাপদ থাকে।
২. পাগড়ী ব্যবহারকারী সর্দি হতে রক্ষা পায়।
৩. মাথা ব্যথা রোধের জন্যে পাগড়ী অত্যন্ত উপকারী যারা পাগড়ী ব্যবহার করে তাদের সাধারণত মাথা ব্যথা হয় না।
৪. পাগড়ী মস্তিষ্কের শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে।
৫. পাগড়ীর পেছনের ঝুলে থাকা অংশের কারণে ঘাড়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। স্পাইনাল কর্ডকে শীত, গরম এবং ঋতু পরিবর্তন জনিত প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষা করে।
৬. পাগড়ী ব্যবহারকারী ব্যক্তি মেনিনজাইটিস হতে নিরাপদ থাকে।
৭. ফিজিওলজী বিশেষজ্ঞদের মতে, স্পাইনাল কর্ড নিরাপদ থাকার কারণে দেহের নার্ভ সিস্টেম এবং মাসল সিস্টেম নিরাপদ থাকে।

সাদা গাগড়ী ব্যবহারের কারণে মস্তিষ্কের কোষসমূহ গরমের উত্তাপ এবং লু-হাওয়া হতে রক্ষা পায়। সাদা পাগড়ী ব্যবহারকারী ব্যক্তি সানস্ট্রেনকসহ মস্তিষ্কের বিভিন্নপ্রকার রোগ ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকে। আমার পরিচিত ফয়সালাবাদের এক লোক বলেছেন, আমি স্থায়ী সর্দি এবং মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। একজন ডাক্তার আমাকে পাগড়ী ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। আল্লাহর রহমতে এতেই আমার রোগ ভালো হয়ে যায়। পাগড়ী ব্যবহারের ফলে মানুষকে অভিজাত এবং অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হয়।

পাগড়ি এবং মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ

রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা পাগড়ী বাঁধো, এতে তোমাদের ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পাবে (ফতহুল বারী)

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার আযিয আহমাদ বলেন, উচ্চ ডিগ্রি লাভের জন্যে আমি বিদেশে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, লোকেরা মানসিক রোগ হতে নিরাপদ থাকার জন্যে মাথায় পাগড়ির মতো একখণ্ড কাপড় বেঁধে রাখছে। আমি দেখে বললাম আরে এতো পাগড়ী তারা যেভাবে বেঁধেছিলো আমাদের রাসূল (সা) সেভাবেই পাগড়ী বাঁধতেন।

তাদের সাথে কথা বলে জানা গেল, মানসিক রোগ হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তারা এভাবে পাগড়ি বেঁধে রাখছে। আমি বললাম, আপনারা যেভাবে মাথায় কাপড় বেঁধেছেন এটা তো সেই পাগড়ীর মতো, যে পাগড়ী আমাদের রাসূল (সা) মাথায় বাঁধতেন। পাগড়ীর মতো এ কাপড় তারা মাথায় এ উদ্দেশ্যে বাঁধতেন যে বিপদে পড়ার পর মানুষ ধৈর্য হারিয়ে না ফেলে। তাছাড়া এ পাগড়ী ব্যবহারের কারণে এদেশের মানুষ যেন নানা প্রকার মানসিক রোগ হতে নিরাপদ থাকতে পারে।

শত শত বছর আগে আমাদের রাসূল (সা) যে কথা বলেছিলেন, বর্তমান বিজ্ঞান সে বিষয়েই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪৯. ফুঁক

PUFF OF BREATH

রসায়ন শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের 'ফুঁক'-এর মধ্যে বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও দেহের আরও নানা প্রকার রোগ জীবাণু থাকে। কোনো মানুষ যখন কোনো খাদ্য দ্রব্য অথবা কোনো পানীয়ের খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ফুঁক দেয়, তখন সেই খাদ্য দ্রব্য উক্ত বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও উক্ত অন্যান্য রোগ জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়ে যায় এবং তখন সেই খাদ্য সে নিজে ভক্ষণ করলে অথবা অন্যকে খাওয়ালে তাদের উভয়ের দেহে নতুন সমস্যা অথবা নতুন কোনো রোগের সৃষ্টি হতে পারে। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল মানুষকে ফুঁক দিয়ে কোনো খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় খাদ্য দ্রব্য পান করতে নিষেধ করেছেন।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত রসায়ন শাস্ত্রবিদদের বহুপূর্বেই ফুঁক দিয়ে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করতে নিষেধ করে গেছেন। যেমন–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهٰى عَنِ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ اَلْقَذَاةُ اَرَاهَا فِى الْاِنَاءِ فَقَالَ اَهْرِقْهَا۔

অর্থ : আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) পানি জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ফুঁক দিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, যদি এর মধ্যে ময়লা দেখি, তখন তিনি বললেন, তবুও এর মধ্যে ফুঁক দিবে না, এরপর তিনি বললেন, ইহা হতে উক্ত ময়লাসহ একটু ফেলে দিয়ে পান করবে। (এখানে ময়লা বলতে খড় কুটা)

(তিরমিযী, হাদীস /১৮৮৭, ২য় খণ্ড ১১ পৃষ্ঠা আবুওয়াবুল আশরাবা)।

৫০. ফিজিওথেরাপি
(PHYSIO THERAPY)

ফিজিওথেরাপির বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যদি কোনো মানুষ পৃথিবীর যে কোনো ভাষার শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করার সময় সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে তবে তার জীবনে কখনও তার মুখ দিয়ে লেবরা বা লালা পড়বে না বা আসবে না। ইতিমধ্যে ফিজিওথেরাপির বিজ্ঞানীরা তা পরীক্ষা করে তার প্রমাণও দেখেছেন।

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত ফিজিওথেরাপির বিজ্ঞানীদের প্রায় দেড় হাজার বৎছর পূর্বে তাঁর উম্মতদেরকে পবিত্র কুরআনকে তাঁর প্রতিটি হরফের মাখরাজ আদায় করে উক্ত কুরআনের প্রতিটি শব্দকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে সঠিকভাবে তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এবং তিনি বলেছেন যে, কুরআন তেলাওয়াত করা হচ্ছে সর্বপ্রকার রোগ ব্যাধি হতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়।

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا "এবং কুরআন পাঠ করুন সুবিন্যাস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।" (সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-৪)

মহানবী (সা)-এর হাদীস যেমন–

حَدَّثَنَا سَعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ اَلْقُرْاٰنُ - (ابن ماجه جلد الثانى صفه • ابواب الطب)

অর্থ : আলী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, উত্তম চিকিৎসাসমূহের মধ্যে (সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা) হচ্ছে পবিত্র কুরআন শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করা। (ইবনে মাজা ২য় খণ্ড-২৫০ পৃষ্ঠা)।

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন যে ব্যক্তি সহীহ শুদ্ধ করে একটু উচ্চশব্দে পাঠ করবে, তার কখনও মুখ দিয়ে লালা পড়বে না, ব্রেইন স্ট্রোক করবে না, মাথা ব্যথা করবে না, হার্ড স্টোক করবে না, তাঁর কখনও রক্তচাপজনিত রোগ হবে না, মুখ বাঁকা হবে না এবং তার মন সদা সতেজ ও প্রফুল্ল থাকবে। তাই মহানবী (সা) বলেছেন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতই হচ্ছে সর্বরোগের জন্য উত্তম চিকিৎসা।

৫১. বিশ্রাম
(REST)

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দুপুরে খাদ্য খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া এবং রাতে শোয়ার পূর্বে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এতে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে এবং শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়। আর খাদ্য খাওয়ার পরই পরিশ্রম করা উচিত নয়। এ সময় আমাদের তন্ত্রীগুলো পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকে। নিদ্রাকালে আমাদের শরীর ও মন বিশ্রাম পায়। প্রকৃতপক্ষে নিদ্রা আমাদের মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেয়। তবুও মস্তিষ্কের কিছু অংশ কর্মরত থাকে বলে আমরা স্বপ্ন দেখি। যদি স্বপ্নবিহীন নিদ্রা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করেছে। কিন্তু মেরুরজ্জু এবং স্বয়ং সচল যন্ত্রগুলো নিদ্রার মধ্যেও কাজ করে। সুতরাং আমাদের শরীরের গোশতপেশী বিশেষ করে মস্তিষ্কের ক্ষয় পূরণের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন। এ সময় দেহতন্ত্রের জীবকোষগুলোর পূর্ণ গঠন ও বৃদ্ধি সাধন হয়ে থাকে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই দুপুরের বিশ্রাম প্রসঙ্গে এবং রাতে শোয়ার পূর্বে হাঁটার বিকল্প হিসাবে এশার নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করে হাদীস বলে গেছেন। যেমন–

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمِيْدٌ عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنُقَيْلُ بَعْدَ الْجُمْعَةِ ـ (كُتَاب البخارى جلد اول صفه كتاب الجمعة)

অর্থ : আনাস (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা সকাল সকাল জুমআর নামায আদায় করি, তারপর আমরা জুমআর নামাযের পর বিশ্রাম গ্রহণ করি। (কিতাবুল বুখারী হা/৯০৫, ১মখণ্ড-১২৩ পৃষ্ঠা কিতাবুল জুমআ।)

حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ اَبِيْ الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِيْ بُرْزَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثُ بَعْدَهَا ـ (جامع البخارى جلد اول صفه كتاب الصلوة)

অর্থ : আবু বুরজা (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) এশার নামায আদায় করার পূর্বে ঘুমানো এবং এশার নামায আদায় করার পর গল্প গুজব করা অপছন্দ করতেন। (বুখারী হা/৫৬৮, ১ম খণ্ড-৮০ পৃষ্ঠা কিতাবুস সলাত।)

এছাড়াও বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে বলেন যে, নিয়মিত বিশ্রাম করুন ও দিনের কিছু সময় নিরিবিলি কাটান এবং ব্যায়াম করুন। এতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মহানবী মুহাম্মদ (সা) এই পৃথিবীর মানুষদেরকে সুস্থ থাকার জন্য যে নামাযের ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তাই হচ্ছে সুস্থ থাকার জন্য বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের উপদেশ। কারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নিয়মিত নামাযের মধ্যে নিয়মিত বিশ্রাম আছে এবং নিয়মিত নিরিবিলি সময় কাটানোর ব্যবস্থাও আছে এবং নিয়মিত ব্যায়ামেরও ব্যবস্থা আছে। সুতরাং দেখা যায় যে, নামাযই হচ্ছে একমাত্র স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের সুস্থ থাকার জন্য একমাত্র বিকল্প উপায়।

৫২. জান্নাত
(HEAVEN)

জান্নাত কি? এর পরিচয় প্রদান করে মহানবী মুহাম্মদ (সা) একটি বিশেষ হাদীস বলেছেন, যেমন–

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتُ عَنْ زِيَادٍ الطَّائِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَدْخُلَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْاَسَ . وَيُخَلِّدُ لَا يَمُوْتُ . وَلَا تُبْلٰى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنِىْ شَبَابُهُمْ ـ (ترمذى جلد ثانى صفه ابواب صفت الجنة)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে এবং সেখানে তার কখনো মরণ হবে না এবং সেখানে তার পরিধানের কাপড় কখনো পুরাতন হয়ে ছিঁড়ে যাবে না, এবং সেখানে তার যৌবন শক্তির কখনো কমতি হবে না। (তিরমিযী হা/২৫২৫, ২য় খণ্ড ৭৯ পৃষ্ঠা ছিফাতে জান্নাত অধ্যায়।)

এছাড়াও হাদীসের আলোকে কথিত আছে যে, জান্নাত হচ্ছে চির শান্তির আবাসস্থল, সেখানে সময় স্থির, তাই সেখানে সময়ের কোনো হিসাব নেই,

সেখানে জান্নাতবাসীরা যখন আল্লাহ্‌পাককে এক নজর দেখবে, সেই এক নজর সময় হবে আমাদের এই পৃথিবীর চল্লিশ হাজার বৎছর, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর এক এক মুহাব্বত তাদের নিকট এক মিনিট মনে হবে, অথচ ইহা আমাদের এই পৃথিবীর সত্তর হাজার বৎছরের সমপরিমাণ হবে। অর্থাৎ জান্নাত মানুষ এমনি আনন্দে থাকবে, যার প্রভাবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বৎছর তাদের নিকট পৃথিবীর এক সেকেণ্ডের চেয়ে দীর্ঘ মনে হবে না। সেখানে জান্নাতবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কিছু হবে না, সেখানে যা কিছু হবে তার সবই জান্নাতবাসীদের ইচ্ছার পক্ষেই হবে। যেমন জান্নাতবাসীরা সেখানে যখন যা চাবে, তখনি তা পাবে, যখন যা খেতে চাবে, তখনি তা পাবে, কিন্তু খাওয়ার পর সেখানে তাদের কখনো পেশাব পায়খানা হবে না, সেখানে খাওয়ার পর তাদের একটি ঢেঁকুর আসবে, সেই ঢেঁকুরই তাদের পেটের যাবতীয় খাবারের বর্জ্য বাষ্প হয়ে বের হয়ে যাবে এবং তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। সেখানে তাদের শরীর কখনো নাপাক হবে না। সেখানকার পরিবেশের কখনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ সেখানকার মানব-দানব, গাছপালা, পশুপাখি, ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের কখনো কোনো পরিবর্তন হবে না। আল্লাহ্‌পাক যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তা সদা একই অবস্থায় থাকবে। কখনো পুরাতন ও নষ্ট হবে না।

মহানবী (সা)-এর উল্লেখিত হাদীসটির সত্যতা প্রমাণ করার পক্ষে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন যে, যখন তুমি অতি সুখের আনন্দে গল্প কর, তখন তোমার নিকট এক ঘণ্টা এক মিনিট মনে হয়, আর যখন তুমি তীব্র ক্ষুধায় খাদ্য সামনে রেখে কারো জন্য এক মিনিট অপেক্ষা কর তখন তা তোমার নিকট এক ঘণ্টা মনে হয়, এটাই হচ্ছে আমার রিলিটিভিটি মতবাদ বা আপেক্ষিক তত্ত্ব। আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিক তত্ত্বই প্রমাণ করে যে, জান্নাতের এক এক মুহূর্ত পৃথিবীর হাজার হাজার বৎছরের চেয়ে বিশাল, কারণ জান্নাত হচ্ছে সীমাহীন শান্তি ও আনন্দের অবাসস্থল।

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরো বলেন যে, আমাদের এই পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস নামে দু'টি জীবাণু পদার্থ আছে, যাদের প্রভাবে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের সবই সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, পুরাতন হচ্ছে এবং রূপান্তর হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যদি এই পৃথিবীতে ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস জীবাণু না থাকত, তবে পৃথিবীতে কখনো

কারো সৃষ্টি-ধ্বংস পুরাতন ও রূপান্তর হতো না, মহান আল্লাহ পাক যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সে সদা একই অবস্থায় বিরাজ করত। এতে প্রমাণ করে যে, জান্নাতে ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের কোনো প্রভাব নেই, অর্থাৎ সেখানে মিকাঈল (আ)-এর সৃষ্টি এবং আজরাঈল (আ)-এর ধ্বংস ক্রিয়ার কোনো কাজ নেই, তাই সেখানে কখনো কারো সৃষ্টি বা জন্ম নেই, ধ্বংস বা মৃত্যু নেই, পুরাতন বা নষ্ট নেই, রূপান্তর বা পরিবর্তন নেই। মহান আল্লাহপাক যাকে যে অবস্থায় রাখছেন, সে সদা একই অবস্থায় থাকবেন।

জান্নাতে কখনো কারো ক্ষুধা লাগবে না, পিপাসা লাগবে না। কোনো প্রকার অস্থির ক্লান্তি লাগবে না। কখনো কোনো রোগ হবে না, এর মূল কারণ হচ্ছে, জান্নাতে ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের কোনো অস্তিত্ব নেই, পৃথিবীতে ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস আছে বলেই পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবন-মরণ, ধ্বংস, ক্ষুধা, পিপাসা, অস্থিরতা, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ বালাই ইত্যাদি আছে। জান্নাতে সবকিছু তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, যদি কেউ ইচ্ছা করে খাবো না, পান করবো না, পৃথিবীর হাজার হাজার বৎছসর চলে যাবে তাতেও কোনো ক্ষুধা লাগবে না, পিপাসা হবে না, এর মূল কারণই হচ্ছে সেখানে ব্যাকক্টেরিয়া ও ভাইরাসের কোনো প্রভাব নেই। প্রকাশ থাকে যে, যদি পৃথিবীতে শুধু ভাইরাস থাকত তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ হিমালয় পর্বতের ন্যায় বিশাল থাকত এবং এরপরও আরো বিশাল হওয়ার ধারা অব্যাহত থাকত। যদি পৃথিবীতে শুধু ব্যাক্টেরিয়া থাকত তাহলে পৃথিবীতে কোনো জীব ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব থাকত না। সুতরাং ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস আছে বলেই পৃথিবীতে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু আছে।

তা-হলে জান্নাত কোথায়, কত বড়? মহান আল্লাহপাকের আটটি জান্নাতই মহান আল্লাহপাকের আরশে আযীমের নিচে ও এর চারপাশে অবস্থিত এবং ঠিক আরশে আযীমের নিচেই জান্নাতুল ফেরদাউস অবস্থিত এবং এক জান্নাত হতে অন্য জান্নাতের দূরত্ব কোটি কোটি ফেরেশতাবর্ষ মাইল এবং এক ফেরেশতা বর্ষ মাইল হচ্ছে– $9\times10^{20}\times6\times10^{12} = 54\times10^{32}$ অর্থাৎ ফেরেশতাদের গতিবেগ এক বৎসরে 540000, 0000000, 0000000, 0000000, 0000000, 00000, 00000, মাইল, অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার, কোটি × কোটি × কোটি × কোটি মাইল। জাহান্নামের আলোচনায়

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জান্নাতের আয়তন কত বড় তা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে জান্নাতের প্রস্থ সম্পর্কে মহান আল্লাহপাক বলেন, জান্নাতের প্রস্থ হচ্ছে পৃথিবীর মাটি হতে উপরে আকাশের ছাদ পর্যন্ত বিশাল অর্থাৎ জান্নাতের প্রস্থ হচ্ছে এক আকাশ হতে অন্য আকাশ পর্যন্ত। যেমন– মহান আল্লাহপাকের বাণী–

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ-

অর্থ : এবং জান্নাত যার প্রস্থ হচ্ছে যেমন– আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের সমপরিমাণ দূরত্বের সমান। (সূরা হাদীদ : আয়াত-২১)

প্রকাশ্য থাকে যে, এক আকাশ হতে অপর আকাশের দূরুত্ব পথ হচ্ছে পাঁচশত ফেরেশতা বর্ষ মাইল, যেমন এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস। যেমন–

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ السَّمْحِ عَنْ عِيْسٰى بْنَ هِلَالٍ الصَّدِ فِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ وَهِيَ مُسَيْرَةٌ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ- (الترمزى جلد ثانى صفة جهنم)

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আ'স (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, আকাশ হতে পৃথিবীর বুকের মাটি পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বৎছরের পথ। অর্থাৎ, এক আকাশ হতে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত ফেরেশতাা বর্ষ মাইল।

(তিরমিজি হা/২৫৮৮, ২য় খণ্ড ৮৬ পৃষ্ঠা আবুওয়াবুস ছিফাতু জাহান্নাম)

এবং এক জান্নাত হতে অন্য জান্নাতের দূরুত্ব কোটি × কোটি ফেরেশতা বর্ষ মাইল, তবে ফেরেশতাদের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে কত তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেও জানে না। তবে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর $E=MC^2$এই সূত্রের সাহায্যে ফেরেশতাদের প্রতি সেকেন্ডে গতিবেগের একটি সম্ভাব্য ধারণা দেওয়া হলো। যেমন–

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখান যে, পদার্থ ও শক্তি প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। M ভর বিশিষ্ট কোনো বস্তুকে বা, কোনো পদার্থকে কোনো উপায়ে ধ্বংস করতে পারলে ইহা হতে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এবং এই শক্তির পরিমাণ হল, $E=MC^2$। এখানে "C" হল আলোকের বেগ। ইহা এক বিস্ময়কর সূত্র। উপরের সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করলে দেখা যায় যে, এক গ্রাম ভরের কোনো পদার্থ হতে প্রাপ্ত শক্তি $1\times (3 \times10^{10})^2 = 9 \times 10^{20}$ আর্গ। অর্থাৎ এক কেজি ওজনের কোনো পদার্থকে কোনো উপায়ে ধ্বংস করলে ইহা হতে 9×10^{20} কেজির সমপরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

$E=MC^2$ এই সূত্রের দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায় যে, আলোর স্বাভাবিক গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে 186000 হাজার মাইল। তাহলে এই আলোর ভর ধ্বংস করে এর দ্বারা মহান আল্লাহ্ পাক যে ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, তার গতিবেগ আলোর চেয়ে প্রতি সেকেন্ডে হবে $9 \times 10^{20}\times 186000 = 1674 \times 10^{23}$ মাইল। অর্থাৎ ফেরেশতাদের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 1674000, 00000, 00000, 00000, 00000 মাইল। অর্থাৎ ষোল হাজার সাতশত চল্লিশ লক্ষ, লক্ষ, লক্ষ কোটি মাইল।

তাহলে ফেরেশতারা প্রতি সেকেন্ডে যায় 1674×10^{23} মাইল, তা হলে ফেরেশতারা এক বৎসরে যায় $9 \times 10^{20} \times 6 \times 10^{12} = 54 \times 10^{32}$ মাইল। অর্থাৎ ফেরেশতাদের গতিবেগ এক বৎসরে 540000, 0000000, 0000000, 0000000, 0000000 কোটি মাইল। অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার, কোটি × কোটি × কোটি × কোটি মাইল।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালার এক একটি জান্নাত বিশাল বিশাল, তাই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির শুরু হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত কোটি ×কোটি মানুষ সৃষ্টি হবে তার প্রত্যেকটি মানুষকে এই পৃথিবীর দশটি পৃথিবীর সমপরিমাণ জায়গা দেওয়া আল্লাহপাকের শুধু একটি জান্নাতের একটি কোণের অংশ পরিপূর্ণ হবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা যাকে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতটি প্রদান করবেন সেটাও আমাদের এই পৃথিবীর আয়তনের দশগুণ সমপরিমাণ হবে। যেমন– এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস। যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّیْ لَاَعْرِفُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ وَخُرُوْجًا مِّنَ النَّارِ رَجُلٌ يَّخْرُجُ مِنَ النَّارِ زَحْفً فَيُقَالُ لَهُ اِنْطَلِقْ فَاِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ـ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ اَخَذُوْا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِیْ كُنْتَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ! فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَتَمَنّٰى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِیْ تَمَنَّيْتَ وَ عَشَرَةَ اَضْعَافِ الدُّنْيَا ـ (مسلم شريف كتاب الايمان)

অর্থ : আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জাহান্নাম হতে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি চিনি, তার অবস্থা হবে এই যে, সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম হতে বের হবে, তাকে বলা হবে চল, যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে পূর্ব হতেই সকল মানুষ জান্নাতে স্ব-স্বস্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে বলা হবে তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে, যে সময় তুমি জাহান্নামে ছিলে? সে বলবে হ্যাঁ! তখন তাকে বলা হবে চাও, সে চাইবে তখন তাকে বলা হবে তোমার জন্য রয়েছে তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সাথে আরও তোমাকে এই দুনিয়ার দশ দুনিয়ার সমান সমপরিমাণ জায়গা দেওয়া হলো।

(মুসলিম, হা/৪৮০, কিতাবুল ঈমান)

তাহলে জান্নাতের দৈর্ঘ্য কত বিশাল তা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কেউ জানে না, আল্লাহপাক যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন, তারপর জান্নাতকে হুকুম দিলেন, বড় হতে থাকো, তারপর জান্নাত বড় হতে শুরু করল, অদ্যাবধি সে জান্নাত বড় হতেই চলেছে, তা হলে বুঝা যায় যে, জান্নাত অনেক বিশাল।

জান্নাত হচ্ছে একশ তালা এবং এক তালা হতে অপর তালার দূরত্ব এক আকাশ হতে অন্য আকাশ পর্যন্ত বিশাল। যেমন– এ ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর একটি বিখ্যাত হাদীস নীচে বর্ণনা করলাম।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـ (ترمذى جلد الثانى صفه ابواب صفت الجنة)

অর্থ : মুয়াজ বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে একশটি তলা আছে এবং প্রত্যেকটি তলার মাঝের দূরত্ব হচ্ছে– আকাশ ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

(তিরমিযী হা/২৫৩০, ২য় খণ্ড-৭৯ পৃষ্ঠা আবুওয়াবু ছিফাতুল জান্নাত)

জান্নাতের প্রত্যেকটি স্তরেই মহান আল্লাহপাক অসংখ্য গাছ-পালার বাগানসমূহ দ্বারা সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং উক্ত বাগানগুলির এক একটি গাছ এতোই বিশাল যে, তার এক একটি গাছের ছায়া অতিক্রম করতে একটি শক্তিশালী ঘোড়া একশত বৎসর দ্রুত দৌড়িয়েও শেষ করতে পারবে না। যেমন– এ সম্পর্কে মহানবী (সা) একটি বিখ্যাত হাদীস বলেছেন–

حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ - لَا يَقْطَعُهَا -

অর্থ : আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে যে বৃক্ষ আছে, যার একটি গাছের ছায়া একটি শক্তিশালী ঘোড়া একশ বৎসর দ্রুতগতিতে দৌড়িয়েও শেষ করতে পারবে না।

(বুখারী হা/৬৫৫২, ১ম খণ্ড ৪৬১ পৃষ্ঠা কিতাবু বা'দ ইল খালক।)

যেখানে কাজ আছে সেখানে সময় আছে, বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন যে, প্রত্যেক কাজের গতির সাথে সময় রিলেটিভ বা সম্পৃক্ত অর্থাৎ কাজ না থাকলে সময়ের কোনো হিসাব নেই। এছাড়াও বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত বিজ্ঞানী উইলিয়াম স্টিফেন হকিং বলেছেন যে, সময় হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রতিটি কাজের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত হিসাবের মাপকাঠি মাত্র এবং মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তুরই শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একটি নির্ধারিত গতি আছে যা সময় নামে পরিচিত। এছাড়া সময়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়ের বহুপূর্বেই বলে গেছেন যে, জান্নাতে কারো কোনো কাজ নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তাই সেখানে সময়েরও কোনো হিসাব নেই, তাহলে জান্নাতবাসীদের অনন্তকাল সময় অতিবাহিত হবে কিভাবে? এটাই জানার মূল বিষয়– জান্নাত মহান আল্লাহপাক জান্নাতবাসীদের জন্য অসংখ্য দর্শনীয় স্থান সৃষ্টি করে রেখেছেন, এক এক দর্শনীয় স্থানে যখন

জান্নাতবাসীরা বেড়াতে যাবে, সেখানে তারা মহান আল্লাহপাকের সীমাহীন সৃষ্টির সৌন্দর্যের কলাকৌশল দেখে আনন্দে এমনিভাবে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, এতে তাদের এই পৃথিবীর কোটি কোটি বৎসর পার হয়ে যাবে, যা তখন তাদের কাছে ক্ষণকাল মনে হবে। যেমন– অতি আনন্দের গল্প করার সময় এক ঘণ্টা একমিনিট মনে হয়।

এই কোটি কোটি বৎসরে তারা যদি কিছুই না খায়, কিছুই পান না করে, তাতে তাদের কোনো ক্ষুধা লাগবে না। কোনো পিপাসা লাগবে না এবং কোনো ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করবে না। কারণ সেখানে জন্ম-মৃত্যু বা ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের কোনো প্রভাব নেই। এভাবেই তাদের সেখানে কোটি কোটি বৎসর পার হতেই থাকবে, যা তাদের কাছে সাদা ক্ষণকাল, ক্ষণকাল মনে হতেই থাকা অব্যাহত থাকবে।

উপরোক্ত জান্নাতের শান্তি প্রত্যেক মুমিন মুসলমানগণ তাদের মৃত্যুর পর হতেই পেতে থাকবে, যেমন মহান আল্লাহপাক বলেছেন– প্রত্যেক মুমিন মুসলমানগণ তার মরণের পর হতে "ইল্লিনে" বসবাস করবে। "ইল্লিন" হচ্ছে হাশরের হিসাব-নিকাশের পূর্বে মুমিনদের বাসস্থান, যা আল্লাহপাকের বেহেস্তেরই একটি মহান বিকল্প ব্যবস্থা।

৫৩. ব্যাঙের ছাতা
(MUSHROOM)

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কোনো এক সময় কিছু ব্যাঙের ছাতা নামক জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতেছিলেন, তখন হঠাৎ তার নজরে এলো যে, এক ধরনের ব্যাঙের ছাতা জীবাণুদের বাড়তে দিচ্ছে না। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সে ধরনের ব্যাঙের ছাতা লেবু জাতীয় ফলের গাছে জন্মায় এবং তখনকার লোকের নিকট এই জাতীয় ব্যাঙের ছাতা নোটেটাম ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত ছিল। অবশেষে তিনি এই ব্যাঙের ছাতা হতেই ১৯২৮ইং সালে পেনিসিলিন নামে এক প্রকার অ্যান্টিবাইওটিক ঔষধ আবিষ্কার করেন। এবং তিনি এর উপর ১৯৪৫ইং সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এরপর বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহে আরও নানা প্রজাতির ব্যাঙের ছাতা নিয়ে গবেষণা করেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান আবিষ্কার করেন স্ট্রেপটোমাইসিন, বা প্রধানত যক্ষ্মার ঔষধ নামে পরিচিত। এরপর আরও বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙের ছাতা নিয়ে পরীক্ষা করে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সিম্পসন ও হারিসনদ্বয় ক্লোরোফরম আবিষ্কার করেন। তারপর আরও নানা প্রজাতির জীবাণুমূলক ব্যাঙের ছাতা খুঁজে বের করে তৈরি হল আরও নানা ঔষধ যেমন অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসিন, টেরামাইসিন ইত্যাদি এবং এই ব্যাঙের ছাতা দ্বারা বর্তমানে আরও নতুন ঔষধ বের হয়েছে। যেমন- এফিড্রিন, এরিথ্রোমাইসিন ও টেট্রাসাইক্লিন, এছাড়া আরও নানা ঔষধ।

এ্যালকোহল, পাউরুটি, কেক, জৈব এ্যাসিড ও ভিটামিন "ডি" উৎপাদনে ব্যাঙের ছাতার ব্যবহার হয়ে থাকে। শস্য নষ্টকারী কীট পতঙ্গ দমনে আইজেরিয়া নামে এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা কাজে লাগে। প্লাস্টিক ও বন্ধক কণিকার উৎপাদনে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙের ছাতার ব্যবহার হয়ে থাকে।

বর্তমানে এক জাতীয় ব্যাঙের ছাতা সবজি হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে ঐগুলো সম্পর্কে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সবজি জাতীয় ব্যাঙের ছাতা এক ধরনের সুস্বাদু সবজি যাতে মাছ গোশতের চেয়ে দ্বিগুণ প্রোটিন রয়েছে। এতে স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদান নেই বলে ব্যাঙের ছাতা ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ জনিত রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। স্যুপ,

গোশত সালাদ কিম্বা যে কোনো তরকারীতে ব্যাঙের ছাতা ব্যবহার করা যায়। প্রকাশ থাকে যে, কচুর মধ্যে যেমন জাতি কচু ও অজাতি কচু আছে ঠিক তেমনি সবজি জাতীয় ব্যাঙের ছাতার মধ্যেও একটি মিঠা জাতীয় ব্যাঙের ছাতা অপরটি বিষাক্ত জাতীয় ব্যাঙের ছাতা। যেটি মিঠা জাতীয় ব্যাঙের ছাতা সেইটি আমরা সুস্বাদু সবজি জাতীয় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু যেটি বিষাক্ত জাতীয় ব্যাঙের ছাতা সেটি অবশ্যই আমাদের বর্জন করতে হবে, কারণ ইহা খেলে মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে। তাই ইহা গ্রহণ করার সময় জেনে শুনে অথবা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে গ্রহণ করতে হবে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত চিকিৎসা ও খাদ্য পুষ্টি বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার ও খাদ্য হিসাবে ইহার গ্রহণ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ.

অর্থ : সাঈদ বিন জায়েদ (রা) বলেন যে, আমি মহানবী (সা) কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেছেন, ব্যাঙের ছাতা এসেছে "মান্না" হতে এবং ইহার পানি বা ড্রপ চোখের চিকিৎসার জন্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

(বুখারী হা/৫৭০৮, ২য় খণ্ড-৮৫ পৃষ্ঠা কিতাবুত তিব্ব)

এই হাদীসে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মহানবী (সা) বলেছেন, ব্যাঙের ছাতা এসেছে মান্না হতে, মান্না ছিল মূসা (আ.)-এর আমলে আল্লাহপাকের রহমতস্বরূপ এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য যা মূসা (আ.) আল্লাহপাকের নিকট প্রার্থনা করে পেয়েছিলেন। তা দেখতে প্রায় ব্যাঙের ছাতার মতোই ছিল, এবং তা ব্যাঙের ছাতার মতোই মাটিতে বা গাছের গোড়ায় বা ডালে উৎপাদিত হত। তাই মহানবী (সা) বলেছেন যে, ব্যাঙের ছাতা এসেছে মান্না হতে । সুতরাং মান্না যেহেতু সুস্বাদু খাদ্য ছিল, তাই তার উত্তরসূরী হিসেবে ব্যাঙের ছাতাও সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে গণ্য হবে।

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা ব্যাঙের ছাতা দিয়ে নানা ঔষধ তৈরি করেছেন এবং সবজি জাতীয় খাদ্য হিসেবে খাচ্ছেন, অথচ মহানবী (সা) তাদের বহুপূর্বেই তা পৃথিবীর মানুষদেরকে বলে গেছেন ব্যাঙের ছাতার পানি চোখের ঔষধ এবং ইহা এসেছে "মান্না" জাতীয় খাদ্যের বিকল্প হিসাবে তাই ইহা দেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে খাদ্য হিসেবে খাওয়া যাবে।

বর্ষা ও বরফ.৫৪
(RAINY SEASON AND ICE)

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বছরের যে সময়গুলিতে পৃথিবী সূর্যের দিকে সামান্য হেলে থাকে, সেই সময়গুলিতে, পৃথিবীতে গরমকাল বিরাজ করে। এবং বছরের যে সময়গুলিতে পৃথিবী সূর্য হতে সামান্য দূরে হেলে থাকে, সেই সময়গুলিতে পৃথিবীতে শীতকাল বিরাজ করে।

তাই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন পৃথিবীতে গরমকাল আসতে থাকে ঠিক তখন হতেই পৃথিবীর বরফ গলতে থাকে এবং সেই বরফ গলার পানি নদীতে পড়তে থাকে, এতে নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, যাকে বলা হয় যে, নদীতে জোয়ার এসেছে। এইভাবে যখন গরমের আধিক্য তীব্রতর হয় তখন বরফ গলার হারও তীব্রতর হয়। যার ফলে বরফ গলার পানির হার পর্যাপ্ত পরিমাণে বেড়ে গিয়ে পৃথিবীতে বর্ষা বা বন্যার সৃষ্টি করে।

আবার যখন পৃথিবীতে শীতকাল আসতে থাকে, ঠিক তখন হতেই পৃথিবীতে পুনরায় আবার বরফ পড়তে থাকে এবং বর্ষা ও বন্যার পানি কমতে থাকে। যাকে বলা হয় যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শুষ্ক হয়ে গেছে, তাই নদীর পানি উক্ত শুষ্ক বাতাসে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে তাই নদীর পানি শুকিয়ে যচ্ছে এবং উক্ত শুষ্ক বাতাসের জলীয় বাষ্প আসন্ন তীব্র শীতের সাথে একত্র হয়ে বরফে পরিণত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পতিত হচ্ছে। এবং পৃথিবীতে বরফের পাহাড় ও পর্বত সৃষ্টি করছে।

(জনকণ্ঠ ৩১-১২-১৯৯৯ ইং)

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই পৃথিবীতে বর্ষা ও বরফ সৃষ্টির পরিবেশ আসার আগমন উপলক্ষে একটি অবিকল হাদীস বলে গেছেন। এবং সে হাদীসের মধ্যে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীতে বর্ষা

ও বরফের পরিবেশ সৃষ্টি করার মূল কারণ হচ্ছে নরকের দুটি শ্বাস প্রশ্বাস। অর্থাৎ যখন জাহান্নাম মানুষের মতো গরম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন পৃথিবী সেই নরকের গরম নিঃশ্বাসের ধাক্কায় সূর্যের দিকে সামান্য হেলে যায়, যার ফলে তখন পৃথিবীর স্তর গরম হয়ে যায়, ফলে তখন পৃথিবীর বরফ গলতে শুরু করে এবং সেই বরফ গলা পানি হতেই পৃথিবীতে বর্ষা বা বন্যার পরিবেশ তৈরি হয়। আর যখন জাহান্নাম মানুষের মতো নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন, তখন পৃথিবী সেই নরকের নিঃশ্বাসের টানে সূর্য হতে সামান্য দূরে সরে আসে, যার ফলে তখন পৃথিবীর স্তর শীতল হয়ে যায়, ফলে তখন পৃথিবীতে বরফ পড়তে শুরু করে এবং সেই বরফ হতেই পৃথিবীতে বরফের পাহাড় ও পর্বতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেমন মহানবী (সা)-এর হাদীস–

حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلْمَةَ بْنَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِى الصَّيْفِ فَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ ـ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحُرِّ ـ صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ جِلْدِ اَوَّلُ صَفِّ كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ ـ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, জাহান্নাম তীব্র হতে তীব্রতরভাবে তার তাপমাত্রা অতিক্রম করার পর সে তার প্রতিপালকের নিকট বিনীতভাবে অভিযোগ করে বলে যে, হে প্রভু! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে, তখন মহান আল্লাহপাক তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাকে দুটি নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করে দেন। ইহাদের একটি হচ্ছে মানুষের মতো গরম নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য এবং অপরটি হচ্ছে মানুষের মতো নিঃশ্বাস গ্রহণ করার জন্য। এবং মহানবী (সা) বলেছেন যে, এ দুটি কারণেই তোমরা পৃথিবীতে তীব্রতর শীত ও গরম পেয়ে থাকো।

(সহীহ বুখারী হা/৩২৬০, ১ম খণ্ড-৪৬২ পৃষ্ঠা কিতাবু বাদ্‌য়িল খালক।)

৫৫. ভয়

(FEAR)

"ভয়" এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, "ভয়" হচ্ছে একটি বিশেষ শক্তি, এবং এই ভয়ের জন্য কোনো মানুষ বা প্রাণী যে আশংকা অনুভব করে তাকেই সাধারণত ভয় বলে।

আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন যে, যা কোনো মানুষ বা প্রাণীর আত্ম সম্মানের হানি অথবা প্রাণনাশের হুমকিস্বরূপ সেটিই ভয় নামে পরিচিত। অর্থাৎ যখন কোনো মানুষ মনে করে যে, আমি এই কাজ বা কথা বললে শরম পাব এবং এর জন্য আমি সমাজে কারও নিকট শরমে মুখ দেখাতে পারব না। অথবা আমি এই কথা বা কাজ করলে সমাজের মানুষ আমাকে মেরে ফেলবে, মূলতঃ সেই কথা বা কাজ করা হতে বিরত থাকাকেই ভয় বলে।

বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে কেউ এ কথাও বলেন যে, যখন কোনো মানুষ বা প্রাণী এমন এক গুরুতর অন্যায় কাজ করে ফেলে, যার জন্য তাকে অবশ্যই মেরে ফেলবে, তখন সে এর জন্য যে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকেই ভয় বলে।

বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেন যে, যখন কোনো মানুষ এমন এক নির্জন স্থানে অবস্থান বা চলাচল করছে, যেখানে দৈত্য-দানব, হিংস্র প্রাণী ও বিষাক্ত সাপের আক্রমণের আশংকা আছে, তখন সেখানে উক্ত মানুষের মনে প্রাণনাশের জন্য যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাই ভয় হিসেবে গণ্য।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, যখন কোনো মানুষের এক কঠিন অসুখ হয়, এবং এই অসুখের সংবাদ শুনামাত্র তার মনে যে হতাশার সৃষ্টি হয় তাকেও ভয় বলা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যার জন্য মানুষের বা কোনো প্রাণীর মনে তার প্রাণ নাশের আশংকা সৃষ্টি হয়, তার জন্য তারা যে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকেই ভয় বলে। অথবা যার দ্বারা কোনো মানুষ বা প্রাণী, তাদের নিজের অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার শংকা থাকে, তাকে নিয়ে নিজের অস্তি ত্ব ঠিক রাখার জন্য যে গবেষণা করা হয় তাকেই ভয় বলে।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, যা মানুষ বা প্রাণীর মনে প্রবেশ করে মনকে দুশ্চিন্তা ও অস্থির রাখে তাই হচ্ছে ভয়।

বিজ্ঞানীদের মধ্য হতে কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন যে, ভয় হচ্ছে- একটি শক্তি, যা-তার নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোনো প্রাণনাশের উপকরণের রূপধারণ করে, তার স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো প্রাণীকে ভয় দেখানোর জন্য যে হুমকী দেয়, তাই উক্ত প্রাণীর জন্য ভয়ের উপকরণ। এর দ্বারা সে দুইভাবে অবস্থানচ্যুত হয়। যেমন-১. দেহ ও আত্মাসহ এটা তার জন্য তেমন ক্ষতিকারক কিছু নয়। ২. দেহ নয় শুধু দেহ হতে তার আত্মা অবস্থানচ্যুত হয়, এটা তার জন্য ক্ষতিকারক, কারণ এতে আত্মা যদি উক্ত ভয়ের হুমকীর দ্বারা দেহ হতে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আর তার দেহে আত্মার আশ্রয় স্থলে উক্ত আত্মা ফিরে না আসে, তখন সে মৃত বলে ঘোষিত হয়। যাকে বর্তমান যুগের চিকিৎসকগণ "স্টোক" বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলে থাকে।

ভয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন যে, "ভয়" হচ্ছে একটি বিশেষ শক্তি এবং সেই শক্তি যখন কোনো প্রাণীর মনে প্রবেশ করে তার মনের মাঝে আতংকের সৃষ্টি করে তাই হচ্ছে সাধারণতঃ ভয়, এবং এই ভয়ের দ্বারা উক্ত প্রাণীর হৃদপিণ্ডের মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, ফলে স্পন্দনের বেগ বেড়ে যায়। অর্থাৎ-যার দ্বারা কোনো প্রাণীর হৃদযন্ত্রের গতিবেগ বেড়ে যায়, তাকেই ভয় বলে। যেমন লক্ষ্য করলে অবশ্যই দেখা যায় কোনো মানুষ যখন কোনো সাক্ষাৎকার সভায় কোনো কিছু বলার জন্য অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য উক্ত সাক্ষাৎকার সভার পাশে গিয়ে অবস্থান করতে থাকে, তখন তার মন ভয়ে আতংকগ্রস্ত থাকে, অতঃপর যখন সাক্ষাৎকার সভামঞ্চে তার নাম ঘোষণা করা হয়, তখনি দেখা গেছে যে, তার হৃদযন্ত্রে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে তার হৃদযন্ত্রে ধূক ধূক শব্দ করছে এবং তখন লক্ষ্য করলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, তার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বেড়ে গেছে, এবং তার এই হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার দেহের রক্তচাপও বেড়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, তার দেহের এই রক্তচাপ তার মস্তকে গিয়েও আক্রমণ করে, যদি এর দ্বারা মস্তিষ্কের চিকন সুতা ছিড়ে যায়, তাহলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটে অথবা মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ভয়ই

হচ্ছে প্রাণী দেহের হৃদযন্ত্রের সকল রোগের মূল মন্ত্র। অর্থাৎ ভয়ের দ্বারাই প্রাণী দেহের সকল রোগের সৃষ্টি হয়। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যতদূর সম্ভব ভয় হতে দূরে থাক। অর্থাৎ যখনি কোনো ভয়ের আবেগ মনের মাঝে উদয় হলে সাথে সাথে তাকে মন হত দূর করে দেয়া বা ধ্বংস করে দেয়া অথবা তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা অর্থাৎ উক্ত ভয় হিংস্র হলে, তাকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা, অথবা উক্ত ভয়কে ধ্বংস করার উপকরণের শিক্ষা হলো বেশি বেশি করে পড়াশুনা করা। অর্থাৎ পড়াশুনা করলেও মনের ভয়ভীতি দূর হয়, যেমন– পড়াশুনার দ্বারা জানা যায় কোনোটি ভয়ের বস্তু আর কোনোটি ভয়ের বস্তু নয়। অর্থাৎ কাকে কোনোভাবে ব্যবহার করলে প্রাণনাশের হুমকী হবে অথবা হুমকী হবে না, তার যাবতীয় খুঁটিনাটি জানা যায় পড়াশুনার দ্বারা।

আল্লাহ ভক্ত বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন কোনো মানুষ আল্লাহ পাককে স্মরণ করে তখন আল্লাহপাক তার মনের মাঝে অবস্থান করে, তখন তার মনে আল্লাহ পাকের অবস্থান দেখে মহাবিশ্বের কোনো ভয়ভীতিই তার মনে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। তাই তার মনে কোনো আতংকের সৃষ্টি হয় না। তাই তার জীবনের কোনো সময়ই হৃদযন্ত্রে কম্পনের সৃষ্টি হয় না যার ফলে তার কখনও রক্তচাপজনিত রোগ হয় না। অর্থাৎ রক্তচাপজনিত রোগ না হওয়া মানেই তার দেহে কোনো রোগের সৃষ্টি না হওয়া অর্থাৎ তার দেহ সুস্থ থাকা। অথবা যখন কোনো মানুষ আল্লাহপাককে স্মরণ করে, তখন তার সামনে হতে মহাবিশ্বের সকল ভয় দূরে সরে যায়, আর যখন কোনো মানুষ আল্লাহপাকের স্মরণ হতে দূরে সরে যায়, তখনি তাকে মহাবিশ্বের সকল ভয়ভীতির উপকরণ এসে তার মনের মাঝে আক্রমণ করে বসে। এবং তখনি তার দেহে ও মনে নানা দুঃশ্চিন্তা, অস্থিরতা, হতাশা ও ইত্যাদি দ্বারা নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

আল্লাহভক্ত বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, আল্লাহপাককে ভয় করার অর্থ হচ্ছে মহাবিশ্বের যাবতীয় কুকর্ম ও নানা অন্যায় অবিচার হতে নিজেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহপাকের হুকুমগুলি ঠিকমত পালন করা। তাই তারা বলেন যে, মহাবিশ্বে দু'টি ভয় বিদ্যমান।

১. আল্লাহপাককে ভয় করা, যা মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুকণাকে সুস্থ সবল ও উন্নতির দিকে ধাবিত করে।

২. আল্লাহপাককে ভয় না করে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা, যা বিশেষ করে মানুষকে আল্লাহপাকের স্মরণ হতে দূরে রেখে, নানা কুকর্ম করায়ে অন্যায় ও অবিচারের দিকে ধাবিত করে। এবং এর দ্বারা পরে অন্যের পক্ষ হতে তার প্রাণ নাশের হুমকি আসে, যার দ্বারা তার মনে নানা ভয়ভীতির উদয় হয়।

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বে পবিত্র কুরআন ও তাঁর হাদীসের আলোকে "ভয়"-এর যে সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করে গেছেন, তার সামান্য আলোচনা নিম্নে করা হলো : যেমন মহানবী (সা) বলেছেন।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ ـ

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন যে, "যেখানেই অবস্থান কর, সেখানেই আল্লাহপাককে ভয় কর"। (মুসনাদে বাযযার হা/৪০২২)

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাককে ভয় করে, সে মহাবিশ্বের যাবতীয় কুকর্ম হতে বিরত থাকে, তাই আল্লাহপাকের মহাশক্তি তার অন্তরে বিদ্যমান থাকে, এবং তখন সেই শক্তিকে ভয় করে মহাবিশ্বের যাবতীয় ভয় ভীতির উপকরণ এবং তার নিকট হতে দূরে থাকে।

অর্থাৎ তার অন্তরে মহাবিশ্বের ভয় ভীতির কোনো উপকরণই স্থান করতে পারে না। ফলে তার মন ও দেহ সর্বদিক হতে সুস্থ ও শান্তিতে থাকে। তাই মহানবী (সা) প্রত্যেক মানুষকে সর্বদাই আল্লাহপাককে ভয় করতে ও তার নাম মুখে উচ্চারণ করতে কড়া নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ـ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত যার মধ্যে বেশি আল্লাহর "ভয়" আছে। (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَاْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ ـ

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল মন্ত্রই হচ্ছে আল্লাহপাকের "ভয়"। (শায়বুল ঈমান হা/৭৩০)

অর্থাৎ যে অন্তরে আল্লাহপাকের ভয় আছে, সেই অন্তরেই আল্লাহপাকের যিকির বা স্মরণ আছে এবং যে অন্তর আল্লাহপাকের যিকিরে রত সে অন্তর

অবশ্যই সুখে শান্তিতে সুস্থ থাকবে। যেমন– মহানবী (সা) পবিত্র কুরআনের আলোকে বলেছেন :

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔

অর্থ : কেবল আল্লাহ তায়ালার স্মরণের মধ্যেই আত্মার প্রকৃত প্রশান্তি নিহিত। (সূরা রা'দ : আয়াত-২৮)

রাসূল (সা) বলেছেন

عَيْنَانُ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, সেই চোখকে জাহান্নামের অনল স্পর্শ করবে না, যার চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায়। (তিরমিযী হা/১৬৩৯)

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ۔

অর্থ : রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোনো কাজের দরুন অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বলেন, আল্লাহর ভয় এবং সচ্চরিত্র।
(তিরমিযী হা/২০০৪)

مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থ : যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে, আল্লাহপাক তাদেরকে সকল জটিলতা হতে মুক্তি লাভের উপায় বলে দেন এবং তাদের জন্য এমন পদ্ধতিতে জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দেন, যা তারা কল্পনাও করে না। (সূরা তালাক : আয়াত-২-৩)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۔

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহপাক ভয়কারীদেরকে ভালোবাসেন।
(সূরা তাওবা : আয়াত-৪)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ۔

অর্থ : তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা জেনে রাখ যে আল্লাহপাক ভয়কারীদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৪)

অর্থাৎ আল্লাহপাক ব্যতীত শক্তি, তার প্রভাব আসে শয়তানের পক্ষ হতে এবং সেই শক্তি মানুষের মনের মধ্যে আক্রমণ করে এবং মনের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করে নানা দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করে। তখন যদি কোনো মানুষ আল্লাহপাককে ভয় করে আল্লাহপাকের বেশি বেশি যিকির করে, তাহলে তখন তার মন হতে উক্ত দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। যেমন– মহানবী (সা) বলেছেন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে, অতঃপর যখন মানুষ আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আর যখন মানুষ আল্লাহর যিকির হতে গাফেল বা অমনোযোগী হয়, তখন শয়তান তাকে ভয় দেখিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়।।

(সহীহ বুখারী)

তাই মহানবী (সা) বলেছেন যে, দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে চাইলে সর্বদাই আল্লাহপাকের ভয়ে যিকিররত থাকতে হবে। যেমন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رُطَبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা জিহ্বাকে যেন সর্বক্ষণ আল্লাহপাকের যিকিরে সিক্ত রাখ। (তিরমিযি হা/৩৩৭৫)

যখন কোনো মানুষ অন্ধকার রাতে কোনো জনশূন্য এলাকায় বা জঙ্গলে অথবা নদীর পাড় দিয়ে চলতে থাকে, তখন তার মনে কাল্পনিকভাবে নানা ভয়ের উপকরণ সামনে এসে দৃম্যমান হয়ে যায়। তখন যদি সে ভয় না পেয়ে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে অথবা খুব জোরে চীৎকার করে আযান দেয়, তার সামনে ভয় জাতীয় কিছু দৃশ্যমান হবে না। কারণ এ দৃশ্যমান ভয়ের বস্তু হচ্ছে শয়তান। হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন, আযানের শব্দের সীমানার ভেতরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

আমাদের মাঝে যখন ঝড় আরম্ভ হয় অথবা ভূমিকম্পের ভয় ভীতি এসে উপস্থিত হয় ঠিক তখন শয়তান এসে সে ভয়ভীতিকে আরও পাকাপোক্ত করতে থাকে। তাই তখন মহানবী (সা) আল্লাহ তায়ালাকে বেশি স্মরণ

করতে এবং আযান দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস–

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعُ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِیْ كَمْ صَلّٰى.(متفق عليه)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, যখন নামাযের আযান হতে থাকে তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিঠ ফিরায়ে পালাতে থাকে, যাতে সে আযানের শব্দ শুনতে না পায়। আযান শেষ হয়ে গেলে সে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের ইকামত বা তাকবীর বলা আরম্ভ হয় তখন সে পিঠ ফিরায়ে পালাতে থাকে। এবং তাকবীর বলা শেষ হয়ে গেলে আবার সে ফিরে আসে এবং মানুষের (নামাযির) মনে খটকা লাগাতে থাকে। সে বলে অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর-যে সকল বিষয় তাঁর স্মরণে ছিল না। অবশেষে এমন হয় যে, মানুষ (নামাযী) বলতে পারে না সে কত রাকাত নামায পড়েছে। (বুখারী হা/৬০৮)

আল্লাহর ভয় মানুষকে সকল ভয় হতে মুক্তি দেয়। (ইবনে সিনা)

যখন কোনো মানুষ ভয় পায় তখন তার দেহ কম্পিত হয় এবং তার দেহের এই কম্পনের ফলে তার হার্ডের পার্লস বেড়ে যায়, রক্তচাপ বেড়ে যায়। ফলে এতে তখন তার দেহে অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করে এবং এ অবস্থা দীর্ঘদিন থাকলে রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা বেড়ে যায়। যার ফলে দেহে হৃদরোগ, রক্তচাপ জনিত রোগ, মস্তিষ্কে ব্যথাসহ নানা জটিল জটিল রোগ হতে থাকে। এছাড়াও মানব মনে ভয় দ্বারা দুঃশ্চিন্তা, হতাশা, মরণের চিন্তাসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় তাই বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা বলেছেন যে, আল্লাহর প্রতি মানুষের ভয়, মানুষকে যাবতীয়

ভয় হতে মুক্ত রাখে, এছাড়াও ফুযাইল ইবনে আয়ায (রা) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ তাকে ভয় করে।

ভয়ের মাত্রা বেড়ে গেলে মানুষ হঠাৎ হার্টে অথবা ব্রেইনে স্ট্রোক করে। তাই মহানবী মুহাম্মদ (সা) উপরোক্ত দুই মনীষীর পূর্বেই এই পৃথিবীর মানুষদেরকে বলে গেছেন যে, হে পৃথিবীর মানুষ! তোমরা আল্লাহ পাককে ছাড়া আর কাউকে কখনও ভয় করো না এবং আল্লাহ পাককে ভয় করলে পৃথিবীর যাবতীয় হৃদরোগ, রক্তচাপ জনিত রোগ, কোলেস্টরেল জাতীয় রোগ, হার্ডে অথবা ব্রেইনে স্ট্রোক জাতীয় রোগ, হতাশা, দুঃশ্চিন্তা, মরণের ভয় জাতীয় যাবতীয় রোগ তোমাকে আক্রমণ করতে ভয় করবে।

মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর দৃষ্টিতে মহা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। তা তিনি পবিত্র কুরআনের আলোকে বলেছেন, যেমন–

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ـ

অর্থ : এবং মহাবিশ্বের কোথাও এমন কোনো বস্তুকণা নেই, যা আল্লাহ পাকের গুণগানের তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠের ভাষা বুঝতে পার না। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৪)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ يَحْيَى الْبُكَاءُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللهَ ـ

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন যে, আমি ওমর বিন হুমী (রা) হতে শুনেছি যে, মহানবী (সা) বলেছেন, কোথাও এমন কোনো বস্তুকণা নেই যা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে না।

(তিরমীযি হা/৩৪২০, ২য় খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠা আবু ওয়াবুত তাফসীর)

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যাদের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে, ঠিক তাদের মধ্যেই ভয় ভীতির লক্ষ্যণও বিদ্যমান। যা মহানবী (সা) পবিত্র কুরআনের আলোকে বলেছেন, যেমন–

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

অর্থ : পাথরের মধ্যে এমনও পাথর আছে, যা আল্লাহ্ পাকের ভয়ে খসে পড়তে থাকে। (সূরা বাকারা : আয়াত-৭৪)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۔

অর্থ : যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য এজন্যই বর্ণনা করি যে, যাতে তারা গবেষণা করে। (সূরা হাশর : আয়াত-২১)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَالضِّحَاكُ قَالَا كُلُّ شَيْئٍ فِيْهِ الرُّوْحُ۔

অর্থ : হাছান ও যিহাক (রা) তারা উভয়ে হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।
(বিখ্যাত তাফসীর ইবনে কাছির ৩য় খণ্ড-৪২ পৃষ্ঠা সূরা বনী ইসরাঈল)

৫৬. মাটি

EARTH

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মাটির মধ্যে 'নিশাধর' নামে এক প্রকার পদার্থ আছে, যা আমাদের সকল প্রকার ক্ষতিকারক রোগ জীবাণুগুলো ধ্বংস করে। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রকার রোগ জীবাণু সৃষ্টিকারী ক্ষতিকারক বস্তু বা আবর্জনা মাটির নীচে পুঁতে ফেলার জন্য কড়া নির্দেশ দেন।

তার বাস্তব প্রমাণ এই যে, মাটির মধ্যে যে কোনো বস্তু পুঁতে ফেললে, মাটি তাকে ধ্বংস করে, তার দেহে মিশিয়ে ফেলে, যদি মাটির মধ্যে নিশাধর নামে এক প্রকার পদার্থ না থাকত তবে কোনো বস্তুই মাটিতে পুঁতে ফেললে মাটিতে মিশে যেত না তাই এ বিষয়েও মহানবী (সা) বিজ্ঞানী ছিলেন, তাই তিনি বর্তমান বিজ্ঞানীদের প্রায় দেরহাজার বৎসর পূর্বেই জানায়ে দিয়ে গেছেন এবং এছাড়াও মাটির নিশাধর পদার্থ সকল রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে একথাও মহানবী (সা) জানতেন তাই মহানবী মুহাম্মদ (সা)-ও উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই তার উম্মতকে নানা রোগ জীবাণু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাটি ব্যবহার প্রসংগে হাদীসে বলে গেছেন। যেমন–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কারো পবিত্র পাত্রে যখন কোনো কুকুর 'চাটে' তখন তোমরা অবশ্যই উক্ত পাত্র প্রথমে একবার 'মাটি' দ্বারা ধৌত করে পরপর সাতবার ভালো করে ধুয়ে ফেলবে। (সহীহ মুসিলম হা/৬৭৭)

অন্যত্র মহানবী (সা) বলেছেন, যেমন–

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ.

অর্থ : আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানায় যাবে, তখন সে যেন অবশ্যই তিনটি মাটির পাথর বা খণ্ড সাথে করে নিয়ে যায়।

(নাসায়ী হা/৪৪, ১৮ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত)

মহানবী (সা) আরও বলেছেন। যেমন–

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ. فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন মহানবী (সা)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি পায়খানায় আসতেন, তখন আমি তার কাছে একটি পানির বদনা অথবা একটি পানির ঘটি নিয়ে আসতাম। তারপর জরুরী কাজ শেষ হলে, উক্ত পানি খরচ করতেন। তারপর তাঁর (উক্ত বাম) হাত (পাক) মাটির মধ্যে ভালো করে ঘষতেন, অত:পর আমি তার জন্য পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। অত:পর তিনি অযূ করতেন।

(আবু দাউদ হা/৪৫, ১ম খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত)

সুতরাং মহানবী (সা)-এর উক্ত তিনটি হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাটির মধ্যে যে, রোগজীবাণুনাশক পদার্থ আছে, তা তিনি জানতেন। তাই তিনি তার উম্মতগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুরে চাটলে এবং তোমাদের মধ্য হতে কেউ পায়খানা করার পর পানি খরচ করার পর অবশ্যই তোমরা উক্ত পাত্র ও তোমাদের উক্ত পানি খরচকৃত হাত পবিত্র মাটি দ্বারা ঘষে পরিষ্কার করবে।

৫৭. মেসওয়াক

TOOTH BRUSH

দন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, খাদ্য গ্রহণের পর মুখ ও দাঁত ভালো করে পরিষ্কার না করলে দাঁতে লেগে থাকা খাদ্যকণা এবং মুখের ভেতরের বিভিন্ন জীবাণু মিলে দাঁতের গায়ে এক ধরনের আঠাল জীবাণুর প্রলেপ তৈরি করে। এই জীবাণু প্রলেপের মধ্যে এসিড প্রস্তুতকারী জীবাণু তাদের তৈরি এসিডের সাহায্যে দাঁতের ক্ষয় সাধন করে, যা দন্ত ক্ষয় নামে পরিচিত। জীবাণু প্রলেপ হতে নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ মাড়িতেও প্রদাহের সৃষ্টি করে। দাঁতের গায়ে লেগে থাকা এই জীবাণু প্রলেপ যদি নিয়মিত পরিষ্কার না করা হয়, তবে তা আস্তে আস্তে পাথরে পরিণত হয়ে যায়, যা সত্যিকারভাবে দাঁত ও মাড়ির জন্য খুবই ক্ষতিকর। এবং এ হতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, দিনে কমপক্ষে দুইবার 'মেসওয়াক' করা। অর্থাৎ সকালে ঘুম হতে উঠার পর এবং রাতে শোয়ার পূর্বে নিয়মিতভাবে 'মেসওয়াক' করা। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, বাম পাশের দাঁতে যখন মেসওয়াক করা হয়, তখন বুকের বাম পাশের ঝাঁকুনী হতে থাকে, যা হৃদযন্ত্রের জন্য খুব উপকারী। (ইত্তেফাক ২৯.৯.১৯৯৮ ইং)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত দন্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই নিয়মিত 'মেসওয়াক' করার জন্য তাঁর উম্মতকে কঠোর নির্দেশ দিয়ে হাদীসে বলে গেছেন। যেমন–

اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. (اَلنَّسَائِىُّ جِلْدِ اَوَّلِ كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে নিশ্চয় রাসূল (সা) বলেছেন, যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্ট না হত, তবে আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করার জন্য কড়া নির্দেশ দিতাম।

(নাসায়ী হা/৭, ১ম খণ্ড, কিতাবুত তাহারাত)

حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهُوَ اِبْنُ يُوْنُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ اِبْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْئٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ۔(اَلنَّسَائِيُّ جِلْدِ اَوَّلِ كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

অর্থ : ইবনে শুরাহ তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, তাঁর পিতা বলেন, আমি আয়েশা ছিদ্দিকা (রা)-কে একদা বললাম, যখন রাসূল (সা) বাড়িতে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন, উত্তরে আয়েশা (রা) বলেন, যে তিনি মেসওয়াক করতেন।

(নাসায়ী হা/৮, ১ম খণ্ড কিতাবুত তাহারাত)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ بِالسِّوَاكِ۔عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ۔

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, যদি ঈমানদার লোকদের ওপর কষ্ট না হত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দিতাম যে, তারা যেন মেসওয়াক করে দেরীতে এশার নামায আদায় করে। অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের ওযুর পূর্বে অবশ্যই মেসওয়াক করে। (আবু দাউদ হা/৪৬)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন যে, মেসওয়াক মুখের পবিত্রকারীর একটি বিশেষ কারণ। এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরও একটি বিশেষ কারণ।

(মুত্তাতরফ)

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى السِّوَاكِ لَبَاتَ مَعَ الرَّجُلِ فِىْ لِحَافَةٍ۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন যে, যদি মানুষ মেসওয়াকের গুরুত্ব জানতো তাহলে অবশ্যই মানুষ রাতে মেসওয়াক করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে।

(মুত্তাতরাফ)

এছাড়াও মেসওয়াক মহানবী (সা)-এর সুন্নতের মধ্যে অন্যতম একটি সুন্নাত। মেসওয়াকের ফযীলত বর্ণনাতীত। মেসওয়াক ব্যবহারে ৭০টি রোগ হতে মুক্তি পাওয়া যায়। যেমন–

১. মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে।

২. মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

৩. মুখের স্বাদ বৃদ্ধি পায়।

৪. পাকস্থলীর কঠিন রোগ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

সর্বোপরি দাঁত থাকে কান্তিমান। এখন দেখা যাক এ সম্পর্কে বিজ্ঞান কি বলে? অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের রিচার্স ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, পাকস্থলীর ৮০% রোগ দন্ত রোগের কারণেই হয়ে থাকে। আর এ রোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে মেসওয়াক। মেসওয়াক করার সময় মুখ এমনিভাবে হিল্লোলিত হয় যা দ্বারা যেকোন পড়াশোনার মধ্যে পাওয়া যায় অনাবিল প্রশান্তি। অতএব, মেসওয়াক করা আমাদের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন। (ইনকিলাব ২১.০৬.২০০৪ ইং)

মেসওয়াক

নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শসমূহের মধ্যে অন্যতম আদর্শ, আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে এটা আত্মিক ও শারীরিক উভয় দিকের উপকার সাধন করে। এ জন্য স্বয়ং মেসওয়াককে আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ইহাকে ইসলামী পবিত্রতার উপর চিন্তা-ভাবনার মাপকাঠিতে লক্ষ্য করলে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পন্থার চেয়েও উত্তম ও সমুজ্জ্বল হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবে।

একজন মুসলমান পাঞ্জেগানা নামাযে প্রতিদিন পনের বার মুখ পরিষ্কার করে। সুতরাং মুসলিম নামাযী ব্যক্তির মুখ সর্বদা পরিষ্কার থাকে। নামাযীকে নামাযের মধ্যে মহান স্রষ্টা ও মালিকের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করতে হয়। এ কারণে মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যকীয় কাজ। মুখ পরিষ্কার না থাকলে দুর্গন্ধ আসে। সঙ্গের নামাযীও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হতে পারেন। এছাড়াও ময়লা মুখ দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রশংসা কীর্তন ও ইবাদত করার দ্বারা মানুষের মন মস্তিষ্কের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং নামাযে খুশু খুজুও অর্জিত হয় না। যদি

মেসওয়াক ও পানি দ্বারা মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায় তাহলে মুখে এমন রশ্মি তৈরি হয় যার দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত ও প্রশংসা কীর্তনের মধ্যে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি হয়।

মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য মেসওয়াক করতে থাকায় দাঁত মজবুত ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। দাঁতের নানা রকমের রোগের আশংকা থাকে না। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। মানুষের আস্বাদন শক্তি বেড়ে যায়। তারা গলা ইত্যাদির রোগ বালাই হতে বেঁচে থাকে।

মেসওয়াক সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করা হলো। মহানবী (সা) মেসওয়াকের উপর বেশি বেশি গুরুত্ব দিয়ে, মিসওয়াক করার জন্য কড়া নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তিনি নিজেও বেশি বেশি মেসওয়াক করতেন এবং এর ওপর লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মেসওয়াকের মধ্যে ১৫টি সৌন্দর্য রয়েছে। যেমন :

১. মহান আল্লাহ খুশী হন
২. শয়তান অসন্তুষ্ট হয়
৩. মহানবী (সা)-এর অন্যতম সুন্নাত
৪. মুখকে পাক-ছাপ করে
৫. মেসওয়াককারীকে ফেরেশতারা ভালোবাসে
৬. প্রশান্তি ও স্বস্তি অর্জিত হয়
৭. ক্ষতিগ্রস্ত চোখের রোগ দূর হয়ে যায়
৮. কফ কেটে যায়
৯. পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়
১০. মুখ সুগন্ধিময় হয়ে যায়
১১. গরমের কষ্ট দূর হয়ে যায়
১২. দারিদ্র্য এবং সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়
১৩. দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়ে যায়।
১৪. মেসওয়াক করে যে নামায আদায় করা হয়, তার সাওয়াব ৬০ গুণেরও অধিক হয়।
১৫. মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়

আবু হুরায়রাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, মেসওয়াক করতে তোমরা কখনো অলসতা করো না, কেননা এটা মাড়ির দাঁতের ব্যথা দূর করে। এতে দাঁত উজ্জ্বল থাকে এবং এর ব্যবহারে স্মৃতিশক্তিও বেড়ে যায়।

মহানবী (সা) বলেছেন যে, জুমআর দিন মেসওয়াক করা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

রাসূল (সা) বলেছেন যে, নবীদের গুণাবলীর মধ্যে মেসওয়াক করা হলো একটি বিশেষ গুণ।

নবী করীম (সা) আরও বলেছেন যে, খানা খাবার পর মেসওয়াক করা দু'জন কম বয়সী গোলাম আযাদ করার চাইতে উত্তম।

রাসূল (সা) বলেছেন যে, মেসওয়াক করে নামায আদায় করা ঐ নামাযের চেয়ে সত্তর গুণ সওয়াব বেশি, যে নামাযের পূর্বে অজু করা হয়নি। নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আ) মেসওয়াকের গুরুত্ব ও ফযীলত এতোই বর্ণনা করেছেন যে, যেন ইহা আমার উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যাবে। মহানবী (সা) বলেছেন যে, তোমরা মেসওয়াক দ্বারা নিজেদের মুখ পাক ছাফ রাখ, কেননা এটি মুখের হক।

আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) দিন বা রাতে যখনই শোয়া হতে উঠতেন, তখন অজু করার পূর্বে অবশ্যই মেসওয়াক করতেন।

(সুনানে আবু দাউদ, যিনি রাত্রি জাগরণ করেন তার মেসওয়াককরণ অধ্যায় পৃষ্ঠা নং ৫৭)

যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) নিজ ঘর হতে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য বের হতেন না, যতক্ষণ না তিনি মেসওয়াক করতেন। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খ-২, পৃ. নং ২৬৬)

মেসওয়াক : নতুন চিকিৎসা এবং আধুনিক বিজ্ঞান মেসওয়াক ও জীবাণু

মেসওয়াক জীবাণু হত্যাকারী Anti Septic, এটা মুখ হতে দুর্গন্ধ দূর করে। এর ব্যবহারে মুখের ভেতরের জীবাণু মরে খতম হয়ে যায়। এভাবে মেসওয়াককারী ব্যক্তি মুখের যাবতীয় রোগ হতে রক্ষা পায়। নতুন গবেষণা অনুযায়ী কিছু এমন জীবাণুও হয় যা প্রচলিত ব্রাশ এবং পেস্ট দ্বারা দূর হয় না বরং সেগুলোকে শুধু মেসওয়াকই শেষ করতে পারে।

মেসওয়াক এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য

চিকিৎসা এবং মেডিক্যাল সাইন্স প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, মেসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য অটুট থাকে। মেসওয়াক করার দ্বারা মস্তিষ্ক সবল হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান থাকে। যদি মেসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার না করা হয় তাহলে দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। যার দ্বারা চোয়াল ও মাড়িতে পুঁজ সৃষ্টি হয়, বা মস্তিষ্কের রোগের কারণ হয় এবং এর দ্বারা হার্টের রোগও হয়ে থাকে।

মেসওয়াক এবং দাঁতের স্বাস্থ্য

মানুষ খাদ্য খায়, পানি পান করে এবং বহু রকমের খাদ্য খেয়ে থাকে। আর খানার ছোট কণা দাঁতের মাঝে জমতে থাকে, যা সাধারণভাবে শুধু কুলি করার দ্বারা বের হয় না। এর দ্বারা দাঁতের মধ্যে দুর্গন্ধ জমা হয়ে থাকে, যা বহু রোগের পথ তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে, এভাবে লোকের দাঁত ময়লাযুক্ত হলে খারাপ গন্ধ আসতে থাকে। নিকটে উপবেশনকারী ব্যক্তি খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। এর সঙ্গে সঙ্গে তার দাঁতের সাথে মাড়িও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মাড়িতে পুঁজ জমা হয়, যার দ্বারা অসহ্য রকমের ব্যথা শুরু হয়। এর প্রভাব শুধু দাঁতের উপরই পড়ে না বরং এই সমস্যা এবং পুঁজ আরও বড় হয়ে মাড়িও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সমস্যা আরও বড় হয়ে গলায়ও প্রভাব ফেলে থাকে। এর প্রভাবে গলা খারাপ হতে থাকে এবং সাথে সাথে সর্দি, কাশি, সর্দি-জ্বর ইত্যাদির প্রকোপ বেড়ে যায়। বুকের ছাতির উপর কফ তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায়। যার দ্বারা মস্তিষ্কও প্রভাবিত হয়। এর প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি কমজোর হয়ে যায়। যখন চোখ খারাপ হয়ে যায় তখন এই পুঁজ এবং সমস্যার কারণে কান ও পাকস্থলীও প্রভাবিত হয়। এমনকি এসব জীবাণু দেহের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ঐ দাঁতগুলো মেসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার না করাতে মানব জীবনকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়। জীবন তো স্বাস্থ্য ও সুস্থতার নাম। জীবনে যদি সুস্থতাই না থাকে তা হলে জিন্দেগীর মূল্য কোথায়? বৎস! মেসওয়াক ছাড়া উপায় নেই এবং মেসওয়াক ব্যতীত কখনোই পুঁজ, দূষণ ও কঠিন জীবাণু কখনো দূর হতে পারে না।

মেসওয়াক ও গলা

যে সব রোগীর গলা খারাপ হয়, তারা টনসিলের রোগী। এসব রোগী নিয়ম মাফিক মেসওয়াক ব্যবহার করলে সুস্থ হয়ে যায়, এরূপভাবে যদি কোনো রোগীর গলার নালী বড় হয়ে যায় তাহলে তিনি শাহতুত এর শরবত এবং নিয়মানুযায়ী মেসওয়াক করলে আরাম পেয়ে থাকেন।

মেসওয়াক ও মুখের ফোঁড়া

অনেক সময় মুখের মধ্যে গর্মি, দুর্গন্ধ এবং অদৃশ্য জীবাণুর কারণে ফোঁড়া হয়ে যায়। এসব ফোঁড়ার মধ্যে এমন কিছু ফোঁড়াও আছে যেগুলো বের হয়ে আসে আবার কখনো গোপন হয়ে থাকে। এটা খুবই কষ্ট ও ক্ষতিকর হয়। এ জীবাণুগুলো পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে, পুরো মুখকে নিজের আক্রান্ত স্থলে পরিণত করে। যার কারণে খাবার গ্রহণ করা মুশকিল ও অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং রোগী ক্ষুধার কারণে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যদি মুখে প্রতিদিন নিয়মিত তাজা মেসওয়াক করা হয়, এর লালা উত্তমরূপে মুখে মিলে যায় ফলে এ রোগ হয় না, আর যদি হয়ও তাহলে নিয়ম মাফিক মেসওয়াক করার দ্বারা রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

মেসওয়াক ও দৃষ্টিশক্তি

চোখের রোগ ও দৃষ্টির রোগের মধ্যে দাঁতের অপরিচ্ছন্নতা বড় ধরনের স্থান দখল করে আছে। দাঁতের ফাঁকে ঢুকে থাকা খাবারের কণার কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে চোখের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে এবং এভাবে এতে যদি দাঁতের দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহলে ব্যক্তি চোখের জ্যোতি হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। কম দৃষ্টি শক্তির রোগীদের অনেকে এমন রোগী হয়ে থাকে যার রোগ অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে দাঁতের ব্যাপারে তাদের গাফলতি সবচেয়ে বড় কারণ হয়।

মেসওয়াক ও কান

কিছু এমন রোগীও হয় যারা কানের প্রদাহ, পুঁজ এবং ব্যথায় কাতর হয়ে থাকে। মাসের পর মাস চিকিৎসা করালেও তাদের এ কষ্ট হতে মুক্তি মেলে না। যখন উত্তমরূপে এ সকল রোগীদের পরীক্ষা করা হয়, তাহলে জানা যায় যে, এদের মাড়িতে পুঁজ হয়ে গেছে এবং এর পুরা মুখ দুর্গন্ধে

ভরপুর। যখন মাড়ির চিকিৎসা করা হয় এবং নিয়মমত তাজা মেসওয়াক ব্যবহার করা হয় তখন কানও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়।

মেসওয়াক ও পাকস্থলী

বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা হতে একথা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রায় ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের সমস্যা সংশ্লিষ্ট রোগ। বিশেষতঃ বর্তমানে প্রতি তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন (তিনজনে একজন) পেটের রোগে আক্রান্ত।

মেসওয়াক না করার কারণে মুখে দুর্গন্ধ তৈরি হয়, যে কারণে মাড়িতে পুঁজ জমা হয় এবং কিছু অদৃশ্য জীবাণুও মুখে সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যখন খানা খাওয়া হয় তখন খাদ্যের সাথে মাড়ির পুঁজও পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। যার কারণে পাকস্থলী আক্রান্ত হয়ে যায়। মাড়ির পুঁজের কারণে ভক্ষিত অংশ ভারী ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যে কারণে পাকস্থলী ও জঠরের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা হতে পরিত্রাণ লাভ করা মুশকিল হয়ে যায়। যদি জঠর ও পাকস্থলীর রোগের চিকিৎসার পরে দাঁতের দিকে মনোযোগ দেয়া যায় অর্থাৎ নিয়মিত মেসওয়াক করা যায় তাহলে রোগের দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা হয়ে যায়।

মেসওয়াক এবং সার্বক্ষণিক কফ কাশি

সার্বক্ষণিক কফ কাশিতে ভোগে সে এমন এক রোগী যার কফ আটকে গেছে, যখন সে মেসওয়াক করে তখনই কফ ভেতর হতে বের হওয়া শুরু হয় এবং এ রোগীর মাথা হালকা হয়ে যায়। প্যাথলজিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণ হতে এ কথা প্রমাণিত যে, সার্বক্ষণিক সর্দির জন্য মেসওয়াক প্রতিষেধকের চেয়ে কম নয়। এমনকি মেসওয়াকের স্বতন্ত্র ও বিধিমত ব্যবহারে নাক ও গলা অপারেশন অনেক কমে যায়।

মেসওয়াক ও মুখের দুর্গন্ধ

এক লোকের মুখ হতে দুর্গন্ধ আসত। এ বেচারা বিভিন্ন প্রকারের ভালো ভালো টুথপেস্ট এবং মাজন ব্যবহার করেন। এছাড়াও অনেক ডাক্তারের কাছ হতে অনেক ওষুধও ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোনো উপকার হয়নি। কোনো একজন দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তিনি পিলুর ডালের মেসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনি নিয়মানুযায়ী মেসওয়াক ব্যবহার করতেন। পুরাতন লোম ফেলে প্রত্যহ নতুন মাথা দ্বারা মেসওয়াক করতে থাকেন, অল্প

সময়ের ব্যবধানে রাসূল (সা)-এর এই সুন্নাতের বরকতে আল্লাহ্ পাক তাকে সুস্থতা প্রদান করেন।

মেসওয়াক ও গুরু নানক

গুরু নানক-এর ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তিনি নিজ হাতে মেসওয়াক রেখে দিতেন। তিনি এর দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন এবং বলতেন ওহে এই লাকড়ী নাও, এটা সকল রোগ নিয়ে নিবে। বড়ই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কথা এই যে, যদি মেসওয়াক নিয়ে ব্যবহার করো, তাহলে রোগ যেতে থাকবে এবং যদি এ ব্যাপারে অলসতা কর তাহলে অসুস্থ হয়ে যাবে

মেসওয়াক এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকারের রোগ

এক লোকের গলা ও ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছিল এবং এর সাথে ঘাড় ফুলা ছিল। গলার আওয়াজও ছোট হয়ে আসছিল, মেধাশক্তিও কমতেছিল, এর সাথে মাথাও ঘুরছিল। এ ব্যক্তি মেধাবিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসা করাতে থাকেন। কিন্তু সবই ফলহীন প্রমাণিত হলো। কারো পরামর্শে তিনি নিয়মমাফিক মেসওয়াক করতে থাকলেন। এভাবে যে, মেসওয়াক দু টুকরা করে পানিতে সিদ্ধ করেন এবং এ পানি দ্বারা গড়গড়া করতেন। এছাড়াও যেখানে ফুলা ছিল সেখানে কিছু ওষুধের প্রলেপও দিয়েছেন। এ চিকিৎসা বড়ই উপকারী প্রমাণিত হয়। একে বিশ্লেষণ করা হলে জানা যায়, তার থাইরয়েড গ্লান্ড ইনফেক্টেড ছিল। যার প্রভাব সারা দেহের উপর পড়েছিল। এই মেসওয়াকের চিকিৎসা দ্বারা তার এ রোগ দূর হয়ে যায় এবং তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

মেসওয়াক ও হার্টের পুঁজযুক্ত ঝিল্লি

হাকীম "এস এম ইকবাল" আখবারে জাহান পত্রিকায় লিখেন : এক রোগীর হার্টের ঝিল্লিতে পুঁজ ছিল। সে চিকিৎসা করাচ্ছিল; কিন্তু কোনো উপকার হচ্ছিল না। সর্বশেষে হার্টের অপারেশন করে পুঁজ বের করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত পুঁজ আবার ভরে গেল। সকল দিক হতে হতাশ হয়ে ঐ রোগী আমার নিকট আসলো। আমি তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, তার মাড়ি খারাপ এবং তার মধ্যেও পুঁজ আছে এবং এই পুঁজ হার্টের ওপরও প্রভাব ফেলছে। এ পরীক্ষা ডাক্তারগণ গ্রহণ করে নিলেন।

হার্টের অপারেশনের পরিবর্তে এর দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা করা হলো এবং তাকে পিলুর মেসওয়াক করতে বলা হলো– যার দ্বারা আল্লাহ পাক তাকে আরোগ্য দান করেন।

টুথ ব্রাশ

পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা হতে একথা প্রমাণিত যে, যে টুথ ব্রাশ একবার ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে জীবাণুর স্তূপ জমা হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হওয়ার আশু আশংকা রয়েছে। পানি দ্বারা পরিষ্কার করার ফলে ঐ জীবাণু পরিষ্কার হয় না এবং তার বৃদ্ধি চলতে থাকে। এছাড়াও ব্রাশের ব্যবহারে দাঁতের ওপরের উজ্জ্বল্য এবং সাদা আবরণ উঠে যায়। এর কারণে দাঁতের মাঝের ফাঁকাও বেড়ে যায় এবং দাঁতের মাড়ির স্থান ছুটে যেতে থাকে। এ কারণে খাদ্যের যে অংশগুলো দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে তা দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয় এবং অবশেষে সারা দেহে রোগের কারণ হয়ে যায়। এ কারণে এসকল বিপদ হতে আত্মরক্ষার জন্য নবী মুস্তফা (সা)-এর সুন্নতের ওপর আমল করা দরকার। অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যা সর্বদা মেসওয়াক করলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে।

মেসওয়াকের প্রকারভেদ

মেসওয়াকের জন্য ঐ সকল গাছের ডাল উপযুক্ত যার আঁশ নরম হয়ে দাঁতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মাড়ির ক্ষতি না হয়। সর্বোত্তম এবং উন্নতমানের মেসওয়াক নিম্নলিখিত জাতের হয়ে থাকে।

১. পিলু ২. নিম ৩. বাবলা ৪. কানীর।

পিলু

পিলু মেসওয়াক উপহারের সমতুল্য, যা রাসূল (সা)-এর সুন্নাত। সাহাবী আবু খাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি ঐ দলের মধ্যে ছিলাম যারা রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাজির ছিল। রাসূল (সা) আমাদের পিলু গাছের লাকড়ির মেসওয়াক করার জন্য আমাদেরকে হুকুম দিলেন।

(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খ-২, পৃ. ২৬৬)

পিলুর মেসওয়াক নরম আঁশযুক্ত হয়, এর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। বেশির ভাগ অনুর্বর, উষর, বিরান ও জঙ্গলে এটি হয়ে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত বিশ্লেষণ হতে এ কথা প্রমাণিত যে. বিভিন্ন জিনিস যা

মস্তিস্কের খোরাক ও সহযোগী এবং এর মধ্যে একটা ফসফরাসও বটে। পিলুর মেসওয়াকে বিদ্যমান ফসফরাস লালা এবং লোমকূপের মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছায় যার দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয়।

নিম এবং বাবলা

নিম গাছের মেসওয়াকও অনেক উপকারী। এতে দাঁতের সামগ্রিক রোগসমূহের প্রতিরোধকারী চিকিৎসা রয়েছে। এ গাছ সাধারণভাবে পাঞ্জাবে পাওয়া যায়, এরপর হলো বাবলার মেসওয়াকের মর্যাদা। এর দ্বারা দাঁত অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে থাকে এবং এটা দাঁতকে দুর্গন্ধ এবং পুঁজ হতে রক্ষা করে।

মনে রাখতে হবে সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত মেসওয়াক তাজা হওয়া দরকার। যদি প্রথমে শক্ত জাতীয় মেসওয়াক ব্যবহার করতে হয় তা হলে কঠিন আঁশগুলো কেটে দিন এবং দাঁতের দ্বারা নতুন মাথা চিবিয়ে আঁশ বানিয়ে নিন।

কানীর

কানীর দুপ্রকারের হয়ে থাকে। সাদা ফুল বিশিষ্ট এবং লাল ফুলবিশিষ্ট। এ জাতের গাছ বেশির ভাগ পার্ক, উদ্যান ইত্যাদিতে হয়ে থাকে। এর মেসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা দাঁতের সব কষ্ট, পাইরিয়া ইত্যাদি শেষ হয়ে যায় এবং দুরারোগ্য রোগীও সুস্থ হয়ে যায়। এ মেসওয়াক ঝাঁঝালো হয়ে থাকে কিন্তু এর এই ঝাঁঝ দাঁতের জন্য সীমাহীন উপকারী। ডাক্তারগণ এর চাপের মধ্যে মওজুদ অণুগুলোকে দাঁতের ঔজ্জ্বল্য, মজবুতী এবং পাইরিয়ার মতো রোগের জন্য খুবই উপকারী হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে এর সাথে তার ব্যবহারের জন্য ঐ জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন যা এর (মানুষের) স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং তাঁর বিশেষ বান্দাগণ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়ে মানবজাতিকে এ সকল জিনিসের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। এ সকল জিনিসের মধ্যে মেসওয়াক এমন যা সকল নবীর সুন্নাত এবং অধিকাংশ রোগের নিরাময়।

ইঞ্জিনিয়ার নক্শবন্দী তাঁর ওয়াজে বলেছেন, 'আমেরিকার ওয়াশিংটনে একজন ডাক্তার আমাকে বলেছেন, রাতে ঘুমাবার সময় মেসওয়াক করে ঘুমাবেন। আমি জানতে চাইলাম কেন? ডাক্তার বললেন, আধুনিক

চিকিৎসায় বলা হয়েছে, মানুষ যা কিছু খায় সেসব মুখের ভেতর প্লাজমা হয়ে থাকে। সেই প্লাজমা শুধু কুলি করলে পরিষ্কার হয় না। সাধারণত রাতে ঘুমের মধ্যেই দাঁত খারাপের সকল অসুখ দেখা দেয়। কারণ মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন মুখ বন্ধ থাকে। মুখের নড়াচড়া বন্ধ থাকে। দিনের বেলায় মানুষ কথা বলে, খাবার খায়, পানীয় পান করে কিন্তু রাতে মুখ বন্ধ থাকে। এ কারণে এ সময় প্লাজমা মুখের ভেতর কাজ করার সুযোগ পায়। তাই দাঁতের অসুখ অধিকাংশই রাতে দেখা দেয়। সকালে দাঁত সাফ করতেও পারেন, নাও করতে পারেন, কিন্তু রাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় অবশ্যই মেসওয়াক করবেন।

ডাক্তারের কথা শুনে আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহর। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় মেসওয়াক করা আমাদের নবীর সুন্নাত। তিনি এশার নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করতেন, তারপর অজু করতেন, তারপর এশার নামায পড়তেন, তারপর বেশি কথা বলতেন না, তারপর ঘুমের জন্য বিছানায় চলে যেতেন।

মুখে স্বাদ এবং মেসওয়াক

এক লোক কিছু খেয়ে কোনো স্বাদ পেতো না। তার জিহ্বার স্বাদ অনুভব শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অনেক চিকিৎসা করেও কোনো ফল পায়নি। এক ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দেয়, জিহ্বায় জোঁক রাখুন, তাহলে স্বাদ ফিরে আসবে। তিনি এ ব্যবস্থাও নিলেন কিন্তুকোনো ফল হলো না। আমি তাকে একমাস যাবৎ পিলুর তাজা মেসওয়াক ব্যবহার করার পরামর্শ দিলাম। এক মাস পর তিনি সুস্থ হয়ে আমাকে জানালেন, এতো রকম ওষুধ ব্যবহারেও বিন্দুমাত্র উপকার পাইনি, অথচ এক টাকার পিলুর মেসওয়াকে এ রোগ হতে মুক্ত হয়েছি। আমার জিহ্বার স্বাদ ফিরে পেয়েছি।

এমন প্রত্যেক গাছের মেসওয়াক দাঁতের জন্যে উপযোগী, যে গাছের আঁশ নরম এবং দাঁতের মাঝের ফাঁক বাড়ায় না এবং মাড়ি জখম করে না। তবে এর মধ্যে পিলু, নিম অথবা বাবলা গাছ এবং কানির গাছের মেসওয়াক দাঁতের জন্য খুবই উপকারী।

৫৮. মেয়েদের মাসিক

MENSES OF GIRL'

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মেয়েদের মাসিক অবস্থায় যদি কোনো পুরুষ তার বৈধ স্ত্রীর নিকট গমন করে তবে উক্ত পুরুষের নিম্নলিখিত রোগগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন :

১. খুজলী-পাঁচড়া।

২. পুরুষত্বহীনতা।

৩. পেশাবে জ্বালা ও মূত্রনালী দিয়ে পুঁজ নির্গত হওয়া।

৪. মেহ।

৫. সন্তানের কুষ্ঠ রোগ হওয়া অথবা সন্তান জন্মগতভাবে কুষ্ঠ রোগী হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া।

৬. সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া।

মাসিক অবস্থায় সহবাস কৃত মেয়েদেরও নিম্নলিখিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন– স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন :

১. সর্বদাই মেয়েরা রক্ত প্রদর রোগে আক্রান্ত থাকে।

২. জরায়ু বের হয়ে ঝুলে পড়ে।

৩. কোনো কোনো মহিলার গর্ভের সন্তান অকালে ঝরে পড়ে যায়।

৪. এইড্স রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইত্যাদি।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই পবিত্র কুরআনের আলোকে বলে গেছেন যে, কোনো পুরুষ যেন মেয়েদের মাসিক অবস্থায় তার নিকট দৈহিক মিলনের জন্য গমন না করে। যেমন পবিত্র কুরআনের :

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

অর্থ : মাসিক অবস্থায় তোমরা মেয়েদের সাথে দৈহিক গমনে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পবিত্র না হয়। যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তাদের নিকট গমন কর। যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে। (সূরা বাকারা : আয়াত-২২২)

৫৯. ম্যালেরিয়া জীবাণু

MALARIA GERM

বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার রোনাল্ড রস ১৮৯৯ ইং সনে ম্যালেরিয়া জীবাণু বহনকারী স্ত্রী জাতীয় এনোফিলিস নামক মশার কামড়ে যে ম্যালেরিয়া জীবাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ইহা তিনি আবিষ্কার করেন এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন এবং এর উপর তিনি ১৯০২ ইং সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মহানবী মুহাম্মদ (সা)-ও আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে মাছির সুফল ও কুফল সম্পর্কে একটি হাদীস বলে গেছেন, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও চিকিৎসা বিজ্ঞানে খুব সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। যেমন–

حَدَّثَنَا بَشِرٌ يَعْنِىْ اِبْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَامْلِقُوْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاٰخِرِ شِفَاءً وَاِنَّهُ يَتَّقِىْ بِجَنَاحِهِ. اَلَّذِىْ فِيْهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ.

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো তরল খাদ্যের পাত্রে মাছি পতিত হয়, তখন উক্ত মাছিটি উক্ত তরল খাদ্যে ডুবায়ে দাও। কেননা মাছির দু'টি পাখার মধ্যে একটি পাখায় রোগ জীবাণু থাকে এবং অপর পাখায় উক্ত রোগ ধ্বংসকারী ঔষধ থাকে। তাই মাছি যখন কোনো তরল খাদ্যে পতিত হয়, তখন সে তার ঐ পাখা তরল খাদ্যে ডুবায়ে দেয়, যে পাখার মধ্যে রোগ জীবাণু আছে এবং তোমরা উক্ত মাছিটি তোমাদের তরল খাদ্যে ডুবায়ে দিলে, উক্ত শেফামূলক পাখার দ্বারা উক্ত বিষাক্ত রোগ জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। (আবু দাউদ হা/৩৮৪৬, ২য় খণ্ড ৫৩৭ পৃ. কিতাবুল আত্‌আমা)

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, মাছি একটি ক্ষুদ্র প্রাণী। এর দু'টি ক্ষুদ্র পাখার মধ্যে একটিতে টক্সিন নামে বিষাক্ত পদার্থ আছে এবং অপরটিতে এ্যান্টি টক্সিন নামে বিষাক্ত পদার্থ ধবংসকারী পদার্থ আছে তা বিশ্ববাসীকে দেখায়ে দেয়া মহানবী (সা)-এর কম অবদান নয়। তারপর আবার তিনি বলেছেন যে, মাছি তার ঐ পাখা তরল পদার্থে ডুবায়ে দেয় যে পাখায় টক্সিন নামে বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এটাও আমাদেরকে জানায়ে দেয়া তাঁর কম অবদান নয়।

৬০. মদ

WINE

যে সকল দ্রব্য নেশার সৃষ্টি করে তাদেরকে মাদকদ্রব্য বলা হয়। মাদকদ্রব্যের মধ্যে মদ, হেরোইন, প্যাথিডিন, ভাং, গাজা, চরস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সামান্য মদ পান করলে স্নায়ুকোষগুলো সাময়িকভাবে উত্তেজিত হয় ও শরীরকে সবল ও কর্মঠ করে তোলে। কিন্তু ক্রমাগত মদ পানের ফলে স্নায়ুকোষগুলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও দেহের তন্ত্রীগুলো কার্যনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেজন্য মদ্যপায়ী লোক দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং চলার সময় এদিকে ওদিকে ঢুলতে থাকে। সমাজে সে নানা প্রকার মন্দ কাজ করে। তাড়ি ও মদের মতো জিনিস বেশিমাত্রায় পান করলে মাদকতা জন্মে। এর ফলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। (দৈনিক ইনকিলাব ১০-৪-৯৯ ইং)

বৃটেনের বেলফাস্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেনিফার লিটল বেলফাস্টের এক বিশেষ সম্মেলনে বৃটিশ সাইকুলজিক্যাল সোসাইটিকে বলেন যে, 'মদ' নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে যে, কোনো মহিলা যদি তার গর্ভবতী কালীন সময়ে মদ পান করে তবে তার গর্ভের সন্তানের মস্তিষ্কের স্নায়ুর ক্ষতি সাধিত হয় এবং তার নিজেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এছাড়াও তিনি আরও বলেছেন যে, মদপান আপাততভাবে ধূমপানের চেয়ে 'ভ্রুণের' জন্য বেশি বিপদজ্জনক এবং গর্ভবতী অবস্থায় মদ পানকারী মহিলার সন্তান সারা জীবন স্নায়ুবিক রোগে ভোগে এবং এসব শিশুদের দৈহিক বৃত্তি কম হয়ে থাকে। (ইনকিলাব ১০-৪-৯৯ ইং)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই পবিত্র কুরআন ও তার হাদীসের আলোকে 'মদের' কুফলের বিভিন্ন গুণাগুণ বর্ণনা করে গেছেন। যেমন–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْـمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا۔

অর্থ : হে নবী! কতিপয় লোক আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আপনি বলুন, উভয়টিই হচ্ছে গুরুতর অপরাধ করার বস্তু। আর

মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে তবে এগুলোর পাপ বা অপরাধ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। অর্থাৎ মদের উপকারিতার চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। (সূরা বাকারা : আয়াত-২১৯)

মহানবী (সা)-এর হাদীস। যেমন–

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ الشَّعْبِيُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءَ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ۔

অর্থ : ওমর (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলেছেন, 'মদ' মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেককে ধ্বংস করে দেয়।

(আবু দাউদ হা/৩৬৭১, ২য় খণ্ড-১৬১ পৃষ্ঠা কিতাবুল আশরাবা।)

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔

অর্থ : ইবনে ওমর (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই হচ্ছে 'মদ' আর প্রত্যেক 'নেশা' জাতীয় দ্রব্যই হারাম বা কট্টরভাবে নিষিদ্ধ। (তিরমিযী হা/১৮৬১, ২য় খণ্ড ৮ম পৃষ্ঠা কিতাবুল আতাআমা)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُسْلِمَةِ الْقَعْنُبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ۔

অর্থ : আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা)-কে মদ বিক্রয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন মহানবী (সা) বলেন যে, প্রত্যেক নেশা জাতীয় পানীয় বিক্রয় করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

(আবু দাউদ হা/৩৬৮৪, ২য় খণ্ড ১৬২ পৃ. কিতাবুল আশরাবা। ও তিরমিযি হা/১৮৬৩, ২য় খণ্ড ৮ম পৃষ্ঠা কিতাবুল আত আমা।)

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, গর্ভবতী অবস্থায় মদ পানকারী মহিলার সন্তান সারা জীবন স্নায়ুবিক রোগে

ভোগে এবং মহানবী (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বলে গেছেন যে, 'মদ' মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়।

মদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা লানত করেছেন মদের ওপর, মদপানকারীর ওপর, যে ব্যক্তি মদ তৈরী করে তার ওপর, যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে তার ওপর, যে ব্যক্তি মদ পান করায় তার ওপর, যে ব্যক্তি মদ বহন করে তার ওপর, যার জন্যে মদ পরিবহন করা হয় তার ওপর।

[আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মেশকাত উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা)]

মদ মানবতার নিকৃষ্ট শত্রু

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেন, "তোমাকে তারা মদ এবং জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এ দু'টি জিনিসের মধ্যে জঘন্যতম অকল্যাণ রয়েছে, যদিও কিছু কল্যাণও রয়েছে, কিন্তু অকল্যাণের পরিমাণ কল্যাণের চেয়ে অধিক।"

অধ্যাপক হার্শ-এর লিখিত গ্রন্থের পর্যালোচনা

স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হার্শ এ বিষয়ের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার আমেরিকা মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে পরের বছরও তা বহাল রাখতে পারেনি। অথচ ইসলাম চৌদ্দ'শ বছর আগেই মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এ নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মানবতাকে অনেক ক্ষতি হতে রক্ষা করেছে।

কুরআনের তিনটি সূরায় মদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেটা পরে উল্লেখ করবো। দ্বিতীয়ত সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে মদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত বিধান দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত সূরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে এ সম্পর্কিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কয়েকজন মুফাস্সিরের মতে, মদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার আয়াত পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যান্য আলেমদের মতে, মদ সম্পর্কিত বিধানে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। একটি আদেশ অন্য আদেশের

পরিপূরক। আপাতদৃষ্টিতে বর্ণনায় পার্থক্য দেখা গেলেও মৌলিক বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

মদ পান করা কিংবা মজুদ রাখার অনুমতি উল্লিখিত তিনটি সূরার একটিতেও দেয়া হয়নি। তিনটি সূরার বর্ণনাতেই মদ হতে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ আলাদাভাবে বর্ণনা করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে মদের অপকারিতা বস্তুগত দৃষ্টিকোণ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে যেহেতু আমরা কুরআনের আয়াতকে বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করছি, কাজেই উপরোক্ত আয়াতও বিজ্ঞানের আলোকেই ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মদ মানুষের দেহে কি রকম বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে মদের রাসায়নিক অংশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে।

রসায়ন বিজ্ঞানের আলোকে আমরা একথা জানি, মদের মধ্যে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এ্যালকোহলসহ আরও বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। খাদ্য পানীয় হজম করার ক্ষেত্রে মদের কোনো ভূমিকা নেই; বরং হজমের ক্ষেত্রে ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টি করে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। এ কারণেই মানবদেহের জন্যে মদ একটি ক্ষতিকর কেমিক্যাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মদের বিষাক্ত উপাদান মানুষের হৃৎপিণ্ডে সরাসরি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খাদ্যদ্রব্য হিসেবে মদের কোনোই গুরুত্ব নেই। যারা মদ পান করে তারা যদিও এটাকে এক প্রকার খাদ্য হিসেবে দাবী করে। মদ পেটের ভেতর পৌছার পর অন্যান্য খাদ্যের বিপরীতে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অবস্থার সৃষ্টি করে।

হজম ব্যবস্থার ওপর মদের প্রভাব

মদের প্রভাব প্রথমে পড়ে মুখের ওপর। সাধারণত মুখের ভেতর বিশেষ রকমের ফ্লোরা থাকে। এটা এক ধরনের লালা। মদের ঝাঁঝের কারণে এ লালার শক্তি কমে যায়। ফলে দাঁতের মাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যারা নিয়মিত মদ পান করে তাদের দাঁত খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, কালচে রং ধারণ করে। মুখের পরে মদের প্রভাব পড়ে গলা এবং খাদ্যনালীর ওপর। এ দু'টি অঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত। এই খাদ্যনালী মানবদেহের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ সম্পন্ন করে। খাদ্যনালীতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি পর্দা রয়েছে। ইংরেজিতে একে বলা হয় মুকাস

মেমব্রেনস। এ স্পর্শকাতর পর্দার ওপর মদের প্রভাব পড়ে তীব্রভাবে। এতে ঐ পর্দায় এক প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হয়। ফলে ঐ খাদ্যনালীতে দুর্বলতা দেখা দেয়। গলা ও খাদ্য নালীতে ক্যান্সার মদের কারণেই হয়ে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠান ঘাতকব্যাধি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা ১৯৮০ সালের পর হতে মদের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী দৃঢ় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

একথা তো সবাই জানে, মদের কারণে পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক তৈরী হয়। গ্যাস্ট্রিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, পাকস্থলীতে লিপিড নামের একটি চর্বি রয়েছে যা মদের দ্বারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লিপিড পাকস্থলী রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। লিপিড থাকার কারণে পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। মদের কারণে গলায় এবং খাদ্যনালীতে ক্যান্সার হয় এটা নিশ্চিত প্রমাণিত, কিন্তু পাকস্থলীর ক্যান্সার মদের কারণে হয় কিনা এটা এখনো প্রমাণিত হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ইতোমধ্যে এ রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পাকস্থলীর ক্যান্সারও মদের কারণেই হয়ে থাকে।

মদপানের সবচেয়ে বেশি প্রভাব অত্যন্ত নাজুক ১২টি অন্ত্রের ওপর পড়ে। এটা হচ্ছে প্রচণ্ড রাসায়নিক প্রভাব। মদ সেখানে রাসায়নিক প্রভাব বিস্তার করে যেখানে হজমের জন্যে লালা বের হয়। যারা নিয়মিত মদপান করে তাদের অন্ত্র এবং পিত্তের ঝিল্লি সব সময় রোগাক্রান্ত থাকে। অথবা এদের কাজ স্বাভাবিক থাকে না। এ অবস্থা গ্যাস এবং বদহজমের মাধ্যমে মদপানকারীকে সমস্যায় ফেলে। পাকস্থলীর এ সমস্যা অন্ত্রের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হজমের কম্পিউটার সাদৃশ ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যায়। যদিও একজন সুস্থ সবল মানুষের যাবতীয় খাদ্যই হজম হয়ে যায়, কিন্তু এটা হজম ব্যবস্থাকে বিশেষ নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। মদ্যপায়ীদের এ ব্যবস্থার ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। হজম ব্যবস্থায় গোঁজামিল সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ মোটা হয়ে যায়। দেহকোষে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যায়। চর্বি অধিক পরিমাণে মায়োকর্যিক টিস্যুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পরিণামে গুরুতর হৃদরোগ সৃষ্টি হয়।

মদের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়ে লিভারের ওপর। মানুষের লিভার হচ্ছে একটি স্পর্শকাতর ল্যাবরেটরির মতো। এ লিভারে মদের প্রতি

ফোঁটা বিষের মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লিভারের ওপর মদের প্রভাব দু'ভাবে হয়ে থাকে।

প্রথমত, মদপান লিভারের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত করে। দ্বিতীয়ত, লিভারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মদের বাধাহীন প্রভাবে লিভারকে একই কাজ বার বার সম্পন্ন করতে হয়। পর্যায়ক্রমিক পরিশ্রমের কারণে লিভার দুর্বল হয়ে যায়, পরিণামে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এক পর্যায়ে লিভার অকেজো এবং নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত মদপানের কারণে একে একে লিভারের সকল কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে পড়ে। লিভার রক্ত তৈরীর কাজ করে, কিন্তু মদ্যপায়ীর লিভার পরিমিত রক্ত উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে না। এ কারণেই দেখা যায়, যারা নিয়মিত মদ পান করে তারা ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যায়। যদিও বাইরে হতে দেখলে তাদেরকে স্বাস্থ্যবান এবং সবল মনে হয়। কারণ তাদের শরীরের রক্ত তৈরীর কার্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। বিশেষত লিভারের যে শক্তির সাহায্যে দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা পায় এবং হিমোগ্লোবিন তৈরী হয়, সেটা মদ্যপায়ীদের বিশেষভাবে কমে যায়। এর ফলে তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে।

মদপানের ফলে লিভারের স্বাভাবিক তৎপরতা হঠাৎ করে কমে যাওয়ার কারণে বেহুশ হয়ে যায় এবং অজ্ঞান অবস্থায় তার মৃত্যুও হয়। একে বলা হয় লিভারের ব্যাংকরাপথেসি। মদপানে লিভারের ক্ষতি হয়নি এরকম একজন লোকও পাওয়া যাবে না। বিষয়টি এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রক্ত চলাচল ব্যবস্থার ওপর মদের প্রভাব

রক্ত চলাচল ব্যবস্থার ওপর মদের প্রভাব দু'ভাবে পড়ে। প্রথমত লিভারের সরাসরি প্রভাবে। দ্বিতীয়তঃ প্রভাব পড়ে মিকার্ডো টিস্যুর ওপর। এ প্রভাব পড়ার কারণে লিভার পরোক্ষভাবে রক্তের মধ্যে চর্বি জাতীয় খাদ্য মিশিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এর মধ্যে দুর্বলতা তৈরী হয়। পরিণামে প্রবাহিত রক্তে আর্টেরিওস ক্লোরোসিস ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন তৈরী হয়। অন্যদিকে মদের দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কারণে রক্ত প্রবাহের বিশেষ

পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে পরিণামে মানসিক ক্লান্তি সৃষ্টি হয়। উপরন্তু মদের কারণে হৃদপিণ্ডে চর্বির অংশ জমা হয়। ফলে দেহের অঙ্গসমূহে শিথিল ভাব তৈরি হয়। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মদ্যপায়ী লিভারের সমস্যায় আক্রান্ত হবার ফলে হয় তো হার্টফেল করে অথবা তার লিভার নষ্ট হয়ে যায়। যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয় তাদের জন্যে এক ফোঁটা মদও মারাত্মক ক্ষতি করে। এ রকম ব্যক্তি মদ স্পর্শ করলে বুঝতে হবে, সে জীবনের প্রতি কোনো ভালোবাসা রাখে না, অথবা নিজের দেহের কোনো অংশের ক্ষতির সে পরোয়া করে না।

এক শ্রেণীর রসবোধসম্পন্ন মানুষ মনে করে, সামান্য পরিমাণ মদ পান করা হলে মন প্রফুল্ল হয় এবং ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এ কারণে এটাকে মদপানের উপকারিতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবতা ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরকম চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মদের উপকারিতা সম্পর্কে এরকম কোনো কথা নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু লোক চিকিৎসাবিজ্ঞানের নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক তথ্য উপস্থাপন করে থাকে।

মদ কিডনির ওপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিডনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিডনি মানবদেহে চালুনির কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যে মদে এলকোহলের পরিমাণ কম থাকে সে মদও কিডনির জন্যে ক্ষতিকর। এ কারণেই দেখা যায়, যারা নিয়মিত বিয়ার পান করে তাদের অধিকাংশেরই কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর রহমত দিয়ে মানব জীবনকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করেছেন। যদি আমরা মহান আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান না করতাম তাহলে পান করার সাথে সাথেই বুঝতে পারতাম, মানবদেহের জন্যে মদ কতোটা ক্ষতিকর। কিছু লোক গালভরা দাবী করে, মদপানে তাদের নেশা হয় না, কিন্তু এ দাবী শিশুদের মতো অবুঝ লোকেরাই করতে পারে যা আত্মপ্রতারণার শামিল।

সামাজিক মনস্তত্ত্বের ওপর মদের প্রভাব

মদ কিভাবে সামাজিক সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত করে নীচে আমি সে সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করছি :

১. যারা মদ পান করে তাদের মন মেজাজ থাকে রুক্ষ ও উগ্র। তারা সমাজে নানারকম ঝগড়া কলহের কারণ ঘটায়।

২. স্ত্রী তালাকের ঘটনা মদপানের কারণেই অধিক ঘটে। এসব তালাকের ফলে গুরুতর সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। তালাকের পরিণামে সমাজে অপরাধপ্রবণ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমাজ জীবনে এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী।

৩. শ্রমিক এবং কারিগরদের মদের কারণে কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। তাদের দক্ষতা ও কর্ম নৈপুণ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। পরিণামে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. মদপানের কারণে সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা নষ্ট হয়। ফলে সামাজিক জীবনের ঐক্য শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যায়।

উপরোক্ত চারটি সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা করে চলেছেন। তারা নিজ নিজ সরকারকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যদি মদপানের প্রবণতা এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে জাতিগত প্রেরণা উদ্দীপনাসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কুরআনের মদ সংক্রান্ত বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর কোনো সমাজ সংস্কারক বা কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে মদপান সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। যদিও তারা জানেন, মদপান সমস্যার কারণে সমাজের ভিত্তিমূলে ঘুণপোকা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সে ঘুণ সমাজকে কুরে কুরে খেতে থাকে। আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশের কারণে মুসলিম সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী এ বিপদ হতে নিরাপদ রয়েছে। (ডাক্তার হালুক বাকীর গবেষণা)

নেশা, স্বাস্থ্য, ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, ইসলাম মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেছে। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয বিষয় বিবেচনা করে ইসলাম মানুষের ওপর বড় রকমের অনুগ্রহ করেছে।

মূসা (আ)-এর শরীয়তে কিছু জিনিস হালাল এবং কিছু জিনিস হারাম করা হয়েছিলো বটে, কিন্তু হালাল হারাম নির্ধারণের কোনো কারণ ব্যাখা করা হয়নি। নেশাজাত জিনিসের ব্যাপারে তাওরাতে কোনো নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয় নি; বরং মদের বিষয়ে প্রশংসা বাক্য লিখিত রয়েছে। হিন্দু ধর্মে আফিম, ভাং, চস ইত্যাদি নেশাজাত জিনিস ব্যবহার করা ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে সোমরস বা ভাং পানের উপকার বর্ণনা করার প্রশংসা করা হয়েছে।

খ্রিষ্টান অধ্যুষিত দেশসমূহের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মদের ব্যবহার এতো বেশি যে, মনে হয় সেসব অনুষ্ঠানে যেন মদের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। বড় দিন উপলক্ষে মদে ভেজানো রুটি তাদের ইবাদাতগোজার নারী পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ রুটি যীশুর গোশত এবং মদকে যীশুর রক্তের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।

বর্তমান যুগে উন্নত বা উন্নয়নশীল অমুসলিম দেশসমূহেও মদ এবং অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যকে জীবনের প্রয়োজনীয় অংশ মনে করা হয়। যুদ্ধের সময় কর্তৃপক্ষ সৈন্যদের পর্যাপ্ত পরিমাণে মদ সরবরাহ করে থাকে। এ কারণে যুদ্ধের সরঞ্জামের মধ্যে বিপুল পরিমাণ মদও পরিবহন করা হয়।

সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্য সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৭ তম রুকূ'তে বলা হয়েছে, লোকে যদি তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলো, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। তবে এতে মানুষের জন্যে উপকারও আছে, কিন্তু তার পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। (সূরা বাকারা) ইসলামে সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্য-আফিম, চরস, ভাং, মদ ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। পরিমাণ কম বেশি যা-ই হোক, সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

সূরা মায়েদার ১২তম রুকূ'তে বলা হয়েছে, হে মুমিনরা, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক সব ঘৃণ্য বস্তুই শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?

রাসূল (সা) বলেছেন, যে জিনিস বেশি নেশা সৃষ্টি করে তা স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করাও হারাম।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই ইসলামে হালাল হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। মদ এবং অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যাদির মন্দ প্রভাব মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর পড়ে। এ প্রভাব কিভাবে পড়ে সেটা বর্তমান যুগের ককটেল পার্টিতে গেলেই বুঝা যায়।

কেউ কেউ বর্তমানে মদের ব্যাপক প্রচলনের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করে থাকে। তারা বলে, শীতকালে শীত হতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সামান্য কিছু পরিমাণ মদ পান করা দূষণীয় নয়। অধিক মদ পান করা হলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, এ কারণে অধিক মদ পান নিষিদ্ধ, কিন্তু যারা এরকম যুক্তি দেখায় তারা বুঝতে পারে না যে, মদ হচ্ছে এক প্রকারের কাদা, যে কেউ যদি একবার এতে জড়িয়ে যায়, তবে সেই কাদা হতে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। কাদায় ক্রমেই নীচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকে। ক্ষতিকর কোনো জিনিসের অল্প পরিমাণ হতে যদি মানুষ বিরত না থাকে তবে অধিক ব্যবহারের ক্ষতি হতেও মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ছোট পাপ করার ফলে বড়পাপের সাহস মনে তৈরী হয়ে যায়।

মহানবী (সা) হারাম জিনিসকে সরকারি চারণভূমির সাথে তুলনা করেছেন। সরকারি চারণভূমির ধারে কাছেও পশু চারণ বিপজ্জনক। কাজেই সেই চারণভূমির ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না।

১৯৮৫ সালে বার্তা সংস্থা স্টার পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে. ইন্ডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার রোলোহারজার লিখেছেন. মদের প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের ওপর পড়ে। মদ পান করার সাথে সাথে তা রক্তের সাথে মিশে গিয়ে কয়েক সেকেন্ড মস্তিস্কে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সামান্য পরিমাণ মদও প্রতিক্রিয়াবিহীন থাকে না।

মদের মন্দ প্রভাবের কারণে মুসলমানরা মদকে উম্মুল খাবায়েছ, অর্থাৎ সকল দুষ্কর্মের উৎসমূল আখ্যায়িত করেছে। শুধু মদ নয়, সকল নেশাজাত দ্রব্যই দুষ্কর্মের মূল। কারণ প্রতিটি নেশাজাত জিনিসই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আফিম, ভাং, চরস ইত্যাদি নেশাজাত দ্রব্য মানুষের রক্তে

একপ্রকার জোশ সৃষ্টি করে। মদ পান করার পর সে ব্যক্তি হুশ জ্ঞান হারিয়ে কখনো গালাগাল করতে থাকে, কখনো নিজের জীবন বিসর্জন দিতে যায়, কখনো কাউকে প্রহার করতে যায়, কখনো কাঁদে, কখনো ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। নেশায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি এমন বিস্ময়কর আচরণ শুরু করে যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষ সে ব্যক্তিকে দেখাও পছন্দ করে না।

মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের এ হতে বিরত রাখার জন্যে জাপানী পুলিশ একবার একটি ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলো। নেশায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির কর্মতৎপরতা ভিডিও করে রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা এ ব্যবস্থা করেন। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে আসার পর তার নেশাগ্রস্ত অবস্থার কর্মতৎপরতা তাকে দেখানো হলে সে তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। মাথা নীচু করে থাকে।

বোম্বাইতে আমি নিজে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি। মিল কারখানার নারী এবং পুরুষ শ্রমিকরা বেতন পাওয়ার সাথে সাথে নিজের সন্তানসহ মদ-তাড়ির দোকানে চলে যায়। সেখানে নিজে মদ পান করে এবং ছোট শিশুদের মেরে মেরে মদ তাড়ি পান করায়। এ কারণেই ইসলাম মদপানের মজলিসের কাছে যেতেও নিষেধ করেছে।

ইউরোপ আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কার্যক্রম দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তারা কোকেন, ভাং, চরস, আফিম, ঘুমের ওষুধ বিভিন্ন দেশে আমদানী রফতানি সম্পর্কে কঠোর ভূমিকা পালন করে। মদের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনেও তারা পালন করে বিশেষ ভূমিকা। এসব অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অর্থ জরিমানাসহ নানারকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে, কিন্তু তাদের দেশে মদের ব্যাপক ব্যবহারের ভয়ানক ক্ষতি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নির্বিকার। তারা মনে করে মদ তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির অঙ্গ।

ফ্রান্সের হোটেলসমূহে খুব কম দামে মদ পাওয়া যায়। অথচ সাদা পানি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালের এক রিপোর্টে জানা যায়, মদপানের কারণে সৃষ্ট মারাত্মক রোগে প্রতিবছর ফ্রান্সে পনের হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে। এর কয়েকগুণ বেশি লোক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। প্রতি পঁয়ত্রিশ মিনিটে একজন লোক মদপানজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একবার সৌদি বাদশাহ্ শাহ্ সউদকে সৌদি আরবে মদ নিষিদ্ধ করায় প্রশংসা করে বলেন, আমেরিকায় প্রতিবছর ৬৮ হাজার মানুষ মদপানের কারণে মৃত্যুবরণ করে।

উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যান সামনে নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, সমগ্র বিশ্বে মদপানের কারণে প্রতিবছর কতো সংখ্যক মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাসূল (সা) মদ পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, মদ পান করবে না কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের উৎস। সাধারণত মদপানের কাজে ব্যবহার হয় এ রকম পাত্র ব্যবহার করতেও রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহারও মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে। এসব হচ্ছে সিগারেট, চা, আইসক্রিম এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য। উল্লিখিত পাঁচটি জিনিস ধূমপান, চা, আইসক্রিম, মদ এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্যকে অনেকেই নেশাজাত জিনিস মনে করে না। বিশেষত ধূমপান, চা, আইসক্রিম তো নেশাজাত জিনিস হিসেবে অনেকেই মানতে চায় না। এ কারণে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ নারী পুরুষ সবাই এসব জিনিসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এসব জিনিসকে মনে করা হয় জীবনের অংশ। কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে দাবী করা যায়, উল্লিখিত পাঁচটি জিনিসই স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর।

৬১. শুকর

SWINE

শূকর-মাংসের নিষিদ্ধতা

১. কুরআন মাজীদে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ

কুরআন মাজীদে কমপক্ষে চার জায়গায় শূকরের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো হলো : (২ : ১৭৩); (৫ : ৩); (৬ : ১৪৫); এবং (১৬ : ১১৫)
আরও বলা হয়েছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ .

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা পশু। (সূরা মায়েদা : আয়াদ-৩)

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটিই শূকরের মাংস নিষিদ্ধতার কারণ হিসেবে একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট।

২. বাইবেলেও শূকর এর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ রয়েছে

একজন খ্রিষ্টান এ ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে যথাসম্ভব ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারে। বাইবেলের লেভিটিকাস' গ্রন্থে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

And the swine, though he divide the hoof. and be cloven-footed, eat the cheweth not the cud, he is unclean to you.

অর্থ : আর শূকর যদিও তার খুর দু'খণ্ডের বিভক্ত এবং খুর বিশিষ্ট পায়ের অধিকারী এবং খাদ্য চিবিয়ে খায় জাবর কাটে না, তবুও ওটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র)।

of their flesh shall you not eat, and their carcass shall you not touch, they are unclean to you [leviticas 11 : 7-8]

অর্থ : এগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং এগুলোর মৃতদেহ তুমি কখনো স্পর্শ করবে না, এগুলো তোমার জন্য নোংরা অপবিত্র)। (লেভিটিকাস ১১ : ৭ : ৮) বাইবেলের 'ডিউটারনমী' গ্রন্থেও শূকরের মাংস খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

And the swine because it divide the hoof, yet cheweth not hte cud, it is unclean to you, you shall not eat of their flesh, not touch their deed carcass.

অর্থ : আর শূকর কেননা তার খুর দ্বিখণ্ডিত, যদি ও চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না, এটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র) এগুলোর মাংস তুমি খাবে না, আর না এগুলোর মৃতদেহ স্পর্শ করবে।' (ডিউটারনমি ১৪ : ৮)

বাইবেলের 'ইয়াইয়াহ্ গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায়ের ২ থেকে ৫ নং শ্লোকে এ একই নিষিদ্ধতা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

৩. শূকরের মাংস খাওয়া বেশ কিছু রোগের কারণ

যথার্থ কারণ যুক্তি প্রমাণ ও বিজ্ঞানের মন্তব্য উপস্থাপনের দ্বারা অমুসলিম ও নাস্তিকরা একমত হতে পারে এবং মেনে নিতে পারে যে, একজন ব্যক্তি শূকরের মাংস খাওয়া দ্বারা অন্ততপক্ষে ৭০টি বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সে বিভিন্ন রকম কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যেমন : গোলাকার কৃমি, সূঁচালো কৃমি, বক্র (ইত্যাদি)। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কৃমি হলো টায়েনিয়া সোলিয়াম (Taenia Solium) কৃমি, এটা পেটের ভেতরে অনেক লম্বা হয়ে যায়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে ঢুকে পড়ে এবং শরীরের প্রায় সব অংশেই ছড়িয়ে পড়ে। এটা যদি মস্তিষ্কে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তার স্মৃতিভ্রষ্টের কারণ ঘটে। যদি এটা হৃদযন্ত্রে ঢুকে, তাহলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তবে যদি এটা চোখে ঢুকে পড়তে পারে, তবে তা অন্ধত্বের কারণ হতে পারে । আর লিভার ঢুকে পড়লে লিভার পঁচে যেতে পারে। মোটকথা ফিতা কৃমির ডিম শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে পারে। এরপর আছে ভয়ঙ্কর ত্রিচুরা টিচুরাসীস' (Trichura tichurasis) শূকরের মাংস সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো– এটা যদি ভালো করে রান্না করা হয়, তাহলে এসব ওভা বা ডিম নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, ২৪ জন উল্লিখিত রোগীর মধ্যে ২২ জনই শূকরের মাংস ভালোভাবে রান্না করে খেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফিতা কৃমির এ ডিম বা 'ওভা' রান্নার সাধারণ তাপমাত্রায় বিনষ্ট হয় না।

৪. শূকর মাংসে চর্বি তৈরির প্রচুর উপাদান রয়েছে

শূকরের মাংসে মাংসপেসী তৈরির উপাদাপন অত্যন্ত কম, কিন্তু চর্বি তৈরির উপাদান অনেক বেশি। এ জাতীয় চর্বিই শিরা-উপশিরায় জমে উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণ ঘটায়। এটা আশ্চর্যের কিছুই না যে, শতকরা ৫০ ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশনে ভোগে।

৫. শূকর পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা প্রাণী

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা প্রাণী হলো শূকর। এ প্রাণীটি নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল ও অত্যন্তত নোংরা জায়গায় বাস করে। আমার জানামতে আল্লাহ তায়ালা এ প্রাণীটিকে উত্তম মেথর হিসেবে সৃষ্টির করেছেন। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক টয়লেট নেই এবং গ্রামীণ লোকেরা যেখানে খোলা আকাশের নিচে নিজেদের প্রয়োজন সারে, সেখানে শূকর-ই সেগুলো খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলে কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, উন্নত দেশগুলোতে আজকাল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় শূকর প্রতিপালন করা হয়। এসব স্বাস্থ্যসম্মত খামারগুলোতেও শূকরগুলোকে গাদাগাদি করেই রাখা হয়। আপনি তাদেরকে যত পরিচ্ছন্ন রাখতে চান না কেন, এ প্রাণী প্রকৃতিগতভাবেই নোংরা। এগুলো খুব আনন্দের সাথে নিজেদের ও সঙ্গীদের বিষ্ঠা ও মলমূত্র চোখ নাক দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেয়ে থাকে।

৬. শূকর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী

শূকর হলো এ পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য নির্লজ্জ প্রাণী। এটাই একমাত্র পশু যা তার স্ত্রী সাথে সংগম করার জন্য অন্য সঙ্গীদের ডেকে আনে। আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী শূকরের মাংস খেতে অভ্যস্ত। যার ফলে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে তারা অপরের সাথে স্ত্রী বদল করে নেয়। অর্থাৎ অনেকে বলে যে 'তুমি আমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাও আমি তোমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাই।

আপনি যদি শূকরের মাংস খেতে অভ্যস্ত হন, তাহলে আপনার আচরণও শূকরের মতো হবে। আমরা ভারতীয়রা উন্নত ও রুচিবান হওয়ার জন্য আমেরিকাকে অনুসরণ করি। তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমরা তা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকি। আয়ল্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মর্ম অনুসারে বোম্বের উঁচুস্তরের লোকদের মধ্যে স্ত্রী বদলের এ ব্যাপারটা নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬২. রোযা

FASTER

বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. ক্লাইভ মেকক বলেছেন, যতদিন প্রাণী দেহে বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকে, ততদিন প্রাণী দেহে বার্ধক্য আসতে পারে না এবং যখন প্রাণীদেহের দৈহিক বৃদ্ধি থেমে যায় তখন প্রাণী দেহে বার্ধক্য নেমে আসতে থাকে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, যখন প্রাণীদেহের বৃদ্ধি হতে থাকে তখন যদি এই দৈহিক বৃদ্ধিকে ধীরগতিতে চালানো যায় তাহলে প্রাণী দেহের দৈনিক বৃদ্ধিও ধীরগতিতে চলবে, ফলে প্রাণী দেহের বার্ধক্য দেরীতে আসবে এবং এতে প্রাণী দীর্ঘজীবী হবে। এবং প্রাণীদেহের দৈহিক বৃদ্ধির ধীরগতি করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য খাদ্য খাওয়া হতে বিরত থাকা অর্থাৎ কয়েকদিন খাদ্য খাওয়াতে প্রাণী দেহের যে দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে তা আবার দু'একদিন খাদ্য খাওয়া হতে বিরত থাকলে প্রাণী দেহের দৈহিক বৃদ্ধি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রাণী দেহের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বহু পূর্বেই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য খাদ্য খাওয়া হতে বিরত থাকার জন্য প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখার জন্য উম্মতগণকে হাদীসে বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَقَاتِلَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلْمَةَ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ قَالَ مَالِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ.

অর্থ : আমর ইবনুল আস (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখবে। (বুখারী ১ম খণ্ড ২৬৫ পৃ. কিতাবুস সাওম।)

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, যখন কোনো প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধির গতি শেষ হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে সুস্থ সবল রাখার জন্য বেশি করে

পুষ্টিকর খাদ্য খায়, তখন তার দেহে দৈহিক বৃদ্ধির ক্ষমতা না থাকাতে তখন তার দেহে উক্ত খাদ্যের উপকরণ দ্বারা কম্পনের সৃষ্টি হয়, যার ফলে তখন সে আরও মোটা হতে থাকে। এবং ধীরে ধীরে সে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে অক্ষম হয়ে যায়। তখন তার দেহে রক্তচাপ, অস্থিরতা ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে থাকে। তখন তার ঐসব রোগ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রত্যেক চান্দ্র মাসের আমাবশ্যা ও পূর্ণিমাসহ তিনটি করে রোযা রাখা। যা মহানবী (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বে বলে গেছেন।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও গবেষণা করে দেখেছেন যে, বৎসরে এক বার একটানা একমাস রোযা রাখা কেবল সে মানুষের আত্মারই উৎকর্ষ সাধন করে শুধু তাই নয় বরং ইহাতে মানব দেহের দৈহিক প্রচুর উপকারও সাধিত হয়। যেমন : একমাসের উপবাসে দেহের বিপুল পরিবর্তন হয়, তৎসঙ্গে সংযম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সহজ ব্যাপার নয়। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাসায়নিক উপাদান বায়ুপিত্ত কফ ও রক্তের চলাচল ঘন্টায় ঘন্টায় অজ্ঞাতে পরিবর্তন হতে থাকে। প্রতিনিয়ত রোযাদারের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, রক্ত চলাচল, মূত্রগ্রন্থি ও যকৃতের (লিভার) ক্রিয়া ও রক্তের নানাবিধ উপাদানের পরিবর্তন হয়ে থাকে। সারা বৎসর শরীরে যে জৈব বিষ (টক্সিন) জমা হয়, একমাসের একটানা রোযার উপবাসের আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে দেহের সম্পূর্ণ রক্ত বিষ মুক্ত হয়।

তাই মহানবী (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই কুরআনের আলোকে বলে গেছেন। যেমন–

اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ : রোযা তোমাদের জন্য কি কল্যাণ সাধন করে তা যদি তোমরা জানতে। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৪)

রোযা দ্বারা ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা হয়

এ সম্পর্কে বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. মো. হুসেন বলেছেন যে, ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ-এর প্রভাব বিস্তার করার বিরুদ্ধে রোযার উপবাস এক অমোঘ ঔষধ। এই রোগে টের পাওয়ার পর মাত্র কয়েক দিন রোযা রাখলে এবং রোযার সময় (রাত্রিতে) প্রচুর পানি পান করলে রক্তে ও

প্রস্রাবে চিনির ভাগ কমে আসে ও রক্তে ক্ষারের ভাগ বৃদ্ধি পায়। তিনি একথা দৈনিক পত্রিকাগুলোকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এছাড়াও তিনি আরও বলেছেন যে, সপ্তাহে একদিন রোযা রাখলে বহুমূত্র রোগীর জন্য খুব উপকারী এবং রোযার উপবাসে খাদ্যের সমতা রক্ষা হয় এবং পাকস্থলী কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লাভ করে। এতে যদি পাকস্থলীতে কোনো বিষাক্ত পদার্থ থাকে তাও এই রোযার উপবাসের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।

রোযা ও আধুনিক বিজ্ঞান

আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, রোযা রাখো তোমরা সুস্থ থাকবে। (তাবারানী)

ইসলাম রোযাকে মুমিনের জন্যে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম হওয়ার সাথে সাথে শেফা বা আরোগ্যের ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের অভিমত কী? সে বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো।

আমার এক বন্ধু বলেছেন, আমি ফ্রান্সে গিয়েছিলাম। তখন ছিলো রমযান মাস। আমাকে রোযা রাখতে হবে। তারাবীহ আদায় করতে হবে। আমার প্রফেসরকে আমি বললাম আমাকে এক মাসের ছুটি দিন। তিনি বললেন কোনো ছুটি নাই। আমি বললাম, আমাকে রোযা রাখতে হবে, তারাবীহ আদায় করতে হবে। তিনি বললেন ঠিক আছে, কিন্তু এ জন্যে ছুটি নিতে হবে কেন? আমি বললাম, আমাকে প্রতিদিন অমুক জায়গায় অনেক দূরে যেতে হবে, সেখানে হতে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করা সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, এখানে কাছাকাছি একটা জায়গার কথা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। তারপর তিনি আমাকে একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম যাদের কাছে আমাকে নেয়া হয়েছে তাদের প্রায় সকলেরই মুখে দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ী, পরিধানে জোব্বা। কেউ মেসওয়াক করছে, কেউ অজু করছে, কেউ আযান দিচ্ছে, কেউ নামায আদায় করছে।

একজন কুরআন পাঠ করছে অন্য কয়েকজন মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তারা সবাই রমযান মাসে রোযাও পালন করছে। রমযানের শেষ দিকে এতেকাফ করছে। তারা শেষরাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মমতো সেহরী ও ইফতার করে। আমি তাদের সাথে সেখানে রমযানের সকল ইবাদত

বন্দেগী পালন করলাম। আমি আমার প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে নিয়ে গেছেন যাদের সংস্পর্শে হতে আমার রমযান মাস ভালোই কেটেছে। প্রফেসর আমার কথা শুনে হাসলেন। আমি তার হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, তুমি কি জানো ওরা সবাই ইহুদী? আমি বললাম সেটা কি করে জানবো? প্রফেসর বললেন, তারা একটি প্রকল্পের অধীনে কাজ করছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুসলমানরা একমাস রোযা পালন করে। আমরাও একমাস পালন করে দেখি ইসলামের বিধান অনুসরণে কী কী উপকারিতা রয়েছে? যদি কল্যাণকর কিছু পাওয়া যায় আমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবো।

আমেরিকান এক অমুসলিমের ঘটনা

আমেরিকান এক ব্যক্তি আমাকে একদিন জানালেন তিনি রোযা পালন করছেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মুসলমান নন, আপনি কেন রোযা রাখছেন? তিনি বললেন, বছরে কিছু সময় মানুষের এরকম অতিবাহিত করা উচিত যে সময়ে তারা ডায়েট কন্ট্রোল করে নিজেদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে কিছুটা বিরতি দিবে। এর ফলে মানবদেহে তৈরি হওয়া বিষ নিঃশেষ হয়ে যাবে। লালার মতো সে বিষ নিঃশেষ হলে অনেক মারাত্মক রোগ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। হজম শক্তি বা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আগের চেয়ে শক্তিশালী এবং মজবুত হয়ে ওঠে এ কারণে আমি এবং আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা প্রতি মাসে অন্তত কয়েকদিন রোযা রেখে ডায়েটিং করবো। একথা শুনে আমি তাকে বললাম, আপনি এটা করছেন ডায়েট কন্ট্রোলের জন্যে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা আমাদের অনেক আগেই এ শিক্ষা দিয়েছে। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে। প্রতি চন্দ্রমাসের মাঝামাঝি সময়ে এ রোযা পালন করা হলে অবিবাহিত লোকদের মধ্যে শৃংখলা ফিরে আসে। তারা ধৈর্যশীল এবং আত্মসংযমী হয়ে উঠতে পারে।

চন্দ্রগুপ্তের উজির চানক্যের বক্তব্য

রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উজির চানক্য অর্থশাস্ত্র নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, আমি উপোস হতে বাঁচতে শিখেছি এবং উপোস

হতে উড়তে শিখেছি। আমি ক্ষুধার্ত পেটে শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছি। (আলোকজান্ডার দ্যা গ্রেট)

মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা

মহাত্মা গান্ধীর উপোস থাকার ঘটনা সর্বজন বিদিত। ফিরোজ রাজ লিখিত গান্ধী জীবনে একথা লেখা রয়েছে যে, তিনি রোযা রাখা পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, মানুষ খাবার খেয়ে নিজের দেহ ভারী করে ফেলে। এ রকম ভারি অলস দেহ দুনিয়ার কোনো কাজে লাগে না। যদি তোমরা তোমাদের দেহ সবল এবং কর্মক্ষম রাখতে চাও তবে দেহকে কম খাবার দাও। তোমরা উপোস থাকো। সারাদিন জপতপ করো আর সন্ধ্যায় বকরির দুধ দিয়ে উপবাস ভঙ্গ কর। (দাস্তানে গান্ধী)

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র প্রফেসর মোরপান্ড বলেছেন, আমি ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি লেখাপড়া করার চেষ্টা করেছি। রোযা অধ্যায়ে লেখাপড়া করার সময়ে আমি খুবই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। চিন্তা করেছি, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্যে এক মহান ফর্মুলা দিয়েছে। ইসলাম যদি তার অনুসারীদের জন্য কোনো বিধান না দিয়ে শুধু এ রোযাই দিতো, তবু এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কিছু হতে পারতো না।

বিষয়টি নিয়ে আমি একটু গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য চিন্তা করলাম। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্যে আমি মুসলমানদের নিয়মে রোযা পালন করতে শুরু করি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি পাকস্থলীর গোলমালে ভুগছিলাম। রোযা রাখার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বেশ সুস্থবোধ করতে শুরু করলাম। দেখলাম, রোগ অনেকটাই কমে গেছে। আমি রোযা চালিয়ে যেতে লাগলাম। এতে দেহে আরও কিছু পরিবর্তন অনুভব করলাম। কিছুদিন পর লক্ষ্য করলাম আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি।

পোপ ঈলপ গল-এর অভিজ্ঞতা

পোপ ঈলপ গল ছিলেন পোল্যান্ডের বিশিষ্ট পাদ্রী। রোযা সম্পর্কে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলেন, যারা আমার আধ্যাত্মিক অনুসারী তাদের আমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার আদেশ দিচ্ছি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে আমি যে শারীরিক সুস্থতা অনুভব করেছি তা ভাষায়

অবর্ণনীয়। আমার দেহ অভাবনীয়ভাবে সতেজ হয়ে উঠেছে। আমার অনুসারীরা আরও কিছু দিক নির্দেশনার জন্যে আমায় পীড়াপীড়ি করে। যেসব রোগের কোনো ওষুধ নেই সেসব হতে আরোগ্য লাভের জন্যে আমি তাদের তিন দিন নয়, বরং একমাস রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছি।

যেসব রোগীর ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং পাকস্থলীর অসুখ রয়েছে, তাদের জন্যে আমি একমাস রোযা পালনের ব্যবস্থা দিয়েছি। এক মাস রোযা রাখার ফলে অনেকের বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ নিরাময় হয়েছে। হৃদরোগীদের অস্থিরতা এবং নিঃশ্বাস ফুলে যাওয়া কমে গেছে। পাকস্থলীর রোগীদের উপকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি ।

ক্যামব্রিজের ডাক্তার লোথার জিম-এর মন্তব্য

এ ডাক্তার ছিলেন ফার্মাকোলজি বিশেষজ্ঞ। সবকিছু গভীরভাবে দেখা এবং পর্যালোচানা করা ছিলো তার স্বভাব। তিনি রোযাদার ব্যক্তির খালিপেটের খাদ্যনালীর লালা (স্টোমাক সিক্রেশন) সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেন। এতে তিনি বুঝতে পারেন, রোযার মাধ্যমে ফুড পার্টিকেলস সেপটিক সর্ম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যায়। পরীক্ষার পর ডাক্তার লোথার মন্তব্য করেছেন, রোযা হচ্ছে দেহের অসুস্থতায় বিশেষত পাকস্থলীর রোগে স্বাস্থ্যের গ্যারান্টি।

সিগমন্ড নারায়েড

সিগমন্ড নারায়েড ছিলেন বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিশারদ। তাঁর আবিস্কৃত থিওরী মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। তিনিও রোযা এবং উপবাসের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেন, রোযার মাধ্যমে মস্তিষ্কের এবং মনের যাবতীয় রোগ ভালো হয়। মানুষ শরীরিকভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় কিন্তু রোযাদার ব্যক্তির দেহ ক্রমাগত বাইরের চাপ সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করে। সে খিঁচুনি রোগ এবং মানসিক অবসাদ হতে মুক্তি লাভ করে। এমনকি সে এ দু'টি রোগের সম্মুখীন আর কখনো হয়নি।

প্যারাসাইক্রোজি গবেষণা

বস্তুবাদী জীবন এবং বস্তুবাদী সম্পর্কের কারণে মানসিক শান্তি হতে বঞ্চিত হয়ে বতমান যুগের মানুষ শান্তির সন্ধানে ছুটছে আর ছুটছে। এ শান্তি

অন্বেষার অন্য নাম হচ্ছে প্যারাসাইক্রোজি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদরা ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। কারণ পাশ্চাত্যের মানুষেরা বর্তমানে বস্তুবাদী জীবনযাপনে ত্যক্ত বিরক্ত। এ বস্তুবাদী সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে আত্মহত্যা, হত্যা প্রচেষ্টা, দুর্ঘটনা, সতীত্বহরণ, সমকামিতা, অপহরণ, হত্যা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, বোমা সন্ত্রাস, সম্মিলিত হত্যাকাণ্ড, জারজ সন্তান, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি। এরকমের ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলি গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের অতলে তলিয়ে দিচ্ছে। গোটা ইউরোপ এবং পাশ্চাত্য সমাজ এ সকল ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় নিয়োজিত।

পাশ্চাত্যের গবেষকরা বর্তমানে প্রাচ্যের ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে গবেষণা করছেন এবং নিজেদের জীবনযাত্রার সংস্কার উন্নতির উপায় অনুসন্ধান করছেন। রোযা সম্পর্কে ইউরোপীয় গবেষকরা নিয়মিত গবেষণা করেছেন। তারা স্বীকার করেছেন, রোযা একদিকে শারীরিক জীবনকে যেমন নতুন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করে, তেমনি এর মাধ্যমে নানারকম অর্থনৈতিক সমস্যাও কমে যাবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে ইউরোপের লোকেরা আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে ফিরে আসছে আর আমরা ইউরোপীয়দের আচার-আচরণ অনুকরণ করে চলছি।

হজম শক্তির উপর রোযার প্রভাব

আমরা জানি, হজম ব্যবস্থা দেহের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর প্রতিটি অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– মুখ, জিহ্বা, মাঢ়ি, মুখের লালা, গলা এলিমেন্টারি ক্যানেল (গলা হতে পাকস্থলী পর্যন্ত খাদ্যবাহী নালী ইত্যাদি)। এ ছাড়া রয়েছে খাদ্য গ্রহণকারী অন্ত্র, লিভার, অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর একটি চালু হলে অন্যগুলো আপনা আপনি কম্পিউটারী ব্যবস্থার মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। যখন আমরা খেতে শুরু করি বা খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি, তখনই এ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিটি অঙ্গ তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে থাকে। সমগ্র ব্যবস্থা চব্বিশ ঘণ্টা কর্মরত হতে দায়িত্ব পালন করে।

রোযা এক মাসের জন্যে হজম প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহের আরামের ব্যবস্থা করে। তবে হজমের ক্ষেত্রে লিভারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রোযায় লিভারের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে। কারণ লিভার খাদ্য হজম করা ছাড়াও আরও পনেরটি অতিরিক্ত কাজ সম্পন্ন করে। ফলে লিভার ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। রোযার মাধ্যমে এ হজম ব্যবস্থা চার হতে ছয় ঘন্টা বিশ্রাম লাভ করে। এ বিশ্রাম রোযা ব্যতীত সম্পূর্ণ অসম্ভব। খুব সামান্য পরিমাণ খাদ্য এমনকি এক গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ খাদ্যও যদি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, এতেই সমগ্র হজম ব্যবস্থা নিজের কাজ শুরু করে দেয়। লিভার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে দাবী করা যায়, এ বিরতির মেয়াদ বছরে এক মাস হওয়া আবশ্যক।

বর্তমান যুগের মানুষ জীবনের অসাধারণ মূল্য নির্ধারণ করেছে। তারা চিকিৎসার নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের নিরাপদ ভাবতে শুরু করে, কিন্তু লিভার যদি কথা বলতে সক্ষম হতো তবে সে মানুষকে বলতো, তোমরা একমাত্র রোযার মাধ্যমে আমার ওপর বড়ো রকমের দয়া করতে পারো।

লিভারের ওপর রোযার বরকতসমূহের মধ্যে একটি রক্তের রাসায়নিক কার্যক্রমের প্রভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। লিভারের জটিল ও কঠিন কাজসমূহের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে হজম করা এবং হজম না হওয়া খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। লিভারকে হয়তো প্রতিটি লোকমা পাকস্থলীর স্টোরে পৌঁছে দিতে হয় অথবা খাদ্য হজম হয়ে রক্তের সাথে মিশে যাওয়ার কার্যক্রম তদারক করতে হয়। রোযা রাখার সময়ে লিভার শক্তি সঞ্চারক খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌঁছে দেয়ার কাজ হতে বিরত থাকতে পারে। এ সময়ে লিভার রক্তে গ্লোবুলিন সৃষ্টির কাজে মনোযোগী হতে পারে। রোযার মাধ্যমে গলা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর খাদ্যনালী বিশ্রাম পায়। আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাকে দেয়া এ তোহফার কোনো মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

রোযার মাধ্যমে মানুষের পাকস্থলী অত্যন্ত কল্যাণকর প্রভাব অর্জন করে। এ সময়ে পাকস্থলী হতে বের হওয়া লালা চমৎকারভাবে ভারসাম্য খুঁজে পায়। এ কারণে রোযার সময়ে এসিডিটি সঞ্চিত হয় না। অথচ রোযার

সময় ব্যতীত অন্য সময়ের ক্ষুধায় এসিডিটি বেড়ে যায়। কিন্তু রোযার নিয়ত করার পর এসিডিটি তৈরি হওয়া বন্ধ থাকে। এ নিয়মে খাদ্যনালীতে লালা সৃষ্টিকারী কোষ রমযান মাসে বিশ্রামে চলে যায়। যারা সারাজীবনে কখনো রোযা রাখে না তাদের দাবীর বিপরীতে এটা প্রমাণিত হয়েছে, একটি স্বাস্থ্যবান পাকস্থলী সন্ধ্যায় ইফতার করার পর সফলতার সাথে হজমের কাজ সম্পন্ন করে।

রোযা পাকস্থলীর অন্ত্রসমূহকেও বিশ্রাম দেয় এবং এতে সেগুলো সজীবতা লাভ করে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর লালা এবং পাকস্থলীর কার্যক্রম জোরদার হয়। রোযার মাধ্যমে অন্ত্রের জাল যেমন নতুন সজীবতা লাভ করে, ঠিক তেমনি হজম নালীর ওপর হওয়া সকল রোগের আক্রমণ হতেও নিরাপদ থাকে।

রোযার মাধ্যমে রক্তের ওপর কল্যাণকর প্রভাব

দিনের বেলায় রোযা রাখার কারণে রক্তের পরিমাণ কমে যায়। এ রক্ত স্বল্পতা হৃৎপিণ্ডকে খুবই কল্যাণকর বিশ্রাম দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ইন্টারসেলুলার বা কোষের আন্তঃসংযোগ কমে যাওয়ার কারণে টিস্যুর ওপর চাপ কমে যায়। টিস্যুর ওপর চাপ অথবা ডায়াসটোলিকের চাপ হৃৎপিণ্ডের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোযার মাধ্যমে ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার সব সময়েই কম থাকে। সে সময় হৃৎপিণ্ড থাকে বিশ্রামে। বর্তমানে বস্তুবাদী আদর্শে জীবনযাপনের কারণে মানুষ হাইপার টেনশনে ভুগতে থাকে। রমযানের এক মাসের রোযা ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার কমিয়ে দেয়ার কারণে মানুষ অবর্ণনীয় উপকার লাভে সক্ষম হয়। রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে রক্ত চলাচল ব্যবস্থার ওপর। রক্ত চলাচল কোষের দুর্বলতার কারণে রক্তের মধ্যে অবশিষ্ট রেমন্যান্টিস মিশ্রিত হতে পারে না। অথচ ইফতারের সময় এ রক্ত চলাচল স্বাভাবিকতা অর্জন করে। ফলে রক্ত চলাচলকারী কোষের দেয়ালের মধ্যে চর্বিসহ অন্য উপাদান সঞ্চিত হতে পারে। এ কারণে বর্তমান যুগের অনেক ধরনের বিপজ্জনক রোগ হওয়ার আশংকা দূর হয়ে যায়। রোযার সময়ে কিডনীও বিশ্রাম লাভ করে। মোটকথা, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ রোযার বরকতের কারণে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।

সেল বা কোষের ওপর রোযার প্রভাব

রোযার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে সেলসমূহের ভারাসাম্য সৃষ্টির উপর। রোযার মাধ্যমে দেহের সেল বা কোষ বিশ্রাম লাভ করে। লালাযুক্ত ঝিল্লিকে বলা হয় ইপিথেলিয়াল সেল। এ সেল বা কোষ দেহের বর্জ্য নিষ্কাশনের দায়িত্ব পালন করে। রোযার মাধ্যমে এসব কোষ বিশ্রাম পাওয়ার কারণে তাদের পুষ্টি নিশ্চিত হয়। দেহের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সারা বছর রমযান মাসের প্রতীক্ষায় থাকে। কারণ রোযার মাধ্যমে তাদের বিশ্রামের সুযোগ ঘটে। অধিকতর সক্রিয় হওয়ার জন্যে নিজের মধ্যে তারা সজীবতা লাভে সক্ষম হয়।

নার্ভ সিস্টেমের ওপর রোযার প্রভাব

একটা কথা মনে রাখতে হবে, রোযা রাখার সময় কিছু লোকের মধ্যে যে রুক্ষতা উগ্রতা লক্ষ্য করা যায়, এর সাথে নার্ভ সিস্টেমের কোনো সম্পর্ক নেই। এ রকম অবস্থার জন্যে মানুষের ব্যক্তিগত রুক্ষ স্বভাব এবং উগ্র মেজাজ দায়ী। রোযা রাখার সময়ে নার্ভ সিস্টেম সম্পূর্ণ শান্ত থাকে। ইবাদতের মাধ্যমে অর্জিত প্রশান্তি আমাদের মনের সকল কলুষ, কালিমা, ক্রোধ দূর করে দেয়। অধিকতর খুশুখুযু বা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের কারণে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় সকল প্রকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যায়। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের ওপর যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে রোযার কারণে তা প্রায় সম্পূর্ণই লোপ পেয়ে যায়। রোযা রাখার ফলে আমাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে, তাই আমাদের মনস্তত্ত্বের ওপর বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

রোযা এবং অজুর সম্মিলিত প্রভাবে যে রকম দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্ম নেয়, এর ফলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যের নার্ভ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এক অপার্থিব প্রশান্তিতে মন পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মানুষের জন্যে রোযা যে আল্লাহর অনুগ্রহ, এটা বোঝার আরেকটি উপায় হলো, রোযার সময় সকল প্রকার উদ্বেগ হতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকা যায়।

রক্ত উৎপাদন এবং রোযার বৈশিষ্ট্য

হাড়ের টিস্যুর মধ্যে রক্ত তৈরি হয়। দেহের যখন রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা হাড়ের টিস্যুকে স্টিমুলেট করে, দুর্বল লোকদের মধ্যেও এ ব্যবস্থার কোনো ব্যত্যয় দেখা যায় না।

রোযার সময়ে রক্তে খাদ্যের উপাদান কম থাকে। তবে যে ব্যক্তি রক্তজনিত জটিল রোগে আক্রান্ত হয় তাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে এবং ডাক্তারের মতামত নিতে হবে। রোযার মাধ্যমে যেহেতু লিভার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম লাভ করে, তাই এসময়ে হাড়ের টিস্যু প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ পায়। এর ফলে খুব সহজেই অধিক পরিমাণ রক্ত তৈরি হতে পারে।

রোযার বরকতের কারণে একজন দুর্বল লোকের ওজন বেড়ে যেতে এবং মোটা লোকের ওজন কমে যেতে পারে।

আসুন, কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতের শেষাংশ আবার পাঠ করি এবং রোযার বরকত ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করি। আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন– যদি তোমরা বুঝতে পারো যে রোযা তোমাদের জন্যে উত্তম, তবে রোযা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

রোযার সামাজিক প্রভাব

ইসলাম ন্যায়নীতি, সুবিচার এবং গরীবের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। পেট যখন ভরা থাকে তখন অন্যের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করা যায় না। জিহ্বা যখন পানিতে ভেজা থাকে তখন অন্যের পিপাসার কষ্ট অনুভব হয় না। রোযা মুসলমানদের সহমর্মিতা, করুণা এবং গরীবের প্রতি সমবেদনা শিক্ষা দেয়। আর এর প্রত্যেকটি হচ্ছে ইসলামী সমাজের অংশ।

গরীবদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি করার জন্যে ইউরোপে অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু ধনী গরীবের ব্যবধান সম্ভবত ইউরোপেই সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়।

মাওসেতুং ছিলেন চীনের মহান নেতা। ধনী গরীব সমস্যার সমাধানের জন্যে তিনি তার ভাষণে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, নিজে যখন খাবে তখন যারা দেখবে তাদের এবং পাড়া প্রতিবেশীদেরও সে খাবারে শামিল করবে। নিজে ক্ষুধার্ত হতে ক্ষুধার্তদের কষ্ট অনুভব করবে। উল্লিখিত শিক্ষা মাওসেতুং-এর নয়; বরং এ শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের।

পাকিস্তানের বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সার্ভে রিপোর্ট

রমযান মাসে নাক, কান এবং গলার অসুখ কম হয়। জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি টীম এ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে এক রমযান মাসে পাকিস্তানে আসে। গবেষণা কর্মের জন্যে তারা পাকিস্তানের করাচী, লাহোর এবং ফয়সালাবাদ শহরকে

মনোনীত করে। সার্ভে করার পর তারা যে রিপোর্ট প্রণয়ন করে তার মূলকথা ছিলো নিম্নরূপ।

মুসলমানরা যেহেতু নামায আদায় করে, বিশেষত রমযান মাসে অধিক পাবন্দীর সাথে নামায আদায় করে থাকে, এ কারণে অজু করে। এ অজু করার কারণে তাদের নাক, কান, গলার অসুখ কম হয়। খাদ্য কম খাওয়ার কারণে পাকস্থলী এবং লিভারের অসুখ কম হয়। রোযার মাধ্যমে এ ডায়েটিং করার কারণে তারা মস্তিষ্ক এবং হৃদরোগে কম আক্রান্ত হয়।

(দৈনিক সংবাদ ১৯৮৮)

অভিজ্ঞতার আলোকে মানব দেহের ওপর রোযার প্রভাব

মৌসুম এবং ভৌগোলিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে রোযার মেয়াদ ১২ হতে ১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। রাত বড় হলে সাধারণত ইফতারের পর সাহারীর আগে দু'একবার খাবার খেতে হয়। শুধু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে একথা পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না যে, রোযার দ্বারা দেহের ওপর কেমন প্রভাব পড়ে। কেউ কেউ বলেন, রোযার কারণে দৈহিক দুর্বলতা দেখা দেয়। আবার কেউ বলেন, রোযা রাখার ফলে দেহের কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি হয় না। রোযা রাখার ফলে দুই ওয়াক্তের আহারের ব্যবধান কিছু বেশি হয়। ২৪ ঘণ্টায় যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় এতে যতোটুকু পুষ্টি অর্জন করে তা দেহের জন্যে যথেষ্ট। রোযায় দেহের পুষ্টি অন্য সময়ের চেয়ে মোটেই কম হয় না। তবে একটা বাস্তব সত্য যে, রমযান মাসে মানুষ প্রোটিন এবং কার্বো হাইড্রেটযুক্ত জিনিস অধিক ব্যবহার করে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ হতেও বলা যায়, রমযান মাসে দেহ সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি খাদ্যপ্রাণ লাভ করে।

রোযা স্বাস্থ্য রক্ষার একটি অতুলনীয় পদ্ধতি

আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর দেহকাঠামো এমনভাবে গঠন করেছেন যে, যতক্ষণ তারা খাদ্য পানীয় নিয়মিত এবং সময়মতো না পায়, ততক্ষণ তাদের পক্ষে জীবনধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। খাদ্য পানীয় কম বেশি হওয়ার সাথে সাথে তাদের স্বাস্থ্য প্রভাবিত হবে। পশুকুল তাদের বিবেচনা অনুযায়ী খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও সীমালঙ্ঘন করে। এর ফলে তাদের দেহ কাঠামো বিগড়ে

যায় এবং তাকে নানা রকম ক্ষতিকর রোগের সম্মুখীন হতে হয়। এ কারণেই অন্যান্য পশু এবং মানুষের রোগের ধরনের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দেহ রোগমুক্ত রাখার জন্যে এ যাবৎ যত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে কিছুদিনের জন্যে পানাহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাকস্থলী খালি রাখা। এর ফলে সারাদেহ সুস্থ থাকে। ক্ষুধার কারণে পাকস্থলীর অপ্রয়োজনীয় উপাদান জ্বলে পুড়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। তারপর পাকস্থলী স্বাভাবিকভাবে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

৬৩. তারাবীহ্

তারাবীহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আরাম বা শান্তি এবং এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে সারাদিন রোযা রাখার উপবাসের পর রাত্রিতে এশার নামাযের পর একটানা আট রাকাত নামায আদায় করা। সারাদিন রোযা রাখার পর সাধারণতঃ দেহে অস্থিরতার ছাপ নেমে আসে। এর উপর আবার একটানা আট রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ যা আরও অস্থিরতার কারণ, অথচ মহানবী (সা) তাকে আরাম বা শান্তি বলে ঘোষণা করেছেন।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, সারাদিন একটানা রোযার উপবাসে থাকার পর দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। এই দুর্বল অবস্থায় সন্ধ্যায় যখন খাদ্য খাওয়া হয় তখন এই খাদ্যের উপকরণগুলো দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় তিল তিল করে জমা হয়ে জটলার সৃষ্টি করে, এতে দেহের অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পায়। তখন এই অস্থিরতা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে একটানা কিছুক্ষণের জন্য চলাফেরা করা বা কিছুক্ষণের জন্যে শারীরিক ব্যায়াম করা এবং উক্ত শারীরিক ব্যায়াম বা হাঁটার বিকল্পই হচ্ছে উক্ত একটানা আট রাকাত তারাবীহর নামায আদায় করা।

তাই মহানবী (সা) বিশ্বমানবের দৈহিক কল্যাণ সাধনের জন্য যেমন পবিত্র কুরআনের আলোকে বলে গেছেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হলো, যেমন এই রোযা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা সংযমী হতে পার। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৩)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكٰوةُ الْجَسَدِ الصِّيَامُ -

অর্থ : রাসূল (সা) বলেছেন, দেহের যাকাত হচ্ছে রোযা।

(মুস্তাতরফ রোযার গুরুত্ব অধ্যায়) মুস্তাদরাকে নেই। তবে (শাবুল ঈমান হা/৩২৯৯)

বিজ্ঞানের আলোকে তারাবীহ্ নামাযের যৌক্তিকতা

রমযান মাসের রোযার কথা চিন্তা করলে বুঝা যায়, রমযানের রাতে তারাবীহ্ নামাযের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইফতারের সময় নানা রকমের খাবার সামনে থাকে। পেটে থাকে ক্ষুধা। সে সময়ে খেতে বসে মানুষ একথা চিন্তা করে না যে সারাদিন পাকস্থলী খালি ছিল। এমতাবস্থায় যদি একত্রে বেশি পরিমাণ খাবার পেটে প্রবেশ করানো হয়, তবে কি পরিণতি দেখা দিবে। ফলে বেখবর মানুষ নিজের ওপর অবিচার করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাহায্যকারী এবং মানুষের সকল রোগের সর্বোত্তম চিকিৎসক। তিনি প্রতিটি মানুষের জন্যে আলাদা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি অবশ্যই মানবীয় চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ভরা পেট মানুষের জন্যে তারাবীহ্ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিয়মিত দীর্ঘ সময় উঠাবসা করা হলে অধিক খাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব হতে রোযাদার নিরাপদ থাকবে। তারাবীহ্ নামায শেষ করে রোযাদার খুশী মনে হালকা দেহে ঘরে ফিরে আসে।

তারাবীহ্ নামায আদায় না করতে পারলে সেহরী না খাওয়াই উচিৎ। যদি কেউ তারাবীহ্ আদায় না করেই খায় তবে সে নানারকমের রোগের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারাবীহর ব্যবস্থা না থাকলে খাওয়ার পর রোযাদার ঘুমিয়ে পড়তো। এর ফলে তাকে যেসব রোগের সম্মুখীন হতে হতো সেসব রোগ নিম্নরূপ–

১. হৃদস্পন্দন এবং হৃদরোগ

২. রক্তচাপ

৩. পাকস্থলীর উত্তপ্ত হওয়া

৪. মাথা ঘোরানো এবং অন্যরকম অবস্থা

৫. দাঁতের মাড়ির অসুখ, বিশেষত পাইওরিয়া

৬. কফ, কাশি এবং লাগাতার সর্দি

৭. দেহের অবসাদ এবং শুষ্কতা

৮. উদারাময় এবং আমাশয়।

উল্লিখিত বিপজ্জনক রোগসমূহ সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা হলে বুঝতে পারা যাবে একটি সুন্নতের ওপর আমল করে আমরা অনেকগুলো ক্ষতিকর রোগ হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। তারাবীহ্ একটি হালকা ব্যায়ামের মতো। এ নামায আদায়ের পর আমরা আরামের ঘুম ঘুমাতে পারি। যেমন মানুষ অনিদ্রায় ভোগে তাদের জন্যে তারাবীহ্ বিশেষ উপকারী ও প্রতিষেধক। একজন ফার্মাসিস্ট বলেছেন, তারাবীহ্ নামায আদায়ের মাধ্যমে যৌন রোগ আরোগ্য হয়ে যায় এবং শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়। উরু এবং পায়ের মাসল মজবুত হয়। পাকস্থলীর রোগ এবং হৃদরোগ আরোগ্য হয়। রমযান মাসে বিকেলের পর হতে দেহ ক্লান্তি এবং অবসাদে ভরে যায়। এ ক্লান্তি এবং অবসাদ হতে নিস্কৃতি পাওয়ার উপায় হচ্ছে তারাবীহ্ নামায।

৬৪. রাগ
ANGER

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যতটা সম্ভব ততটাই রাগ বা উত্তেজনা পরিহার করে চলবে, তবে দেহমনের হবে উপকার। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, বেশি রাগী লোকেরা তুলনামূলকভাবে কম দিন বাঁচে। এর কারণ তারা গবেষণা করে পেয়েছেন যে, রাগ করলে স্ট্রেস হরমোন নিঃসৃত হয় যা মানব দেহের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেয়। মানব দেহে কোলেস্টেরল বেড়ে যাবার ফলে রক্তনালীর দেয়াল পুরু হয়ে যায়। ফলে রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কমে আসে স্বাভাবিক আয়ু। তাই বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, কোনো মানুষ বেশিবেশি দিন বেঁচে থাকতে চাইলে তাদের 'রাগ' করার মতো পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। ক্রোধ দমন করে হাসিখুশী থাকতে হবে। নচেৎ বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। (জনকণ্ঠ ৩১-১২-১৯৯৯)

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই এই পৃথিবীর মানুষদেরকে 'রাগ' পরিহার করার জন্য হাদীস বলে গেছেন। যেমন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَلِكٌ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ اَلَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - (جامع البخارى جلد ثانى صفه ٠ كِتَابُ الاداب)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন, শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে, ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।

(বুখারী হা/৬১১৪, ২য় খণ্ড ৯০৩ পৃষ্ঠা কিতাবুল আদাব, মুসলিম ২৬০৯)

حَدَّثَنَا يَحْىٰ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا - قَالَ لَا تَغْضَبْ - (جامع البخارى جلد ثانى صفه ٠ كتاب الاداب)

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি মহানবী (সা) কে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে কিছু উপদেশ দিন, তখন মহানবী (সা) বললেন, কখনও 'রাগ' করো না। এবং তিক্ত স্বভাব প্রত্যাহার করো। তারপর আবার বললেন কখনও রাগ করো না।

(বুখারী হা/৬১১৬, ২য় খণ্ড ৯০৩ পৃষ্ঠা কিতাবুল আদব।)

এছাড়াও মহানবী (সা) আরও বলেছেন যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে ক্রোধের ঢোঁক পান করার চেয়ে উত্তম কোনো ঢোঁক নেই। তিনি আরও বলেছেন, হে মুসলমানেরা! যদি তোমাদের মধ্যে কারো ক্রোধ আসে, তা হলে তার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে চুপ হয়ে যাওয়া জরুরি।

বিখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ফ্রয়েড ক্রোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাহলো :

ক্রোধ এমনই এক মারাত্মক ব্যাধি যা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠিত জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। ক্রোধের ফলে তার শিরাতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয়সমূহ

কুঁকড়ে যায়। স্মরণশক্তি লোপ পায়। সহনশক্তি কমে যায় এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়। সর্বদা লজ্জা ও অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন হয়।

আমেরিকার ডিউক ইউনির্ভার্সিটির বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভাসার রেড ফোর্ড বি ভিলনজের মতে, ক্রোধ, শত্রুতা ও হিংসাকারী ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার মতে, এগুলোর দ্বারা মানুষ ঐ পরিমাণই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ ধূমপান এবং হাইব্লাডপ্রেসারের কারণে। (দৈনিক ইনকিলাব ২১-৬-০৪ ইং)

৬৫. রাস্তা, ছায়া ও পানি

ROAD, SHADOW AND WATER

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন কেউ রাস্তায় পায়খানা করে, তখন এই পায়খানার অসংখ্য প্রজাতির রোগ জীবাণু উক্ত রাস্তার ধূলাবালির মধ্যে ধ্বংস না হয়ে মিশে থাকে। এবং উক্ত রোগজীবাণুগুলো বাতাসের সাহায্যে উক্ত রাস্তায় লোক চলাচলের সময় নিঃশ্বাসের সাথে তাদের দেহে প্রবেশ করে তাদের দেহের ভেতর নানা রোগের সৃষ্টি করে। এছাড়াও উক্ত পায়খানা পরিবেশকেও দূষণ করে তোলে।

উক্ত বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, যখন কেউ কোনো গাছের নীচে পায়খানা করে তখন এই পায়খানার নানা প্রজাতির রোগ জীবাণুগুলো বাতাসের সাহায্যে উক্ত গাছের পাতা, ফুল ও ফলের মধ্যে গিয়ে অবস্থান করে. তখন উক্ত রোগ জীবাণু বাতাসের সাহায্যে উক্ত মানুষের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তার দেহে প্রবেশ করে এবং দেহে নানা রোগের সৃষ্টি করে।

এছাড়াও উক্ত বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, যখন কেউ কোনো বদ্ধ জলাশয়ে পায়খানা করে, তখন এই পায়খানার অসংখ্য প্রজাতির রোগ জীবাণুগুলো পানির মধ্যে ধ্বংস না হয়ে পানির মধ্যে মিশে যায়। তখন যদি কোনো মানুষ উক্ত জলাশয়ে নামে বা ইহার পানি পান করে তখন, উক্ত রোগ জীবাণুগুলো ঐ লোকের দেহের ভেতর প্রবেশ করে। তখন তারা এই পানের দ্বারা ও নিঃশ্বাসের দ্বারা এবং তার দেহের লোমের গোড়া দিয়ে তার দেহে প্রবেশ করে তার দেহে নানা রোগের সৃষ্টি করে।

তাই স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত তিন স্থানে পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই উক্ত তিন স্থানে পায়খানাকে আল্লাহ পাকের অভিশাপ বলে উল্লেখ করে হাদীস বলে গেছেন। যেমন–

عَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِتَّقُوا الْمَلَا عِنَ الثَّلٰثَةَ ـ اَلْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ ـ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ ـ

অর্থ : মুয়াজ (রা) বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা তিনটি ক্ষতিকারক অভিশাপ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। যেমন–

১. জমাকৃত কোনো জলাশয়ে,

২. লোক চলাচলের কোনো রাস্তায়,

৩. এবং কোনো গাছের নীচে বা ছায়ায় পায়খানা করা হতে বিরত থাক।

(আবু দাউদ হা/২৬ ও ইবনে মাজা হা/৩২৮)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنَ قَالُوْا وَمَا اللَّاعَنَانِ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْفِىْ ظِلِّهِمْ ـ

অর্থ : আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা দু'টি অভিশাপ হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। তখন সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূল (সা) সে অভিশাপ দু'টি কি? তখন মহানবী (সা) বললেন-

১. লোক চলাচলের পথে পায়খানা করা।

২. তাদের ছায়াদার কোনো ফলের গাছের নীচে পায়খানা করা।

(মুসলিম হা/৬৪১, ১ম খণ্ড কিতাবুত তাহারাত।)

৬৬. রৌপ্য

SILVER

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, রৌপ্য, স্বর্ণ, তামা, কাঁসা ও পিতল এদের সবগুলোই স্বয়ংক্রিয় ধাতু এবং এইগুলোর দ্বারা তৈরি কোনো গ্লাস প্লেট ও পাত্রের মধ্য হতে সর্বদাই স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর বিষাক্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হয়। তাই ঐসব পাত্রে কোনো রসালো খাদ্য অথবা কোনো পানীয় খাদ্য দ্রব্য রাখলে, উক্ত পাত্রের বিষাক্ত দূষিত পদার্থের প্রভাবে উক্ত খাদ্যদ্বয়ের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে ইহা খাদ্যের পরিবর্তে অখাদ্যে পরিণত হয়ে যায়। এছাড়াও উক্ত পাত্রসমূহে কোনো ভিজা খাদ্যদ্রব্য রেখে সাথে সাথে খেলেও উক্ত পাত্রের স্বয়ংক্রিয় বিষাক্ত দূষিত পদার্থ খাদ্যের সাথে মিশে যায় এবং সে খাদ্য খেলে দেহের বিশেষ ক্ষতি সাধন হয়। এছাড়াও সবাই লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁসা, তামা ও পিতলের কোনো পাত্রে 'দৈ' কিংবা 'মাঠা দৈ' অথবা ঠাণ্ডা দুধ রাখলে অতিদ্রুত বিষাক্ত হয়ে যায়। এর মূল কারণই হচ্ছে ঐগুলোর সবই স্বয়ংক্রিয় ধাতু, তাই ইহার মধ্য হতে নির্গত বিষাক্ত দূষিত পদার্থ উক্ত দৈ, মাঠা দৈ ও ঠাণ্ডা দুধে মিশে ইহাদের গুণাগুণ নষ্ট করে দিয়ে, ইহাদেরকে খাওয়ার অযোগ্য করে দেয়।

তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, কাঁসা ও পিতলের নির্মিত কোনো পাত্রে কোনো রসালো খাদ্য দ্রব্য রেখে ভক্ষণ বা পান করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাই উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা সকলকেই উক্ত পাত্রসমূহের রসালো খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় খাদ্য দ্রব্য খেতে ও পান করতে নিষেধ করেছেন।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহু পূর্বেই, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, কাঁসা ও পিতলের পাত্রে রেখে খাদ্য ও পানীয় পান করতে নিষেধ করে হাদীস বলে গেছেন। যেমন–

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَشْرَبُوْا فِيْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔

অর্থ : হুজায়ফা (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, তোমরা কখনও স্বর্ণ ও রৌপ্যের নির্মিত পাত্রে কোনো পানীয় দ্রব্য পান করো না।

(বুখারী হা/৫৬৩৩, ২য় খণ্ড ৮১৬ পৃ. কিতাবুল আতআমা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اِنَاءِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ ـ

অর্থ : উম্মে ছালমা (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি রৌপ্যে নির্মিত কোনো পাত্রে পান করবে, নিশ্চয় সে যেন জাহান্নামের আগুন দ্বারা তার পেটকে প্রবাহিত করল। অর্থাৎ উক্ত রৌপ্যের পাত্রের কোনো পানীয় দ্রব্য পান করলে, ইহা হতে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ পেটে গিয়ে যে অসুখের সৃষ্টি করে, ইহার কষ্ট জাহান্নামের আগুন বা পেরেশান।

(বুখারী হা/৫৬৩৪, ২য় খণ্ড ৮৪২ পৃ. কিতাবুল আশরাবা)

৬৭. লালা

SALIVA

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যার কথা বলার শব্দ উচ্চারণের বাচনভঙ্গি শুদ্ধ ও সঠিক, অর্থাৎ কোনো মানুষ যখন কোনো শব্দ উচ্চারণ করে তখন যদি সে উক্ত শব্দের প্রতিটি অক্ষর, মুখের ভেতরের যে অংশ হতে যে অক্ষরটি উচ্চারণ হওয়ার দরকার ঠিক মুখের ভেতরের সেই স্থান হতে ঠিকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলে, তার জীবনে কখনও মুখ দিয়ে লালা পড়বে না। এমনকি বার্ধক্যকালেও তার মুখ দিয়ে লালা পড়বে না। এবং সে যে ভাষারই লোক হউক না কেন? তবুও সে যদি তার নিজ ভাষার প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলোর যে অক্ষরটি মুখের ভেতরের যে স্থান হতে উচ্চারণ হওয়া দরকার, ঠিক সেই স্থান হতে একটু শব্দ করে উচ্চারণ করে, তবে তার মুখ দিয়ে কখনও লালা পড়বে না এবং মুখ বাঁকা হবে না।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই কুরআন পাঠের প্রতিটি শব্দের উচ্চারণকে পবিত্র কুরআনের আলোকেই সহীহ শুদ্ধ করে মাখরাজ আদায় করে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমন– وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ـ

অর্থ : এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।

(সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-৪)

অর্থাৎ মাখরাজ আদায় করে কুরআনের প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে পাঠ কর। মাখরাজ পবিত্র কুরআনের প্রতিটি অক্ষর মুখের ভেতরের যে যে স্থান হতে যে যে অক্ষর উচ্চারণ হওয়া দরকার, কুরআন পাঠের সময় কুরআনের অক্ষরগুলো মুখের ভেতরের ঠিক ঠিক স্থান হতে উচ্চারণ করাকেই মাখরাজ বলা হয়।

অতএব, পবিত্র কুরআন কারীম পাঠ করার সময় যে ইহার প্রতিশব্দের প্রতি অক্ষরের মাখরাজ সঠিকভাবে আদায় করে সুবিন্যস্ত ও স্পষ্টভাবে পাঠ করবে। তার জীবনে কখনও মুখ দিয়ে লালা পড়বে না এবং মুখ বাকা হবে না। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) একটি হাদীসও বলে গেছেন। যেমন–

حَدَّثَنَا سَعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ اَلْقُرْاٰنُ ۔(ابن ماجه جلد الثانى صفه ۰ ابواب الطب)

অর্থ : আলী (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, সর্বরোগের উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে, 'আল কুরআন' অর্থাৎ সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে মাখরাজ আদায় করে কুরআন পাঠ করলে সর্বপ্রকার রোগ দূরীভূত হয়। এবং এটাই হচ্ছে মানুষের উত্তম চিকিৎসা।

(ইবনে মাজা হা/৩৫০১, ২য় খণ্ড ২৫০ পৃ. আবুওয়াবুত তিব্ব।) যয়ীফ

৬৮. এক শ্বাস

A BREATH

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এক গ্লাস পানি এক নিঃশ্বাসে পান করলে হৃদযন্ত্রে চাপ পড়ে, তাতে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হয় এবং হৃদযন্ত্রে চাপ পড়লে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা বাড়ে। এবং এতে শ্বাস প্রশ্বাসেও কষ্ট সাধিত হয়। তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মানুষের উপরোক্ত দৈনন্দিন জীবনের উক্ত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, যখন এক গ্লাস পানি পান করবে তখন সে পানি ধীরে ধীরে কমপক্ষে কয়েক নিঃশ্বাসে পান করবে। তাহলে, তার জীবনে কখনও হৃদরোগ, রক্তচাপ, অস্থিরতা ও আরও নানা প্রকার রোগ তার হবে না।

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই তাঁর উম্মতের লোকদেরকে এক গ্লাস পানি এক নিঃশ্বাসে পান করতে নিষেধ করে গেছেন। যেমন– তাঁর একটি হাদীস :

حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبُ نَفَسًا وَّاحِدًا۔

অর্থ : আবু কাতাদাহ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানীয় পান করবে তখন তোমরা উক্ত পানীয় এক নিঃশ্বাসে পান করবে না।

(আবু দাউদ হা/৩১, ১ম খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা কিতাবুত তাহারাত।)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর উম্মতকে যেকোনো পানীয় তিন নিঃশ্বাসে পান করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন তাঁর একটি হাদীস :

حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِىْ عَصَامٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا۔

অর্থ : আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি কোনো পানীয় পান করতেন, তখন তিনি তা তিন নিঃশ্বাসে পান করতেন। (আবু দাউদ হা/৩৭২৯, ২য় খণ্ড ১৬৮)

৬৯. শিংগা

HORN

পৃথিবীর যে সকল মানুষের জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি স্বাভাবিকের তুলনায় কম তাদের জ্ঞান-বিবেক, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনয়ন করার জন্য অদ্যাবধি পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী কোনো সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেননি। কিন্তু সমাজকল্যাণ বিজ্ঞানীরা উক্ত প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণের জন্য নানা শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছেন, কিন্তু তাতেও কোনো আশানুরূপ ফল হয়নি। কিন্তু মহানবী মুহাম্মদ (সা) আজ হতে বহু বৎসর পূর্বে পৃথিবীর উক্ত প্রতিবন্ধি মানুষের জ্ঞান-বিবেক, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তির উন্নতির জন্য এই পৃথিবীর মানুষদেরকে একটি চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রদান করে একটি হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْثَلُ وَفِيْهِ شِفَاءٌ وَّبَرْكَةٌ وَّتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ وَفِى الْحِفْظِ ـ (ابن ماجه جلد ثانى صفه ابواب الطب)

অর্থ : ইবনে ওমর বলেন যে, নিশ্চয় আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, মানুষের ঘাড়ের রগে শিংগা লাগানো অতি উত্তম এবং এর মধ্যে রয়েছে সুচিকিৎসা ও কল্যাণ এবং এর দ্বারা জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে। (ইবনে মাজা হা/৩৪৮৮, ২য় খণ্ড ২৪৯ পৃ. আবুওয়াবুত তিব্ব।)

লক্ষ্য করলে অবলোকিত হয় যে, যদি আধুনিক বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মহানবী (সা)-এর উক্ত বর্ণিত হাদীসের কথামত মানুষের ঘাড় ও তার নানা রগসমূহ নিয়ে নানা গবেষণা করে যদি দেখে, তাহলে তারা অবশ্যই পাবে যে, ঘাড়ের কোনো কোনো স্থানে অথবা কোনো কোনো রগে শিংগা লাগালে অথবা শিংগা লাগানোর মতো কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করলে, মানুষের জ্ঞান-বিবেক, স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাবে অথবা অস্বাভাবিক হলে তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। তাহলে তা অবশ্যই মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে।

৭০. সাদা

WHITE

রং ও আলো বিষয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্রোসোপ্যাথী বলেছেন যে, সাদা পোশাক হলো ক্যান্সার হতে প্রতিরক্ষার সর্বোত্তম ঔষধ। এবং তার মতে সাদা পোশাক মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড ও চর্মের সংরক্ষক।

বিখ্যাত চিকিৎসক ডা. লহী কুনীর গবেষণা : তিনি ছিলেন জার্মানির একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও চিকিৎসক। তিনি বলেন, সমস্ত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ সাদা পোশাককে অধিক প্রাধান্য দেন।

খলিল জিব্রান : তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক। তিনি সাদা পোশাককে সাদা ফুলের সমতুল্য মনে করতেন। তিনি বলেন যে, গোলাপের সাদা পাঁপড়ি ও আমার দেহের সাদা পোশাক উভয়টাই সমপর্যায়ের। আর উভয়টাই আমার আনন্দের সামগ্রী।

এমন কি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সাদা পোশাক পরিধানকারী ব্যক্তি (Setaceous Glands) ঘামের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফাংগাল ইনফেকশন (Fingal Infection) এর ন্যায় মারাত্মক ব্যাধি হতে রক্ষা পেতে পারে। তারা চর্মরোগ ও এলার্জি এবং উচ্চ-রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের সর্বদা সাদা পোশাক পরিধানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা এটাও লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, সাদা কাপড় সর্বপ্রকার আবহাওয়া পরিবর্তনের মোকাবিলা করে থাকে। কারণ তীব্র গরম মৌসুমেও সাদা পোশাক গরম হয় না। কেননা ইহা যেমনি গরমকে আকর্ষণ করে না, তেমনি প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে ঠাণ্ডার কারণে তা শীতলও হয়ে যায় না।

এছাড়াও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেয়েছেন যে, সাদা কাপড় উত্তাপ এবং আলোর একটি উত্তম প্রতিফলক এবং অপরদিকে ইহা উত্তাপ এবং আলোর একটি কুপরিশোষক। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যেহেতু সাদা কাপড়ের উত্তাপ ধারণক্ষমতা কম এবং উত্তাপ বিকিরণক্ষমতা বেশি, সেহেতু গরমের দিনে সাদা কাপড় পরিধান করা সুবিধাজনক ও আরামদায়ক।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উপরোক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই তিনি সাদা পোশাকের গুণাগুণ রহস্য বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি সাদা

পোশাক পছন্দ করতেন এবং পরিধানও করতেন। এবং সাদা পোশাক পরিধান করা তার আদর্শ একথা তিনি তাঁর উম্মতগণকে বলেও গেছেন। এবং মৃত্যু ব্যক্তিকে সাদা কাপড় দিয়ে কাফন পরিধান করলো তাঁর আদর্শ, একথাও তিনি তাঁর উম্মতগণকে বলে গেছেন।

আরব দেশে তীব্র গরম ও সূর্যকিরণ প্রখর, এবং সেইখানে সাদা কাপড়ের পোশাক উত্তাপ এবং আলোর উত্তম প্রতিফলক হিসেবে কাজ করবে একথা একমাত্র মহানবী (সা)-ই সর্বপ্রথম এই পৃথিবীতে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি সাদা কাপড়ের পোশাক পরিধান করা তাঁর উম্মতের ওপর সুন্নাত করে গেছেন।

ফেরেশতারা আলোর সৃষ্টি এবং সাদা পোশাক হচ্ছে আলোকের উত্তম প্রতিফলক, তাই ফেরেশতারা সদা সর্বদাই মহানবী (সা)-এর নিকট সাদা পোশাক পরিধান করে আসতেন। এবং প্রত্যেক মানুষের কবরে ফেরেশতারা সাদা পোশাক পরিধান করে যাবে। তাই মহানবী (সা) মৃত্যু ব্যক্তিকে সাদা কাপড় দিয়ে দাফন কাফনের জন্য তাঁর সকল উম্মতগণকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ফেরেশতারা যে মহানবী (সা)-এর নিকট সাদা পোশাকে আসতেন তার ওপর দু'টি হাদীস নিম্নে দেয়া হলো : যেমন–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ. ثُمَّ انْطَلَقَ. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ. يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهٗ جِبْرِيْلُ. اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ. (رواه مسلم)

অর্থ : ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদা আমরা কতিপয় সাহাবী রাসূল (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমনি মুহূর্তে এক আগন্তুক এসে উপস্থিত হলেন। তার পোশাক পরিচ্ছদ ছিলো ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর মধ্যে ভ্রমণের কোনো চিহ্নও দেখা যায় নি। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছে না। তারপর লোকটি চলে গেল। অতঃপর আমরা কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর মহানবী (সা)

আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ওমর! প্রশ্নকারী কে তা কি জান? আমি বললাম আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা)-ই ভালো জানেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, ইনি জিবরাঈল (আ) যিনি তোমাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা প্রদানের জন্যে আগমন করেছিলেন। এই হাদীসখানি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন। (সহীহ মুসলিম হা/১০২)

حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَمِيْنِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيْضٌ يَوْمَ اُحُدٍ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ۔(بخاری شریف کتاب اللباس)

অর্থ : সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন আমি রাসূল পাক (সা)-এর ডানে ও বামে দু'জন পুরুষ লোককে দেখতে পেলাম। তাদের পরিধানে সাদা পোশাক ছিল। তাদেরকে আমি কখনও এর আগে ও পরে দেখিনি। (বুখারী হা/৫৮২৬, কিতাবুল লিবাস।)

অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, সাদা পোশাকের উত্তাপ ধারণ ক্ষমতা কম এবং উত্তাপ বিকিরণ ক্ষমতা বেশি। তাই গরমকালে সাদা পোশাক পরিধান করা সুবিধাজনক ও আরামদায়ক। তাই মহানবী (সা) তার দেশে তীব্র গরম হওয়ার কারণে এবং ফেরেশতাদের পোশাক সাদা হওয়ার কারণে তিনি সাদা পোশাক পরিধান তাঁর আদর্শ বলে ঘোষণা করে গেছেন। এবং বলেছেন যে, তোমরা নিজেরা সাদা কাপড় পরবে এবং মুর্দাকে কাফনেও পরাবে। (মেশকাত)

৭১. সুর
TUNE

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের জন্য সুর অপরিহার্য্য। যখন কোনো মানুষ সুর করে গান বা কোনো কথা বলে, তখন তার হৃদযন্ত্রে, ফুসফুসে ও মস্তিষ্কে সুর তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, এতে তার হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক হতে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাসীয় ক্ষতিকর পদার্থ বের হয়ে আসে। যার ফলে তার হৃদযন্ত্রের বিষ ব্যথা, জটলা ইত্যাদি কিছুটা হলেও দূরীভূত হয় এবং ফুসফুসের রক্তচাপ দূর হয় এবং মস্তিষ্কের ব্যথা, জ্বালা, ভারসহ সর্বপ্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা পূর্বের তুলনায় কমে যায়।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, মানুষের শরীর যেমন দৈহিক নানা পরিশ্রমের দ্বারা ঘেমে অস্থির হয়ে যায়, তখন তাকে বাতাস দিয়ে ঠাণ্ডা করে তার শরীর জুড়াতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে যখন কোনো মানুষের মন হতাশা, দুঃশ্চিন্তা, মৃত্যুভয়, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির মধ্যে ভরপুর থাকে। তখন তার একমাত্র অবলম্বনই হচ্ছে 'সুর'। কারণ এই সুরই তার উক্ত হতাশাসমূহ দূরীকরণে সাহায্য করে এবং মনের ঘাম ও অস্থিরতা জুড়াতে সাহায্য করে।

উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা এছাড়াও বলেন যে, মানুষের গানের বা কথার সুরে মনের শান্তি ফিরে আসে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়। ফলে শরীরের রক্তচাপ দূর হয় এবং হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক শক্তি ফিরে আসে। মূল কথা হচ্ছে, সুর মানুষকে দুঃশ্চিন্তা হতে বিরত রাখতে সাহায্য করে।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই মানুষদেরকে দুঃখ-কষ্ট হতাশা, দুঃশ্চিন্তা, মৃত্যুভয় হতে রক্ষা করার জন্য পবিত্র কুরআন পাঠের মধ্যে সুরের বিকল্প হিসাবে কিছু নিয়ম-কানুনের নির্দেশ দেন এবং কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করার উক্ত নিয়ম কানুনগুলো ঠিকমত আদায় করলে ভিন্ন একটি সুর তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যা দেহ-মনের শান্তি আনয়নের বিকল্প বা মূলমন্ত্র। যেমন– মহানবী (সা) র একটি হাদীস।

حَدَّثَنَا سَعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ الدَّوَاءِ اَلْقُرْاٰنُ ـ(ابن ماجه جلد الثانى صفه ٠ ابواب الطب)

অর্থ : আলী (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলেছেন, সর্বরোগের উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে আল কুরআন। অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর নির্দেশমত কুরআন তিলাওয়াত করলে, তাতে যে সুরের সৃষ্টি হয় এবং সেই সুরই হচ্ছে দেহের আভ্যন্তরীণ সকল যন্ত্রাংশের সকল রোগ, অশান্তি ও অস্থিরতা দূরীকরণের মূল মন্ত্র। (ইবনে মাজা হা/৩৫০১, ২য় খণ্ড ২৫০ পৃ. আবুওযাবুত তিব।)

এছাড়াও মহানবী (সা) পবিত্র কুরআনের আলোকে আরও বলেছেন যে, তোমরা পবিত্র কুরআনের বাণীকে তাজবীদের সাথে (সুর করে) পাঠ করো। যেমন– পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ـ

অর্থ : এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।

(সূরা মুয্যাম্মিল : আয়াত-৪)

অর্থাৎ তাজবীদ হচ্ছে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুনের এক প্রকার 'সুর'। এবং তাজবীদের সাথে কুরআন পাঠ করলে যে সুরতরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা মানুষের দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশের জন্য খুব উপকারী এবং শ্বাস-প্রশ্বাসেরও উপকার সাধিত হয়।

৭২. স্বর্ণ

GOLD

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, তুলনামূলকভাবে, স্বর্ণের সৌন্দর্য ছেলেদের চেয়ে বেশি, তাই স্বর্ণ ছেলেদের লাবণ্যকে হরণ করে নেয়, ফলে ছেলের সৌন্দর্য তার স্বর্ণ ব্যবহারের পর পূর্বের তুলনায় কমে যায়। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে স্বর্ণের সৌন্দর্য্য মেয়েদের চেয়ে কম, তাই স্বর্ণ মেয়েদের লাবণ্যকে হরণ করে নিতে পারে না, ফলে মেয়ের সৌন্দর্য্য তার স্বর্ণ ব্যবহারের পর পূর্বের তুলনায় বেড়ে যায়।

এছাড়াও উক্ত পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, ছেলেদের চোখে মেয়েদের সৌন্দর্য স্বর্ণের চেয়ে বেশি, তাই মেয়েরা স্বর্ণ ব্যবহার করলে মেয়েদের সৌন্দর্য্য আরও বেড়ে যায়। ফলে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের আকৃষ্টতা আরও বেড়ে যায়। অপরদিকে মেয়েদের চোখে স্বর্ণের সৌন্দর্য্য ছেলের চেয়ে বেশি, তাই ছেলেরা স্বর্ণ ব্যবহার করলে, মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়া ছেলেদের প্রতি না গিয়ে স্বর্ণের প্রতি চলে যায়, ফলে মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ছেলেরা স্বর্ণ ব্যবহার করলে, তাদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ কমে যায়। কারণ মেয়েরা স্বর্ণকে ছেলের চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে লোভী এবং এই লোভ তাদের যৌবন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্বর্ণ ব্যবহার উত্তম।

এছাড়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা আরও বলেন যে, স্বর্ণ হচ্ছে একটি স্বয়ংক্রিয় ধাতু, যার বিষাক্ত দূষণীয় প্রভাবের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছেলের দেহের চেয়ে মেয়ের দেহে বেশি, তাই ছেলেরা স্বর্ণ ব্যবহার করলে তাদের স্বাস্থ্যে এক বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু মেয়েরা স্বর্ণ ব্যবহার করলে উক্ত স্বর্ণের বিষাক্ত দূষণীয় প্রভাব মেয়েদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কারণ মেয়েরা স্বর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলে তাদের যৌবন শক্তির উগ্রতা কমে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।

তাই পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা নানা গবেষণা করে বলেন যে, ছেলেদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা ভালো নয়। এবং মেয়েদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা ভালো। এছাড়া স্বর্ণ মেয়েদের যৌবন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই ছেলেদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম করে হাদীস বলে গেছেন। যেমন–

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرِ لِاُنَاثِ اُمَّتِىْ وَحُرِّمَ عَلٰى ذُكُوْرِهَا۔ (نسائی شریف جلد الثانی صفه ۲۸۵ کتاب الزنات)

অর্থ : আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত যে, নিশ্চয় মহানবী (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের মেয়েদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় ব্যবহার করা বৈধ করা হলো এবং এই স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় ব্যবহার করা আমার উম্মতের ছেলেদের ওপর অবৈধ বা হারাম করা হলো।

(নাসায়ী হা/৫১৪৮, ২য় খণ্ড ২৮৫ পৃ. কিতাবুজ যিনাত।)

৭৩. হাঁটা

WALK

আমেরিকার বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর পল হোয়াইট বলেছেন যে, মানুষের বয়স যতই হোক না কেন, হাঁটা হচ্ছে তার সুস্বাস্থ্যের সংরক্ষণের একমাত্র প্রধান চিকিৎসা, তিনি আরও বলেছেন, যে মানুষ নিয়মিত প্রতিদিন হাঁটবে, তার জীবনে কখনও হৃদরোগ, রক্তচাপ জনিত রোগ, ডায়াবেটিস, মাথা ব্যথা ইত্যাদি জনিত রোগ হবে না। কারণ হাঁটার মাধ্যমে শরীরের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং হাঁটা হচ্ছে দেহকে সুস্থ, সবল ও সংরক্ষণের জন্য সকলের একটি সহজ, স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। (শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ৭ম শ্রেণী)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই তাঁর উম্মতের প্রতিটি মানুষকে সকাল-বিকাল হাঁটার অভ্যাস করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে হাদীস বলে গেছেন। যেমন :

حَدَّثَنَا مُعَلَّىُّ بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا۔

অর্থ : আনাস বিন মালেক (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, সকালে অথবা বিকালে আল্লাহর পথে হাঁটা, দুনিয়া ও ইহার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

(বুখারী হা/২৭৯২, ১ম, ৩৯২ পৃ. কিতাবুল জিহাদ, মুসলিম : ১৮৮০)

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَفْضَلُ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا۔

অর্থ : সাহাল বিন সাদ (রা) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা) বলেছেন, আল্লাহর পথে সকাল-বিকাল হাঁটা, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অতি উত্তম।

(বুখারী হা/২৭৯৪, ১ম খণ্ড ৩৯২ পৃ. কিতাবুল জিহাদ, মুসলিম : ১৮৮৯)

এছাড়া হাদীসে আরও আছে যে, মহানবী (সা) সকাল-বিকাল হাঁটতেন এবং যা করতেন, তা তিনি এই পৃথিবীর সকল মানুষদেরকে করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এছাড়া মহান আল্লাহ পাকও মহানবী (সা)-এর কাজ কর্মকে অনুসরণ করার জন্য এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থ : বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ পাককে পছন্দ কর, তবে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। তা হলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

(সূরা আল ইমরান : আয়াত-৩১)

৭৪. হাসি

LAUGH

পৃথিবীর বিখ্যাত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডা. পল গবেষণা করে দেখেছেন যে, সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের অধিকারী হতে হলে হাসি অপরিহার্য্য। হাসি একজন মানুষকে সুস্থ দেহ নিয়ে অনেক দিন বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডা. পল বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর ওপর ১৮ রকমের হাসির এক জরিপে দেখেছেন যে, সুন্দর হাসিতে মস্তিষ্কে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে তাকে সুখী করছে। তিনি বলেন, যখন হাসবেন আপনার মুখমণ্ডল এর ডান দিকে গোশত পেশির সংকোচনের কারণে মস্তিষ্কে এক ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যা সত্যিকার অর্থে মানুষের মনে সুখানুভূতি জাগায়। সুতরাং ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার পল একম্যান বলেন যে, যদি আপনি অনেক দিন বেঁচে থাকতে চান তাহলে হাসুন।

(যুগান্তর ০২.০৩.২০০৩ ইং, ডা. প্রমানন্দ মিত্র)

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই সুস্থ মনের সুস্থ দেহের অধিকারী হওয়ার নমুনা তাঁর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার জন্য তিনি তার সুন্দর হাসির নমুনা তাঁর উম্মতের মধ্যে রেখে গেছেন। যেমন–

اَخْبَرَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ

بْنِ جِزْءٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرُ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ۔

অর্থ : আব্দুল্লাহ বিন হারেস বিন জাযায়ী বলেন যে, আমি কাউকে রাসূল (সা)-এর চেয়ে অতি সুন্দর হাসতে দেখিনি।

(তিরমিযি হা/৩৬৪১, ১৬ পৃ. আবুওয়াবু শামায়েল)

حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا كَانَ يَضْحَكُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلَّا تَبَسُّمًا۔

অর্থ : আব্দুল্লাহ বিন হারেস (রা) বলেন যে, সুন্দর করে মুচকি হাসি ছাড়া মহানবী (সা)-এর অট্টহাসি দেয়ার অভ্যাস ছিল না।

(তিরমিযি হা/৩৬৪২, ১৬ পৃ. আবওয়াবু শামায়েল।)

মহানবী (সা)-এর উক্ত হাদীসদ্বয়ের নমুনা আমাদের অনুসরণ করাই উক্ত বিজ্ঞানীদের সুন্দর হাসির বিকল্প।

এছাড়াও মহানবী (সা) আরও বলেছেন যে, কারো সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা ছদকাহ। এটা মূলত মহব্বত এবং প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধির বিশেষ উপায়। তিন প্রকার হাসির মধ্যে মুচকি হাসি সর্বোত্তম।

একজন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী বলেন, আচার ব্যবহারের মূল ভিত্তি হিসেবে মৃদু হাসি বা মুচকি হাসির কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে মুচকি হাসি আছে সেখানে সৌজন্যমূলক আচার ব্যবহার বিদ্যমান, আর যখন এ হাসি খতম হয়ে গেল তখন মহব্বত-ভালোবাসা, সৌহার্দ-সম্প্রীতি, মানবতা, সহমর্মিতার প্রভাব আপনা আপনি শেষ হয়ে যায়। মুচকি হাসির তরঙ্গ বা ঢেউ সহজেই অন্যের অন্তরে মহব্বত ও সহমর্মিতার ঢেউ সৃষ্টি করে।

(ইনকিলাব ২১-৬-০৪)

সুতরাং দেখা যায় যে, মহানবী (সা)-এর হাসির নমুনাই হচ্ছে বর্তমান যুগের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের সুন্দর হাসি আবিষ্কারের বিকল্প।

হাসি মানুষের মানসিক চাপ কমিয়ে দেয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব লোক মানসিক চাপ উপেক্ষা করে এবং সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে শতকরা ২% ভাগ লোক ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগে মারা যায়। পক্ষান্তরে যারা মানসিক চাপ, টেনশন উপেক্ষা করতে পারে না তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ লোক ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে যায়।

খুশী বা আনন্দ হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের প্রমাণ। মানুষ যখন আনন্দিত হয় তখন তার দেহের ভেতরে এনড্রোলিন তৈরী হয়। মানুষের মস্তিষ্কে তৈরী হওয়া এই উপাদান সারাদেহে বিস্তার লাভ করে। এর রাসায়নিক উপাদান অনেকটা আফিমের মতো। এই উপাদান মানুষের আবেগ অটুট রাখে এবং তাদের ব্যথা বেদনার অনুভূতি কমিয়ে দেয়। এছাড়া অন্য একটি রাসায়নিক উপাদান রয়েছে যাকে বলা হয় অক্সিটোফিন। এই হরমোন বিশেষ গ্লান্ড হতে তৈরী হয় এবং হরমোন মানুষের দেহমনকে শান্ত করে এবং মানসিক সজীবতা তৈরী করে।

খুশির একটি বিশেষ প্রকাশ হচ্ছে হাসি। আপনি যখন হাসবেন তখন আপনার পেট, ঘাড় এবং কাঁধের হাড়ের মধ্যে উঠানামা চলতে থাকে। হৃদস্পন্দন এবং রক্ত চাপ বেড়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হতে থাকে। হাসি থামার পর রক্তচাপ এবং নাড়ির স্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে আসে। এবং এক ঘণ্টার হাসি ১০ মিনিট নৌকা চালানোর মতো শ্রম সাপেক্ষ। তবে হাসি কৃত্রিম হতে পারবে না। আপনাকে প্রাণ খুলে হাসতে হবে। বিনোদনমূলক কর্মসূচিতে মানুষের ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ বিনোদনমূলক কর্মসূচির মধ্যে হাসির যথেষ্ট উপাদান থাকে। জীবনে চলার পথে কিছু ঘটনা ঘটে যখন আনন্দ অনুভব করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ছাত্র পরীক্ষা দেয়ার পর তার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি নাম্বার পেলে তার খুশীর সীমা থাকে না।

এখানে রুহানী খুশী বা আত্মিক খুশী সম্পর্কে আলোচনা না করা হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

গরীব মিসকিনদের সাহায্য করে মানুষ খুশী লাভ করতে পারে। অল্পে তুষ্টি মানুষকে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

৭৫. হতাশা

DISAPPOINTMENT

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত দুই বিজ্ঞানী চার্লস ফকনার ও স্মিথ এনড্রিস উভয়ে মানুষের মনের ভয়ভীতি, হতাশা, মৃত্যুচিন্তা, প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক, কোনো কাজে অকৃতকার্য হলে দুঃখে, দুঃশ্চিন্তায় মানুষের মনে তখন নানা অস্থিরতা ও নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। মানুষের সেই অশান্তি দূর করার জন্য উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়, ইউরোলিংগু ইস্টিক প্রোগ্রাম নামে এক প্রকার চিকিৎসা আবিষ্কার করেছেন। তারা উভয়ে আশাপোষণ করে বলেন যে, ইহার দ্বারা মানুষের উক্ত আলোচ্য হতাশাসমূহ উক্ত মানুষের অন্তর হতে দূর হয়ে তার মনে, আনন্দ ও প্রফুল্লতা ফিরে এসে তাকে সুস্থ ও সুখীময় করে তুলবে। (ইত্তেফাক ৬-১১-১৯৯৮)

অথচ মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়ের বহুপূর্বেই মানুষের ভয়ভীতি, হতাশা, দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যুচিন্তা, প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোক, কোনো কাজে অকৃতকার্য হলে মানুষের মনের অস্থিরতা ও অশান্তি দূরীকরণের চিকিৎসাস্বরূপ দৈনন্দিন মানুষের মধ্যে নামায, কুরআন পাঠ ও যিকিরের ব্যবস্থা আবিষ্কার করে তা ঠিকমত পালন করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এছাড়াও নিম্নে উক্ত হতাশাসমূহ দূরীকরণের জন্য, কুরআন ও হাদীস পেশ করা হলো। যেমন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ اَنْ يَّذْهَبَ بِالْهَمِّ وَالْحُزْنِ۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস করলে, শারীরিক ও মানসিক হতাশার যাবতীয় অশান্তি ও অস্থিরতার উপকরণসমূহ দূর হয়ে যায়।

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔

অর্থ : সাবধান! একমাত্র আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অন্তরসমূহ শান্তি লাভ করে। (সূরা রাদ : আয়াত-২৮)

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ۔

অর্থ : হে নবী! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন, যারা আল্লাহ পাকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত বা শান্তি। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫)

وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ. مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থ : যারা ইহুদী, খ্রীস্টান ও বেদুঈন এবং এদের মধ্য হতে যে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকটে, এবং তাদের কোনো ভয়ভীতি ও হতাশার কোনো কারণ নেই। (সূরা বাকারা : আয়াত-৬২)

অতএব, মহানবী (সা)-এর হতাশা দূরীকরণের উপরোক্ত আলোচনাই বর্তমান উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয়ের ইউরোলিংগুইস্টিক প্রোগ্রামের বিকল্প।

৭৬. হৃদযন্ত্র

HEART

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন যে, যখন মানুষ বেশি পরিমাণে চর্বি জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করতে থাকে, তখন তার দেহের রক্তে কোলস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে এবং কোলস্টেরল হচ্ছে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া। যখন কোনো মানব দেহের রক্তের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় অস্বাভাবিক হয়ে যায় তখন দেহের উক্ত রক্ত ভারী হওয়ার ফলে, দেহের হৃদযন্ত্র উক্ত ভারী রক্ত ঠিকমত সারা দেহে পরিচালনা করতে পারে না। তখন উক্ত দেহের হৃদযন্ত্র উক্ত রক্তের দ্বারা ভারী হয়ে যায়, তখন উক্ত মানুষ বলে যে, এখন আমার বুক ভার অথবা আমার বুকে ভীষণ চাপ। অর্থাৎ উক্ত কোলস্টেরল যুক্ত রক্তের দ্বারা তার হৃদযন্ত্র অসুস্থ এবং এইভাবে তার হৃদযন্ত্র দীর্ঘদিন থাকলে তার হৃদক্রিয়া একদিন বন্ধ হয়ে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

আবার কোনো কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলেন যে, ভয় ভীতি, দুঃশ্চিন্তা, দুঃসংবাদ ও হতাশা ইত্যাদি দ্বারাও রক্তে কোলস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গিয়ে হৃদযন্ত্র অসুস্থ হয়ে যায়।

আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন যে, খারাপ কাজ ও খারাপ কথা বেশি বেশি করলে ও বললে, হৃদযন্ত্রে ভয়-ভীতি, দুশ্চিন্তা ও হতাশা বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা দেহের রক্তে কোলস্টেরল বেড়ে গিয়ে হৃদযন্ত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ যেন তার জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সুষম খাবার খায় এবং সুষম খাবার বলতে ঐ খাবারকে বুঝানো হয়েছে, যে খাবারটি মধ্যম খাবার অর্থাৎ উক্ত খাবার বেশি উন্নতমানেরও নয় এবং বেশি নিম্নমানেরও নয়। এবং তা প্রতিদিন এক মানের খাবারও নয়।

অথচ এ সম্পর্কে মহানবী মুহাম্মদ (সা) উক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই একটি অমূল্য হাদীস আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন। যেমন :

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ الْأُمُوْرِ أَوْ سَطُهَا۔

অর্থ : মহানবী (সা) বলেছেন, মধ্যম বস্তুই হচ্ছে উত্তম বস্তু। অর্থাৎ মধ্যম খাবারই হচ্ছে উত্তম বা সুষম খাবার।

(আমছিলাতুল হাদীস লি ইমাম ইবনে শাইবা হা/৩৩৮)

এছাড়াও মহানবী (সা) হৃদযন্ত্র সম্পর্কে একটি হাদীস বলেছেন, যেমন–

عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔(متفق عليه)

অর্থ : নু'মান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আল্লাহর রাসূল (সা) বাণী প্রদান করেছেন : সাবধান! নিশ্চয়ই মানব দেহের মধ্যে এমন একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে যা সুস্থ থাকলে গোটা দেহই সুস্থ থাকে, আর অসুস্থ (দূষিত) হয়ে পড়লে সমস্ত দেহটাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। (অর্থাৎ যখন এ গোশতপিণ্ড দূষিত হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত শরীরই বিষায়িত হয়ে পড়ে) সাবধান! সেটাই হলো হৃদযন্ত্র বা অন্তরকণ। (বুখারী হা/৫২ ও মুসলিম হা/১৫৯৯)

মানুষের হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখার জন্য মহানবী (সা) মানুষের মধ্যে কিছু ভালো কাজ করার ব্যবস্থা ও নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং উক্ত ভাল কাজগুলো করলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে এবং কখনও হৃদযন্ত্রে কোনো ভয়ভীতি, দুঃশ্চিন্তা ও হতাশার উদ্রেক হয় না। এবং উক্ত ভালো কাজগুলো হচ্ছে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, আল্লাহ পাকের যিকির, কুরআন পাঠ ও নানা মাখলুকাতের সেবামূলক কাজ ইত্যাদি। এবং এই কাজগুলো নিয়মিতভাবে করলে হৃদযন্ত্র সর্বদাই প্রফুল্ল থাকে এবং হৃদযন্ত্র কখনও অসুস্থ হওয়ার সুযোগ পায় না।

৭৭. ইসলামে বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন

আল্লাহ তায়ালা বিবাহের মাধ্যমেই মানুষকে (নর-নারী) ব্যভিচারের (fornication) ন্যায় এমন কঠিন পাপ থেকে হেফাজত বা মাহফুজ রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আর এ কারণে রাসূল (সা) বিবাহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। বিয়ের মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন অশালীন ও অশ্লীল পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে, ঠিক তেমনি শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি, রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। কুরআন ও হাদীসে বিবাহ সাদীসহ জীবনের সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। শারীরিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি ও রোগ প্রতিরোধের জন্যেও কুরআন হাদীসের নিয়ম-কানুন, কলাকৌশল মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। যেমন– কুরআন ঋতুবর্তী অবস্থায় সহবাস করা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ

অর্থ: "তোমরা ঋতুবতীদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাকবে।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-২২২)

পবিত্র কুরআনের উক্ত নির্দেশের আলোকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও এ তত্ত্ব উদঘাটন করেছে যে, ঋতুস্রাবের নির্গত রক্তে বিভিন্ন ধরনের রোগ-জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ, সর্বোপরি শরীরের অপ্রয়োজনীয় বিষ সদৃশ বজ্রপদার্থ থাকে। যা শরীরে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে স্বাস্থ্যহানীর সম্ভাবনা থাকে। অনুরূপভাবে ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস থেকে বিরত থাকার কারণ হলো, ঋতুবতী মহিলাদের লজ্জাস্থান রক্তক্ষরণের ফলে আড়ষ্ট হয়ে থাকে এবং অভ্যন্তরীণ শিরা-উপশিরাসমূহও রক্তক্ষরণের দরুন সংকুচিত থাকে। এ অবস্থায় সহবাসে মহিলাদের কষ্ট অনুভব হয়। উক্ত সহবাসের ফলে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ ছাড়া প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালাপোড়াসহ বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি হতে পারে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম মালেক (রহ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ)–এর মতে যৌন উন্মাদনার কারণে কারো দ্বারা ঋতুবতী অবস্থায় সহবাসের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়ে গেলে কাফফারা আদায় করা অত্যাবশ্যক

নয়। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ (রাহ)-এর মতে, কাফফারা আদায় করা উত্তম। কাফফারার পরিমাণ ১ (এক) দীনার। যা সদকা করে দিতে হবে। অবশ্যই ১ দীনারকে সমকালীন টাকার সমপরিমাণ সদকা দিতে হবে।

সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে যা করণীয়

মাসিকের পর স্ত্রী সহবাস করার নিয়মাবলি

ইমাম দারুল হিজরাহ ইমাম মালেক (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ) এবং ইমাম আহমদ (রহ)-এর মতে গোসল অথবা তায়াম্মুম করে নিলে সহবাস করা বৈধ হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে মাসিক স্রাবের নিম্ন মেয়াদ কমপক্ষে তিনদিন এবং উর্ধ্ব মেয়াদ দশদিন। যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী গোসল করে নেয় অথবা একটি ফরজ নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। আর দশদিনের সমাপ্তির পরপরই সহবাস বৈধ। তবে গোসলের পরেই উত্তম।

অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাম ক্ষুধা নিবারণ নিষেধ

হুজায়মা ইবনে সাবেত (রহ) থেকে বর্ণিত। যার শেষ অংশ রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা মহিলাদের পায়ুপথে কাম ক্ষুধা নিবারণ করো না। যে ব্যক্তি স্ত্রীর পায়ুপথে কাম ক্ষুধা নিবারণ করে, আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। যে ব্যক্তি স্ত্রীর পায়ুপথে কামক্ষুধা নিবারণ করে, সে নিশ্চিত অভিশপ্ত।" (আবু দাউদ)

ইমাম গাজালী (রহ) তাঁর "এহইয়াউল উলুম" গ্রন্থে লিখেছেন পায়ুপথে কামক্ষুধা নিবারণ হারাম এবং বহুবিধ রোগব্যাধির উৎপত্তির কারণ (Masturbation) (হস্তমৈথুন), যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

একদিন ইবনে আব্বাস (রা)-এর বৈঠক থেকে সবাই চলে যাওয়ার পর একটি যুবক বসে রইল। ইবনে আব্বাস (রা) সে যুবকটিকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কোনো প্রয়োজনীয় কথা আছে? যুবকটি বলল, আমি আপনাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই, যা আপনার মজলিশে জনসমাগম থাকায় প্রশ্ন করতে পারিনি। সেই সাথে আপনার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য আমাকে আরও প্রভাবিত করেছে। আব্বাস (রা) বললেন, "একজন ধর্ম

বিশেষজ্ঞ বলতে পারবে, তা আমার সামনেও বলতে পারবে। অতঃপর যুবকটি বলল, আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক আমার কোনো সহধর্মিনী নেই, যার কারণে অধিকাংশ সময় আমি হস্তমৈথুন দ্বারা আমার কাম ক্ষুধা প্রশমিত করে থাকি। এটা কি অপরাধ? ইবনে আব্বাস (রা) তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন ছিঃ ছিঃ এহেন অপকর্ম হতে তোমার শরীয়ত অনুমোদিত বাঁদীর সাথে বিয়ে করাই শ্রেয়। "কাম ক্ষুধা নিবারণে জন্য হস্তমৈথুন হারাম এবং অভিশাপের কারণ।" (ফতোয়ায়ে রহিমী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬)

যা স্বাস্থ্যসম্মত সহবাস

* নারীর যৌনক্ষুধা পুরুষের তুলনায় ৯০ ভাগ বেশি। তাই কিছু কৌশল বা টেকনিক অবলম্বন করে ১০ ভাগ শক্তি দিয়ে ৯০ ভাগ শক্তির ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব। তবে শর্ত হলো, ধৈর্য ধারণ করে কৌশল অবলম্বন করা। যেমন-
* স্বামী এবং স্ত্রী উভয় পূর্বে লজ্জাস্থান হালকা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে নিবে। অতঃপর সাধ্যমত সুগন্ধি, সেন্ট বা আতর ব্যবহার করবে।
* মহিলাদের গুরগুড়ি চুলের বেনিতে, উত্তেজনাপূর্ণ কথা, গর্দানে চুম্বন করা, কাতুকুতু, সুড়সুড়ি, নিতম্বে স্পর্শ করা এগুলো করলে স্ত্রীর বীর্যপাত তাড়াতাড়ি হয়।
* পুরুষ তার স্ত্রীর স্তন্যের বোটাতে কামড়াবে, পুরুষাঙ্গ দ্বারা স্তন্যের বোটাতে সুড়সুড়ি দিলে স্ত্রীর বীর্যপাত তাড়াতাড়ি হয়।
* মিষ্টি উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, আর টক উত্তেজনা হ্রাস করে।

হাদীসে বর্ণিত, তোমাদের কেউ একবার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের আগ্রহ জাগ্রত হলে মধ্যবর্তী সময়ে অজু করে নিবে।"

(মুসলিম ও আবু দাউদ)

"ইমাম গাজ্জালী (রহ)-এর মতে, একবার স্বপ্নদোষ বা সহবাস করার পর পুনরায় সহবাস করতে হলে মধ্যবর্তী সময়ে পুরুষাঙ্গ ধৌত করতে হবে। অথবা প্রস্রাব করতে হবে।

যে কাজে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়

শিরাআতুল ইসলাম "কিতাবের লেখক লিখেছেন, সহবাসকালে স্ত্রী চিহ্ন অবলোকন করলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়।

ফিকহ বিজ্ঞানী আবু লাইস (রহ) স্বীয় গ্রন্থ "বুস্তানে" লিখেছেন যে, সহবাসকালে অধিক কর্থা–বার্তা বলা নিষেধ।

চক্ষুরোগ (চোখ উঠা) অবস্থায় সহবাস ক্ষতির কারণ

"জামে কবীল" গ্রন্থে উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত। কোনো স্ত্রীর চক্ষু উঠলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রাসূল (সা) তাঁর সাথে সহবাস করতেন না।"

সহবাস শেষে পানি বিয়োগ স্বাস্থ্য সম্মত

"মিরআতুল ইসলাম" নামক গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, সহবাস শেষে স্বামী-স্ত্রীর প্রস্রাব করে নেয়া উচিত।

সহবাসের পর যা করা প্রয়োজন

বিশ্ব বিখ্যাত ফিকহ শাস্ত্রবিদ আবু লাইছ সমরকন্দী (রহ) লিখেছেন, সহবাস শেষে উভয়ের লজ্জাস্থান ধৌত করা উচিত। এতে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করা যাবে না। কেননা, তাতে জ্বর আসার সম্ভাবনা থাকে। শরীরের তাপমাত্রা সহবাসের পরে হ্রাস পায়। এ জন্য শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত ধৌত করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আলী (রা)-এর মতে সহবাসের পর প্রস্রাব করে নেয়ার কথা উল্লেখ আছে। অন্যথায় জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লজ্জাস্থান মৃদু গরম পানি দিয়ে ধৌত করাই উত্তম।

স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় কর্ম প্রকাশ করা উচিত নয়

রাসূল (সা)-এর পবিত্র বাণী যার মর্ম কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় আলাপ-আলোচনা সঙ্গী-সাথিদের মধ্যে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। উপরন্তু তা নির্লজ্জতা ও অসভ্যতার কাজ; যা কোনো সংস্কৃতবান পুরুষের কার্য হতে পারে না।

সহবাসের সর্বোত্তম সময়

ফিকহ গবেষক আবু লাইস (রহ) তাঁর বুস্তান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সহবাসের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রাত্রের শেষ ভাগ। কারণ রাত্রের শুরুভাগে পেট আহারাদী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।

মা আয়েশা (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম গাজ্জালী (রহ) তাঁর "এহইয়াউল উলুম" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, রাসূল (সা) শেষ রাতে বেতেরের নামায আদায় করে অবসর হওয়ার পর সহবাসের প্রয়োজন হলে তা সেরে নিতেন। নতুবা অত্র জায়নামাযেই শয়ন করতেন। বেলাল (রা) এসে রাসূলে করীম (সা) কে ফজরের নামাজের জন্য আহ্বান করতেন।

"তিব্বে নববী" নামক গ্রন্থে ভরা উদরে সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

রাসূল (সা) কর্তৃক রাত্রের শুরুতে এবং দিনের বিভিন্ন সময়েও সহবাসের প্রমাণ সাক্ষ্যবহন করে।– (শামায়েলে তিরমিযী)

সর্বোত্তম পদ্ধতি

অর্থ : স্ত্রী চিৎ আসনে শায়িত হবে, আর স্বামী তার ওপর উপুর হয়ে উপগত হবে।

মাত্রাতিরিক্ত রতিক্রিয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

বুস্তান গ্রন্থে ফকীহ আবু লাইস (রহ) লিখেছেন। আলী (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি এ আশা করে যে, তার স্বাস্থ্য সুন্দর সুদর্শন ও দীর্ঘকাল অটুক থাকুক তাহলে সে যেন সকালে ও রাত্রে আহার করে, ঋণ থেকে বেঁচে থাকে নগ্নপায়ে না হাঁটে এবং স্ত্রীর সাথে কম সহবাস করে।" (তিব্বে নববী)

পরনারীর দর্শনার্থে কামভাব জাগ্রত হলে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয়াই উত্তম।

ইমাম গাজ্জালী (রহ) লিখেছেন, জুনাইদ বাগদাদী (রহ) বলতেন, আমার কাছে সহবাসের প্রয়োজনীয়তা ততটুকুই, যতটুকু প্রয়োজনীয়তা খাদ্যের।

একটি হাদীসে এসেছে, যার মর্মকথা হলো, কখনও কোনো পরনারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হলে, যদি সে মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাও তখন ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নাও। কারণ সহবাস অন্তরের কুমন্ত্রণা দূর করে দেয়।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান সময়কালে সহবাস না করাই উত্তম

রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, যার মর্মকথা হলো– "তোমরা নিজ সন্তানদের গুপ্তভাবে হত্যা করবে না। কেননা, স্তন্যপানকারী শিশুর উপস্থিতিতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে শিশুর ক্ষতি হয়ে থাকে।

(আবু দাউদ, হা/৩৮৮৩)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যার মর্মকথা হলো–

আমার ইচ্ছে হয়, স্তন্যপানকারী শিশুদের মাতাদের সাথে সহবাস নিষিদ্ধ করে দেই। কিন্তু পারস্য ও রোম লোকদের ব্যাপারে জানতে পারলাম যে, তারা এ রকমই করে থাকে। কিন্তু শিশুদের কারণে তাদের কোনো ধরনের অসুবিধা হয় না।"

উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, স্তন্যদানকালে ঘন ঘন সহবাস থেকে পুরুষদের অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। যদিও গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানের দুগ্ধ পান অবস্থায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সহবাস করার অনুমতি আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সহবাস থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা প্রসুতি মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যহানী ঘটবে।

দুই সহবাসের মধ্যবর্তী সময়ে যতটুকু বিরতি দেয়া উচিত

মাওলানা সাঈদ ওসমানী (রহ) তাঁর গ্রন্থ "রিফাহুল-মুসলিমীনে বর্ণনা করেছেন, চারদিন অন্তর অন্তর এক দু'বার সহবাস করবে। সেক্ষেত্রে স্ত্রীর আগ্রহ থাকতে হবে। স্ত্রীর আগ্রহ এর চেয়ে বেশি হলে ক্ষতি নেই। কারণ স্ত্রীর অসন্তুষ্টি ও তার মনের একাগ্রতা হলো, তার সম্ভ্রম সংরক্ষণের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ।" তবে সংযত করতে পারলে উভয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্য মঙ্গলজনক।

বাসর ঘরের রাত্রিতে যা করণীয়

বিয়ের পর যখন কনে বাসর ঘরে প্রবেশ করবে, তখন কনের হাত ধরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে হবে। কোনো কোনো কিতাবে হাত ধরার পরিবর্তে কনের চুল ধরার কথা বর্ণিত হয়েছে। দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার কল্যাণ ও সৎ স্বভাবের জন্য প্রার্থনা করছি এবং তার দুষ্ট চরিত্র ও অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, হা/২১৬২)

নব দম্পতির অবকাশ যাপনের কক্ষে যা করণীয়

সহবাসের তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হলে, সহবাসের পূর্বে বিসমিল্লাহসহ তিনবার সূরা এখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তে হবে এবং নিম্নের দোয়া পড়ে সহবাসে লিপ্ত হতে হবে। দোয়া-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا-

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহী আল্লাহুম্মা জান্নিবনাস শায়তান ওয়াজান্নিবিস শায়তান মা রাজাকতানা।

অর্থ : "আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদের উভয়কে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন এবং যে সন্তান-সন্ততি আমাদের দান করবেন, তাকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখুন।" (বুখারী, হা/১৪১)

বীর্যপাতের সময় জিহবা এবং মুখের কোনোরূপ স্মরণ ঘটানো যাবে না। শুধু মনে মনে নিম্নের দোয়া পড়তে হবে। মুখে উচ্চারণ করা যাবে না।

দোয়া :

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا-

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাতে শয়তানের প্রভাব রাখবেন না। (মুসান্নাফে ইবনে শাইবা, হা/৩০৩৫৩)

শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহ) বলেন। উক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সহবাসের সময় উল্লিখিত দোয়া পাঠ না করা হলে শয়তান তাতে প্ররোচনার প্রভাব খাটাতে সক্ষম। যার ফলে সন্তান অসচ্চরিত্র এবং নোংড়া চরিত্রের বাহক হয়ে থাকে। (রিফাহুল মুসলিমীন)

নিম্নোক্ত অবস্থায় ও সময়ে সহবাস করা নিষিদ্ধ

১. মসজিদে

২. প্রকাশ্য স্থানে

৩. সহবাসের মর্মার্থ বুঝে এমন কাউকে পার্শ্বে রেখে

৪. পায়খানার রাস্তায়

৫. হায়েয-নেফাসের সময়

৬. হায়েজ-নেফাসের রক্ত বন্ধ হলে, গোসল করে নামাযের তাহ্‌রীমা বাঁধতে যতক্ষণ লাগে, ততক্ষণের মধ্যে নিষেধ।

৭. স্বপ্নদোষের পর বিনা গোসলে

৮. খুব ক্ষুধার্ত অবস্থায়

৯. উলঙ্গ হয়ে

১০. গুপ্ত স্থানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে

১১. খুব বৃদ্ধ অবস্থায়

১২. দুর্বল শরীরে

১৩. কুষ্ঠ, যক্ষা ইত্যাদির জটিল রোগে নিষিদ্ধ

১৪. নাবালেগ অবস্থায়

১৫. মনে খুব রাগ কিংবা শোক থাকলে নিষেধ

১৬. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য থাকলে

১৭. ঝড়, তুফান, বজ্র পড়ার সময়

১৮. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় সহবাস করা নিষিদ্ধ।

পরিত্যাগের অপকারিতা

স্বামী-স্ত্রীর সহবাস আনন্দের কাজ। এতে যেমন স্বামীর অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। উভয়ের মধ্যে এই কামনা-বাসনা, স্পৃহা বিদ্যমান থাকে। ভাব-ভঙ্গী দ্বারা স্ত্রীর কামস্পৃহায় জ্ঞাত হলে স্বামীর জন্য অবশ্যই সহবাস করা উচিত। বিনা কারণে সহবাস পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা ফিকহ্ শাস্ত্রবিদদের মতে উচিত নয়; বরং কখনো অত্যাবশ্যকীয় বলেছেন। (আল বারীকা : ১২৭১ পৃষ্ঠায়)

ইতিহাস বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবু আলী ইবনে সিনার মতে, সহবাসে আধিক্যতা যেমন ক্ষতিকর; তেমনি সহবাস পরিত্যাগ করাও ক্ষতিকর। ইহা পরিত্যাগে শরীয়তের বহুমুখী সমস্যায় পতিত হয়। এর মধ্যে মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, চক্ষু কালো বর্ণ ধারণ করা, শরীরে মেদ ভূড়ি জমে উঠা। অণ্ডকোষ ফুলে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

স্ত্রী সান্নিধ্য থেকে বেশি দিন বিচ্ছিন্ন থাকা নিষেধ

চার মাসের অধিককাল স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা এবং সহবাস না করা ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ নিষেধ বলেছেন। কেননা; মহিলাদের সংযম শক্তি চার মাসের অধিক স্থায়ী হয় না। ওমর (রা) তাঁর খেলাফতের জামানায় এক রাত্রে মদিনার গলীতে ছদ্মবেশে টহল দেয়া অবস্থায় এক ঘর থেকে এক সময় একজন যুবতীর কণ্ঠে বিচ্ছেদের কবিতা আবৃত্তির শব্দ শুনতে পেলেন, যার মর্মার্থ ছিলো, "আল্লাহর শপথ! যদি আমার অন্তরে আল্লাহভীতি না থাকতো, তাহলে চৌকির পায়াসমূহ চড়চড় করে শব্দ করত।"

আমীরুল মুমিনীন ওমর (রা) ইহা শ্রবণে সন্দেহের উদ্রেক হলে তিনি দ্বার খোলার নির্দেশ দিলেন, দ্বার (দরজা) না খোলায় তিনি দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে প্রশ্ন করলেন, উত্তরে মহিলা বলল, তার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে জেহাদে চলে গেছে, তাই তাঁর বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে তিনি কবিতার এই লাইনগুলো আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। এটা শ্রবণে ওমর (রা) স্বীয় তনয়া (মেয়ে) উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করলেন, মা তুমি নিঃসংকোচে বল, বিবাহিতা মহিলারা স্বামী ছাড়া কতদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে? উত্তরে মা হাফসা (রা) দৃষ্টি অবনত করে হাতের চারটি আঙ্গুল উঁচু করে দিলেন, যা দ্বারা ওমর (রা) বুঝতে পারলেন যে, বিবাহিতা মহিলারা স্বামী ছাড়া চার মাস পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে পারে।

পরবর্তীতে তিনি সর্বত্রই মুসলিম মুজাহিদগণের উদ্দেশ্যে ফরমান ঘোষণা করে দিলেন যে, বিবাহিত পুরুষের চার মাস অন্তর অন্তর ছুটিতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হলো।

যা মেনে চলা অবশ্যই প্রয়োজন

সহবাসের পর শরীরে ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভূত হয় এবং অতিরিক্ত সহবাস বার্ধক্য আনয়ন করে। সহবাসে পরে অবশ্যই কিছু পুষ্টিকর খাদ্য শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ করা আবশ্যক।

মৌসুমী ফল, ডিমের হালুয়া, গাজরের হালুয়া, হানী ওয়াটার থেরাপী, মাউল্লাহাম, গরম দুধ, মধু ও দুধের মিশ্রণ হজম শক্তি খুব ভালো থাকলে অথবা খেজুর দুধের মধ্যে রেখে ফুটিয়ে খাওয়া যেতে পারে, দুধের ছানার বরফি, দুধের সর ইত্যাদি।

কাতিলা গাম. খুরমা খেজুর, মোনাক্কা একত্রে কমপক্ষে আট ঘণ্টা ভিজিয়ে মিশ্রণসহ খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

বিঃ দ্রঃ উপরিউক্ত খাদ্যগুলো অবশ্যই মৌসুম বিশেষে এবং রোগ বিশেষে শর্ত-মোতাবেক গ্রহণ করতে হবে। ডায়াবেটিস মেলাইটাস রোগীর ক্ষেত্রে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য বর্জন করতে হবে।

অস্বাভাবিক বা বিকৃত পন্থায় সহবাস করা ও বীর্যপাত হওয়ার সময় তা আটকিয়ে রাখার ফলে প্রস্রাবের নালীতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

সহবাসের পরে এবং গোসলের পূর্বে অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় আহার করলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

অতিরিক্ত টক জাতীয় খাদ্য বর্জন করতে হবে।

অসুস্থ অবস্থায় সহবাস করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে যায়। ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন রকমের রোগ-ব্যাধি হতে পারে।

ভরাপেটে বা খাদ্য গ্রহণের পর পর সহবাস করলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে। শরীরের বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন, লিভার ও পাকস্থলীর শক্তি দুর্বল হয় পড়ে।

দু'জন পুরুষ অথবা দু'জন মহিলা এক বিছানায় শয়ন করা নিষেধ

হাদীস বর্ণিত হয়েছে- যার মর্ম কথা হলো এক বিছানায় দু'জন পুরুষ অথবা দু'জন মহিলা (বালেগ বা বালেগা) একসাথে শয়ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিবস্ত্র অবস্থায় একজন নারী/মহিলা অন্য একজন নারী/মহিলার স্পর্শ এবং একজন পুরুষ বিবস্ত্র অবস্থায় অন্য পুরুষকে স্পর্শ করা নিষেধ।

অন্যত্র আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, "কোনো পুরুষ অন্য কোনো পুরুষকে বিবস্ত্র অবস্থায় দর্শন করবে না আর

কোনো মহিলাও অন্য কোনো মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দর্শন করবে না। দু'জন পুরুষ এক বিছানায় এবং দু'জন নারী এক বিছানায় শয়ন করবে না। (মিশকাত) দশ বছরের উর্ধ্বে ছেলে-মেয়েদেরকে পৃথক পৃথক বিছানায় শয়ন করানোর জন্য জোড় তাগিদ দেয়া হয়েছে। (রিয়াদুস সালেহীন)

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় শারীরিক উপকারিতা

শরীরবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ভালোবাসা দ্বারা শরীরের আগত ভিটামিন- এ. বি. সি. ডি ইত্যাদি অতি তাড়াতাড়ি দেহ কোষে শোষিত হয়। মনে যদি আনন্দ, স্ফূর্তি থাকে তাহলে দেহের প্রতিটি যন্ত্র আনন্দময় হয়ে কাজ করে, ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। মনের আনন্দ স্ফূর্তি এক প্রকার টনিক বিশেষ, যা মানবদেহের জৈবরস বা হরমোনকে নিঃসৃত হতে ত্বরান্বিত করে এবং জৈব বিষকে নষ্ট করে। মনের আনন্দেই দীর্ঘায়ু লাভ করে।

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে যে মৃদ্যু আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সেই আলোড়নের অনুভূতি কেউ প্রকাশ করতে না পারলেও এই অব্যক্ত অনুভূতি পরম মাদকতাময়। এর কল্যাণে দেহের প্রতিটি গ্রন্থি স্নায়ুসমূহ সজীব, জাগ্রত ও কার্যক্ষম গুণে গুণান্বিত।

সন্তানের ওপর স্বামী-স্ত্রীর ভাবাবেগের প্রভাব

পৃথিবীর সব যৌন বিজ্ঞানীগণ একমত পোষণ করেন যে, স্বামী-স্ত্রীর প্রবল ভালোবাসার মধ্যে যে সন্তানটি পয়দা হয় তা প্রফুল্লচিত্ত, সুস্থ্যদেহী, বুদ্ধিমান, উদারমনা, উৎসাহী, বলিষ্ঠ, কর্মবীর হয়। এখানে তারা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এভাবে দিয়েছেন যে, পুরুষের শুক্রকীট ও নারী ডিম্বের মিলনের ফলেই সন্তান হয়। পুরুষের প্রত্যেকটি শুক্রকীট ও নারীর ডিম্বানুর মধ্যে ২৪টি করে ক্রোমোজোম থাকে এই ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে জাতিগত সাধারণ গুণ ও স্বভাবের অসংখ্য বীজ লুক্কায়িত থাকে। নর-নারী মিলনের পর উভয় পক্ষের ক্রোমোজোমগুলো ঠিকভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে মিলিত হলেই সন্তান স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়। ঐ মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার আকর্ষণ ক্রোমোজোমগুলোকে উদ্দীপিত করতে থাকে, তাতে তারা যথার্থভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব গুণাগুণ সন্তানের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। তাই অনেক সময় দেখা যায়; নিতান্তই দুর্বল স্বামী-

স্ত্রীর মিলনেও তেজস্বী, সুদেহী ও প্রতিভাশালী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহা স্বামী-স্ত্রীর প্রবল ভালোবাসারই ফল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবল ভালোবাসা থাকলে সন্তান গর্ভে থাকাকালে ও পিতামাতার ভালোবাসজাত আকর্ষণ মাতৃদেহের প্রতিটি কোষকে প্রতিনিয়ত উদ্দিপ্ত রাখে এবং এর প্রতিক্রিয়া গর্ভস্থ সন্তানের দেহকোষকে উন্নত করতে থাকে।

সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভালোবাসার ভূমিকা

স্বামীর-বীর্য হতে আগত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ নারীদেহে গ্রহণে ও পরিশোষণে নারীদেহের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং দেহে লাবণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে নারীদেহ থেকে আগত কামরস থেকে একপ্রকার চুম্বকধর্মী শক্তি অর্জন করে পৌরুষ্য অর্জন করে যার ফলে তাদের স্নায়ুগুলো অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হতে থাকে। এই দু'প্রকার শোষণের ফলে স্বামী-স্ত্রীর দেহের মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণের সৃষ্টি হয়, উভয় দেহে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি হয়, উভয় দেহের মধ্যে অসমাঞ্জস্য এই জৈব আকর্ষণ স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। এতে তাদের অনেক কঠিন সমস্যা ও অনৈক্যতা দূর করতে পারে। একটু পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, যে সব মহিলা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাদের অতিসত্ত্বর বহুবিধ শারীরিক সমস্যায় পতিত হয়। অথবা স্বামী থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার ফলেও উপরিউক্ত সমস্যায় পতিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়।

যে সব স্বামী-স্ত্রী একত্রে জীবন-যাপন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারা অভিশপ্ত। সুষ্ঠ ও নিয়মিত মিলনের অভাবে মানুষের কর্মশক্তি, উদ্যম সৃজনশীল প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। যৌন শক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভা কেবল ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এই সম্পদ নষ্ট হলে গোটা জাতিকেই একদিন তার মূল্য দিতে হয়। প্রত্যেক দেশের সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী ও শ্রমিকগণ যাতে স্ব-পরিবারে বসবাস করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। যৌন জীবনে বিশৃঙ্খলার কারণে গ্রীক ও রোমান জাতি ধ্বংস হয়েছিল ইতিহাসই এ সাক্ষ্য বহন করছে।

যৌন শক্তি বৃদ্ধিকারী কতিপয় পথ্য

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) একদা জিবরাঈল (আ)-এর নিকটে স্বীয় কামভাব সম্পর্কে অভিযোগ জানালে জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি হারীসা খেতে থাকুন, এতে চল্লিশজন পুরুষের শক্তি রয়েছে।"

মাযাকুল আরেফীন নামক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে এবং তার পাদটীকায় লেখা হয়েছে, "হারীসা" এক প্রকার চূর্ণ গোশত, ঘি এবং মসলাযোগে তৈরি হালীম।

ইমাম গাজ্জালী (রহ) লিখেছেন, চারটি জিনিস যৌনতৃষ্ণা বৃদ্ধি করে–

১. চড়ুই পাখি

২. ত্রিফলা

৩. পেস্তা

৪. টাটকা শাক-সব্জি।

আবু নঈম ইবনে আব্দুল্লাহ জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে পাক (সা) ইরশাদ করেছেন, যার মর্মবাণী হলো, সিনার গোশতই সর্বোৎকৃষ্ট গোশত"

হক্কানী আলেমগণের মতে, পবিত্র বাণীটির রহস্যের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে, "সিনার গোশত কামশক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। (তিব্বে নববী)

আলী (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকটে এসে অভিযোগ জানাল, আমার কোনো সন্তানাদী হয় না। রাসূল (সা) প্রতিষেধক দিলেন যে, "তুমি ডিম খেতে থাক।"

আবু নঈম (রা) "কিতাবুত তিব্ব" এ লিখেছেন, রাসূল (সা)-এর নিকট মাখন মিশ্রিত খেজুর অত্যধিক প্রিয় ছিল।

ওলামায়ে কিরাম বর্ণনায় লিখেছেন। খেজুর ভক্ষণে কামভাব বৃদ্ধি পায়, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হয়, মধুযোগে মাখন খেলে নিউমোনিয়ায় উপকার হয় এবং শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হয়। (তিব্বে নব্বী)

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত। উম্মে মুনজীর (রা) বলেন, একবার রাসূল (সা)-কে কেউ খেজুর ও বীটচিনি হাদিয়া স্বরূপ দিলেন, ঘটনাক্রমে আলী (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, রাসূল (সা) আলী (রা)-কে খেজুর খেতে নিষেধ করলেন এবং বীটচিনি খেতে বললেন এবং বললেন যে, এটা তোমার জন্য উপকারী।

ওলামায়ে কিরাম লিখেছেন, ঐ সময়ে আলী (রা)-এর চক্ষুরোগ ছিল। চক্ষুরোগ খেজুর ক্ষতিকর সে জন্য রাসূল (সা) আলী (রা) খেজুর খেতে নিষেধ করেছিলেন। রাসূল (সা)-এর সামনে বীটচিনি হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হলে তিনি আলী (রা)-কে বলেছিলেন, এটি খাও, তা তোমার জন্য উপকার হবে এবং তোমার দুর্বলতা দূর করে দেবে।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সংযম পালন করা সুন্নাত এবং বীটচিনি খেলে দুর্বলতা দূর হয় আর কামভাবের বৃদ্ধি সাধন ঘটে। অন্য রেওয়ায়েতে আয়েশা হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) "হাসীস" খেতে পছন্দ করতেন।

"হাসীস" তিনটি উপাদান যোগে প্রস্তুত হয়। যথা-

১. খেজুর

২. মাখন ও

৩. জমাট দই।

হুজাইল ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, শরীর থেকে অবাঞ্ছিত পশম কেটে ফেলাতেও যৌনপুলক জাগ্রত হয়।

(তিব্বে নববী)

জয়তুন তেল খাওয়া ও মালিশ করা, মধু, খেজুরের সাথে তিল ব্যবহার করা, কালিজিরা ও রসুন যৌনতৃষ্ণা বৃদ্ধি করে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২২৫
৩.	মা- মুহাম্মাদ আল-আমীন	২০০
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	২২৫
৫.	Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান	২২৫
৬.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন -মোঃ রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল করনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)	৫০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	১২৫
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী	১৬০
১৩.	মুত্তাফাকুন আলাইহি	১০০০
১৪.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম	২৫০
১৫.	আর-রাহেকুল মাখতূম	৭০০
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রাসূলের প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব, সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূলের জবাব-	৩০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল্ বাহি আল্ খাওলি	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত ৫০০ হাদীসসমূহ- -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	৫০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - আব্দুল হামীদ ফাইজী	১২০
২৯.	কবরের বর্ণনা সওয়াল ও জওয়াব- ইকবাল কিলানী	২২৫
৩০.	কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী	২০০
৩১.	লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৩০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭৫
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী	১৬০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	আল-হিজাব পর্দার বিধান -মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	১২০
৩৭.	মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মোঃ রফিকুল ইসলাম	১৪০
৩৮	রাসূলের সান্নিধ্যে ৪০দিন- আদিল বিন আলী আশ-শিদ্দী	২৫০

৩৯.	আপনিও হতে পারেন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী নারী -আয়িদ আল ক্বরনী	১৫০
৪০.	আল-কুরআনে মহিলাদের ২৫ সূরা	৬০০
৪১.	আল্লাহর ৯৯টি নামের ফযীলত	
৪২.	রাসূলের ৯৯টি নামের ফযীলত	
৪৩.	রাসূল (সা)-এর ২০০টি সোনালী উপদেশ	
৪৪.	ঈমানের ৭৭টি শাখাসমূহ	
৪৫.	মক্কা ও মদীনার ইতিহাস	
৪৬.	শব্দে শব্দে আল-কুরআনের বর্ণিত দু'আসমূহ	
৪৭.	রিয়াদুস সালেহীন (শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাসহ)-	১০০০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং বইয়ের নাম	মূল্য
১. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮. ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২. ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯. আল কুরআন বুঝে পড়া উচিত	৫০
৩. ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০		
৪. প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার-	৫০	২০. মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৫. আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০		
৬. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২১. পোশাকের নিয়মাবলি	৪০
৭. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২২. ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮. মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৩. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ	৫০
৯. ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৪. ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
১০. সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৫. যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
১১. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০	২৬. সিয়াম : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রোযা	৫০
১২. কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৭. আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
১৩. সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০	২৮. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
১৪. বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	২৯. জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
১৫. সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০	৩০. ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৬. সালাত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	৬০	৩১. মৌলবাদ বনাম মুক্তচিন্তা	৪৫
১৭. ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০	৩. আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২০১৪

অচিরেই বের হতে যাচ্ছে .....

ক.তাওয়াক্কুল- খ.হাদীসের ১০০ গল্প গ. শিরক ও বিদআতের কবলে ইসলাম ঘ. সকাল সন্ধ্যার অজিফা, ঙ. চল্লিশ হাদীস, চ. তওবা ও ক্ষমা, ছ. আপনার শিশুদের লালন-পালন করবেন যেভাবে জ. রাসূল (সা)-এর যত মু'জেযা ঝ ঞ. আসহাবে কাহফ, ট. চার খলিফা ঠ. ইসলামী সাধারণ জ্ঞান ড. ক্বাসাসুল আম্বিয়া ঢ. আল কুরআনুল কারীমের বিধি-বিধানের পাঁচ'শ আয়াত, ণ. গোল্ডেন ইউজফুল ওয়ার্ড।